সতী-অসতী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫০
প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল

শশধর প্রকাশনীর পক্ষে রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও গোপালচন্দ্র পাল, স্টার প্রিন্টিং প্রেস, ২১/এ রাধানাথ বোস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

চারটি অপ্রকাশিত উপন্যাস

সতী-অসতী

স্মৃতি-বিস্মৃতি

পান্থ নিবাস

দন্তের ব্যথা
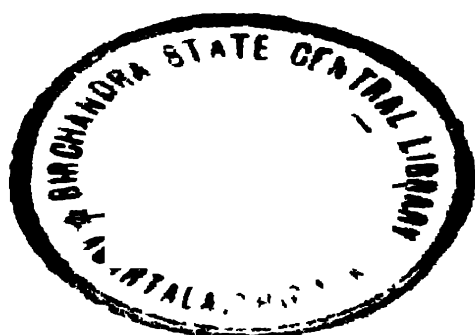
আমাদের প্রকাশিত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

সেরা প্রেমের গল্প

বন্দর বধূ

ভৌতিক অমনিবাস

চন্দনবাঈ (যন্ত্রস্থ)

যমুনাবাঈ (যন্ত্রস্থ)

বাসরলগ্ন (যন্ত্রস্থ)

সতী-অসতী

ঘড়িতে সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রীণা চঞ্চল হয়ে উঠল। সোফায় হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিল। বইটা পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল।

শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলল। দরজা বন্ধ করে একেবারে উলঙ্গ হল। রীণার বয়স বছর ত্রিশ, কিন্তু ছেলেপুলে হয় নি বলে দেহে যৌবনের বাঁধন এখনও সুদৃঢ়। পীনোন্নত স্তন অনেক কুমারীর আকাঙ্খার বস্তু। সুগভীর নাভি। কটিদেশ এখনও ক্ষীণ, গুরু নিতম্ব, সুগঠিত দুটি পা।

আলমারির দর্পণে নিজের নগ্ন প্রতিবিম্ব দেখে রীণা যেন খুশীই হল।

তারপর শাড়ীর স্তূপের তলা থেকে একটা শাড়ী বের করল। একটা রঙীন ব্লাউজ, বক্ষবন্ধনী, সায়া।

সবগুলো পরে নিয়ে দ্রুতহাতে প্রসাধন সেরে নিল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চাবি আঁচলে বাঁধল।

সামনের দরজা দিয়ে নয়, পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে খিড়কির দরজা খুলে রাস্তায় এল।

কয়েক পা চলতেই আধো অন্ধকারে একটা রিক্সার কাঠামো দেখা গেল। আজ মাসছয়েক ধরে ঠিক এক জায়গায় রিক্সাটা থাকে। মাসকাবারি বন্দোবস্ত। ঝড় হোক, জল হোক, কামাই করে না।

রীণা রিক্সার মধ্যে বসতেই চালক পর্দা ফেলে দিল। তারপর ঠুন ঠুন শব্দ করে চলতে শুরু করল।

প্রশস্ত সড়ক ছেড়ে উপগলি বেয়ে আধঘণ্টার ওপর চলল। তারপর একজায়গায় রিক্সা থামিয়ে সামনের পর্দা উঠিয়ে দিল।

রীণা নেমে দাঁড়াল।

এদিকটা বস্তি এলাকা। ধোয়া ওঠা রাস্তা। উনানের ধোঁয়ায় অনেকটা জায়গা অন্ধকার। তার মধ্য দিয়েই দেখা গেল, রাস্তার পাশে পাশে বস্তির রোয়াকের ওপর একপাল মেয়ে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে।

অনেকের কপালে কাঁচপোকার টিপ জ্বল জ্বল করছে। কারো মুখে বিড়ির আগুন।

রীণা গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়াল।

সে যেতেই মেয়েদের মধ্যে হৈ-চৈ শুরু হল।

এস দিদি, আজ এত দেরী হল ?

দিদি না এলে আমাদের আসর জমে না ।

এদিক ওদিক দেখে রীণা বলল ।

টগর কই লা, তাকে দেখছি না ?

একজন উত্তর দিল,টগর কি আর আমাদের মতন বরাত করে এসেছে দিদি । তার তো দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাবু জুটে গেল । বাবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে ।

কথা আর শেষ হল না । সবাই চুপচাপ ।

দুজন বাবু আসছে । চলা দেখেই মনে হচ্ছে, টলছে । অতিরিক্ত নেশার জন্য । একজন মেয়েদের কাছে এসে ফস্ করে দেশলাই জ্বালাল ।

স্বল্প আলো, কিন্তু তাতেই যতটুকু দেখা যায় ।

জড়ানো গলায় বলল, এতো বাবা সব খেঁদীপেঁচীর দল !

সঙ্গের বাবুটি ততক্ষণে থেমে গেছে ।

একদৃষ্টে রীণাকে নিরীক্ষণ করছে ।

এ মেয়ে এখানে এল কি করে ? এ দলে ?

রীণা হেসে লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল ।

কিগো বাবু পছন্দ হয়েছে ? কতক্ষণ ধরে দেখবে ?

বাবুটি লজ্জা পেয়ে বলল ।

না না, দেখাদেখির আর কি আছে । চল, তোমার ঘর কোথায় ?

রীণা বাবুকে নিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকল ।

ঘণ্টাখানেক পর দুজন বের হয়ে এল ।

বাবুটি চলে যেতে রীণা ডাকল, সুখী আছিস নাকি ?

সুখী দাওয়ার ওপর বসেছিল ।

উঠে এসে বলল, সুখীর বরাত । সারাটা রাতই হয়তো বসে কাটবে ।

এই নে ।

হাতের কুড়িটা টাকা রীণা সুখীর দিকে বাড়িয়ে দিল ।

প্রত্যেক দিন এই রকম । কেবল রবিবার বাদ । রবিবার সে আসে না ।

ঘণ্টাখানেক থাকে । কুড়ি পঁচিশ যা রোজগার হয় মেয়েদের কাউকে ডেকে দিয়ে দেয় ।

এদের কাছে রীণা একটা বিস্ময় ।

তার চেহারা, হাবভাব দেখে মনে হয়, তাদের দলে এসে দাঁড়ালেও, ঠিক তাদের জাতের মেয়ে সে নয় ।

রীণা রিক্সায় গিয়ে উঠল। ঠুন ঠুন শব্দ করে রিক্সা গলি পার হয়ে গেল।

রীণা যখন বাড়ী ফিরল তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এবারেও পিছনের দরজা, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকল। শাড়ীজামা ছেড়ে বাথরুমে গেল।

সাবান মেখে অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারল।

তারপর ভাল শাড়ীজামা পরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

একসময় বাইরের ঘরে সোফার ওপর এসে বসল।

ঘড়িতে দশটা বাজল। আর আধঘণ্টা।

আধঘণ্টা পর ডাক্তার সুকোমল চৌধুরীর মোটরের শব্দ শোনা যাবে। প্যারাডাইস নার্সিং হোমের আধা অংশীদার ডাক্তার চৌধুরী।

একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মাপা জীবন। ভোর সাতটায় বেরিয়ে যায়। খেতে আসে দুপুর একটায়। একঘণ্টা বিশ্রাম। আবার দুটোয় বেরিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফেরা।

বাড়ীতে লোক দুটি।

চাকর আর কামিনীর মা। রান্নাবান্নার কাজ কামিনীর মাই করে।

রীণা যে নিঃসঙ্গ, সারাটা দিন তার কথা বলবার লোক নেই, এটা ডাক্তার চৌধুরীর অজানা নয়।

মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করে।

তুমি কোন মহিলা সমিতির সভ্যা হয়ে যাও না। সময়টা কাটবে।

রীণা মাথা নেড়েছে।

আমার দরকার নেই। আমি বেশ আছি।

ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে রীণার আলাপ অদ্ভুতভাবে।

তখন ডাক্তার চৌধুরী সবে বিদেশ থেকে ফিরেছে।

ভাবছে কি করবে। হাসপাতাল থেকে চাকরির খবর এসেছে। বন্ধুরা ধরেছে নার্সিং হোম খোলার জন্য।

একটু নিরালায় ভাববার জন্য কিছুদিনের জন্য বিহারের এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে উঠেছে।

রোজ বিকালে একবার করে স্টেশনে এসে দাঁড়ায়।

সেদিন দাঁড়াতেই রীণা ছুটে সামনে এসেছিল।

ভীষণ মুস্কিলে পড়েছি। দয়া করে যদি সাহায্য করেন।

ডাক্তার চৌধুরী রীণাকে নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করল।

কি মুশকিল ?

ট্রেন থেকে নামবার সময় কামরায় সুটকেশটা ফেলে এসেছি। আমার যথাসর্বস্ব তার মধ্যে।

আপনি কোন্ ক্লাশে ট্র্যাভেল করছিলেন ?

থার্ডক্লাশ, লেডিজ।

আসুন, আমার সঙ্গে।

ডাক্তার চৌধুরী রীণাকে নিয়ে স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে উঠল।

রীণা বলল, ব্রাউন রংয়ের সুটকেশ। ওপরে আমার নামলেখা। রীণা রায়।

পরের জংশনে সুটকেশ নামানো হল। তারপর ফিরতি ট্রেনে সুটকেশ এসে পৌঁছাল।

ততক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করা অবশ্য ডাক্তার চৌধুরী আর রীণা কারও পক্ষেই সম্ভব হল না।

ঠিক হল, রীণা পরের দিন এসে সুটকেশটা স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

দুজনে এক টাঙ্গায় ফিরল।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় যাবেন ?

সদরবাগে। এস. ডি. ও মিস্টার বাগচীর বাড়ী।

মিস্টার বাগচী আপনার আত্মীয় ?

না, আত্মীয় নয়। ওঁর মেয়ে কৃষ্ণা আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। কৃষ্ণা পড়া ছেড়ে দিয়েছে শরীর খারাপ বলে।

বলেই রীণা আবার বলল।

আমি কৃষ্ণাকে চমকে দেবার জন্য খবর না দিয়ে আসছি। না হলে ওরা স্টেশনে থাকত। আপনি এখানে থাকেন ?

না। আমিও কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। শুনেছি এ সময়ে এখানকার জলহাওয়া ভাল। আমি পান্থপাদপে উঠেছি।

এখানে একটি হোটেল, একটি ধর্মশালা।

ধর্মশালাটি স্টেশনের কাছেই। সব সময়ে যাত্রী বোঝাই। একটু অভিজাত-শ্রেণীর যারা, তারা ওঠে পান্থপাদপে।

আগে পান্থপাদপ। চৌরাস্তার ওপর, তারপর কিছুটা গিয়ে এস.ডি. ও-র বাংলো।

পান্থপাদপ আসতে রীণা বলল।

আপনি তো এখানে নামবেন ?

না, চৌধুরী মাথা নাড়ল, আপনাকে পৌঁছে দেব। কি জানি, যা ভুলো মন আপনার, টাঙ্গায় হয়তো ছোট সুটকেশটা কিম্বা হ্যাণ্ডব্যাগটা ফেলে যাবেন।

যান্, আরক্ত মুখে রীণা উত্তর দিল।

সামনের বাগানে কৃষ্ণা বেড়াচ্ছিল। গেটের সামনে টাঙ্গা থামতে সে এগিয়ে এল।

কৃষ্ণা সত্যিই কৃষ্ণা। শীর্ণদেহ। চোখে দারুণ পুরু লেন্সের চশমা।

রীণাকে দেখে লাফিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

আরে তুই! খবর দিস নি কেন?

এমনই চমকে দেব বলে।

আয়, আয়, ভিতরে আয়।

টাঙ্গা থেকে নেমে চৌধুরী দাঁড়িয়েছিল।

সে ছোট সুটকেশ এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার জিনিস। আমি চলি।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চৌধুরীর দিকে চেয়ে রইল।

রীণা অপ্রস্তুতভাব কাটিয়ে উঠে বলল, আয় তোর সঙ্গে আলাপ করে দিই। ইনি হচ্ছেন—

আলাপ করে দিতে গিয়ে রীণার মনে পড়ে গেল, ভদ্রলোকটির নাম পরিচয় কিছুই তার জানা নেই।

অবস্থা বুঝতে পেরে চৌধুরী নিজেই বলল।

আমার নাম সুকোমল চৌধুরী। গতমাসে বিলাত থেকে এফ. আর. সি. এস হয়ে ফিরেছি। এখনও কোথায় প্র্যাকটিশ শুরু করব ঠিক করি নি। এখানে পান্থপাদপে উঠেছি।

কৃষ্ণা দুটো হাত যোড় করে নমস্কার করে বলল।

আমার পরিচয় হয়তো রীণার কাছে পেয়েছেন। আমি কৃষ্ণা বাগচী। চোখের জন্য পড়াশোনা বন্ধ করে বাড়ীতে বসে আছি। ডাক্তার বলেছেন, পড়াশোনা বন্ধ না করলে অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসুন ভিতরে আসুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।

রীণা বলল, ইনি না থাকলে যা বিপদে পড়তাম।

ট্রেনে সুটকেশ ফেলে আসার কাহিনী রীণা কৃষ্ণাকে বলল।

সব শুনে কৃষ্ণা বলল, কি ব্যাপার বল তো! এখনও তুই সে রকমই অন্যমনস্ক আছিস। সব সময় কি ভাবিস? ক্লাসেও তো কতবার বইখাতা ফেলে যেতিস।

তিনজনে চায়ের টেবিলে বসল।

কৃষ্ণার মা নেই। এক পিসি দেখাশোনা করে।

পিসি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা। বিধবা। স্বল্পভাষী।

দু একটা কথা বলেই সরে গেল।

একটু পরেই ডাক্তার চৌধুরী যাওয়ার জন্য উঠল।

রীণা আর কৃষ্ণা তার সঙ্গে এল গেট পর্যন্ত।

রীণা বলল, কাল আমি তাহলে স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকে সুটকেশটা নিয়ে নেব।

তাই করবেন। তার আগে একবার ফোন করে জেনে নেবেন, সুটকেশটা এসে পৌঁছাল কিনা। নমস্কার।

গেট পার হয়ে সুকোমল চলে গেল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত রীণা নিজের কথা ভাবল।

একই কামরার দুদিকে দুটো খাট। একটা খাটে কৃষ্ণা, আর একটায় রীণা।

বোঝবার মতন জ্ঞান যখন হল, তখন থেকে রীণা খ্রীশ্চান মিশনারী প্রতিষ্ঠানে মানুষ। মাবাপের কথা কোনদিন শোনে নি। দূরসম্পর্কের কোন আত্মীয়ও দেখা করতে আসত না।

মাসান্তে গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট একটি লোক আসত। মিশনারীতে তার ভরণ-পোষণের জন্য কিছু টাকা দিয়ে যেত।

মিনিট কয়েকের জন্য রীণার সঙ্গে দেখা করত। দু একটা কথাবার্তাও বলত, কিন্তু সে কথাবার্তায় কোন আবেগ ছিল না।

নিছক কর্তব্য করে যাচ্ছে এমনই ভাব।

এক একসময় রীণার খুব নিঃসঙ্গ বোধ হত।

স্কুলকলেজের ছুটির সময়ে যখন মেয়েরা যে যার বাড়ীতে চলে যেত, তখন রীণা একেবারে একলা। চুপচাপ বসে থাকত কিম্বা পায়চারি করত।

ভাবতে আশ্চর্য লাগত, এত বড় পৃথিবীতে কোথাও তার দূরসম্পর্কের কোন আত্মীয়ও নেই।

মিশনারীর ফাদারদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছে।

আচ্ছা, আমার মা-বাবার কোন খবর আপনারা জানেন?

তারা ঘাড় নেড়েছে।

না, তাঁদের কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই।

আমাকে কোথায় পেলেন আপনারা?

একটু দম নিয়ে একজন ফাদার বলেছিল।

এক মেলায় তোমাকে কুড়িয়ে পাই। তখন তোমার বয়স বছর তিনেক। বাপ-মার কোন ঠিকানা বা নাম তুমি দিতে পার নি।

যে লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি কে?

তিনি তোমার কেউ নন। মিশনের বন্ধু। অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি যে অর্থ দেন, সেটা তোমার ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়।

লোকটিকেও রীণা সরাসরি প্রশ্ন করেছে।

আচ্ছা, আমার মা-বাপকে আপনি চেনেন?

আমি। আমি চিনব কি করে?

আপনি এত বছর ধরে সাহায্য করছেন, তাই ভাবছিলাম, আপনি হয়তো আমার পরিচয় জানেন।

লোকটি আর কোন কথা বলে নি।

রীণাও নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে।

কলেজে দু একজন অন্তরঙ্গ সহপাঠিনীর কাছে বন্ধের সময় চলে যেত।

কৃষ্ণা কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়লেও, রীণার সঙ্গে ছাড়ে নি।

মাঝে মাঝে তার কাছে চলে আসত।

পরের দিন মিস্টার বাগচী নিজে স্টেশনমাস্টারকে ফোন করলেন।

হ্যাঁ, সুটকেশ এসে গেছে। স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় আছে। রীণা দেবী এসে সই করে নিয়ে যেতে পারেন।

বিকাল হতেই কৃষ্ণা আর রীণা বের হল।

যাবার পথে পান্থপাদপ ঘুরে গেল।

সুকোমল লনে চেয়ার পেতে বসেছিল। ওদের দেখে এগিয়ে এল।

কি, সুটকেশ আনতে নাকি!

হ্যাঁ। আপনিও চলুন না সঙ্গে।

সুকোমল দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গ নিল।

সেই শুরু, তারপর যতদিন রীণা ওখানে ছিল, প্রত্যেকদিন বিকালে একসঙ্গে বেড়ানো হত।

মাঝে মাঝে শুধু দুজন। চোখের যন্ত্রণায় কৃষ্ণা বের হতে পারত না, তখন রীণা আর সুকোমল।

তিনজন থাকলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেড়িয়ে ফিরত, কিন্তু যেদিন দুজন. সেদিন ঘণ্টাদুয়েকের ওপর লেগে যেত।

পথ ছেড়ে শালমহুয়ার জঙ্গলের মধ্যে দুজনে ঢুকত। বসত পাশাপাশি।

এমনও হত, কোন কথা নয়, শুধু হাতে হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকা। পরস্পরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে।

ব্যাপারটা জানাজানিই হয়ে গেল। দুজনের কেউ লুকাল না।

কলেজের বন্ধ শেষ হতে দুজনে একসঙ্গে ফিরল।

ফার্স্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করে।

বিয়ের আগে রীণা কথাটা বলেও ছিল।

জান, আমার কিন্তু কোন সামাজিক পরিচিতি নেই। যে পদবী আমি ব্যবহার করি, তার ওপর আমার অধিকার আছে কি না জানি না। আমার জন্মের কথাও আমি বলতে পারব না।

সুকোমল হেসেছে। সব কিছু উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলেছে।

আমার প্রয়োজন পঙ্কজকে। পাঁকের কুলুজিতে আমার আগ্রহ কম।

নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। রেজেস্ট্রী করে।

পরে দু তরফের বন্ধুদের প্রীতিভোজে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল।

সেইদিন লোকটি এসেছিল।

যে লোকটি এত বছর অর্থ সাহায্য করে এসেছে। রীণা যখন মিশনে থাকত তখন গিয়ে দেখা করেছে।

তখনও অতিথিরা আসতে শুরু করে নি। সুকোমল বাইরে। নার্সিং হোমের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। রীণা আয়োজনের তদারক করছিল, কামিনীর মা খবর দিল, মেমসাহেবকে এক বাবু নীচে ডাকছেন।

আমাকে!

রীণা একটু বিস্মিত হয়েছিল। ভেবেছিল হয়তো অতিথিদের কেউ।

মুখে হালকা প্রসাধন সেরে নীচে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আপনি?

এলাম।

রীণা অস্বীকার করতে পারবে না সারা পৃথিবীতে এই একটিমাত্র লোক যার দয়া আর আনুকূল্যে সে লেখাপড়া শেষ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছে। এর অর্থসাহায্য না পেলে রীণা কোথায় তলিয়ে যেত ঠিক আছে!

সে বলল, আমার নতুন চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন আমি বিয়ে করেছি। আপনার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আপনার ঠিকানা আমার জানা ছিল না, না হলে আজকের অনুষ্ঠানে আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নিমন্ত্রণ করে আসতাম।

লোকটি রীণার সীমন্তের দিকে একমুহূর্ত দেখল, তারপর বলল, হ্যাঁ, ডাক্তার

চৌধুরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের খবর আমি কাগজে দেখেছি। তুমি কি তোমার স্বামীকে নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলেছ ?

আমার সম্বন্ধে কিছুই তো আমার জানা নেই। যেটুকু জানি সেইটুকুই সুকোমলকে বলেছি। আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

হ্যাঁ জানি। আজ তোমাকে সেই কথা বলতে এসেছি।

রীণা পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। তার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ছিল না।

খুব ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলল, বলুন।

আমার নাম অমর রায়। সেই থেকেই তোমার পদবী রায় হয়েছে।

আপনি, আপনি তাহলে আমার বাবা ?

তাও বলতে পার।

রীণা উঠে প্রণাম করতে যেতেই লোকটি বাধা দিল।

সবটা শোন আগে।

রীণা আবার চেয়ারে বসল।

তোমার মা ভদ্রঘরের ছিল না। মানে সোজা কথায় যাকে পতিতা বলে তাই বড়বাজারে আমার মসলাপাতির কারবার। তোমার মাকে আমার রক্ষিতা হিসাবে রেখেছিলাম। আলাদা ঘরে রাখতাম। রোজ বিকালে আমি যেতাম। তারপর তুমি হলে। তোমার বয়স যখন বছর তিনেক তখন রত্না, মানে তোমার মা মারা গেল। মরবার সময়ে আমার দুটি হাত ধরে বলে গিয়েছিল, তোমার যেন দেখাশোনা করি। ভদ্রঘরের মেয়েদের মতন তোমাকে মানুষ করার চেষ্টা করি। তুমি তো জান, আমি তাই করেছি। এবার তুমি নতুন জীবনে প্রবেশ করছ, আমার দায়িত্ব শেষ। তবু আমার মনে হয় আসল পরিচয়টা তোমার জানা প্রয়োজন। তুমি যদি উচিত মনে কর, তাহলে তোমার স্বামীকে সব কথা জানাতে পার। বিবাহ একটা পবিত্র বন্ধন। সেখানে লুকোচুরির কোন স্থান নেই। আজ চলি।

লোকটা যখন বেরিয়ে গেল, তখনও রীণা বিহ্বলের মতন বসে। দুটো হাত কোলের ওপর জড়করা।

অনুভব করতে পারল, এতদিন পরিচয়হীনতার যে গাঢ় যবনিকা চারপাশে ঘিরে ছিল, সেটা যেন আরো কৃষ্ণ, আরো সর্বনাশা হয়ে উঠেছে।

সে পতিতার সন্তান! ভদ্রসমাজে তার কোন স্থান নেই। পঙ্ক আর পঙ্কজের যে উপমা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, সেটা যে কত অর্থহীন, সেটা বোঝার মতন বুদ্ধি রীণার আছে।

এখন তার কি কর্তব্য।

সে কি সব কথা সুকোমলকে খুলে বলবে ? তারপর ? কি হবে সুকোমলের প্রতিক্রিয়া !

এত সুখ, এত শান্তি, ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ষোলআনা সম্ভাবনা।

অনেক ভেবেচিন্তে কিছু না বলাই ঠিক করল।

মানুষের মনের কথা বলা যায় না।

সুকোমল যতই বিদেশে শিক্ষিত হোক, কুসংস্কারের উর্ধ্বে, কিন্তু এরকম একটা ঘটনা কানে গেলে নিশ্চয় বিচলিত হয়ে পড়বে।

দিন ভালই কাটতে লাগল। সুকোমল প্রথম প্রথম আদরে সোহাগে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

তারপর সুকোমলের জীবিকা অল্প অল্প করে তাকে সরিয়ে নিল রীণার কাছ থেকে।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবল কাজ, কাজ আর কাজ।

নার্সিং হোম তাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলল।

রীণার নিঃসঙ্গ জীবন শুরু হল।

নিঃসঙ্গতাকেই রীণার সব চেয়ে বড় ভয়।

মাকে রীণা কোনদিন দেখে নি। মায়ের কোন ফোটোও তার কাছে ছিল না।

কিন্তু পতিতাবৃত্তি কি সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণা আছে।

রীণার আপসোস হল।

অমর রায় নামের লোকটা যে রীণার বাবা বলে পরিচয় দিয়ে গেল, তাকে মায়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হত।

কেমন দেখতে ছিল মাকে ? মায়ের কোন ফোটো কি আছে তার কাছে ?

কোথায় থাকত মা ?

কিন্তু যে রকম আকস্মিকভাবে লোকটা মায়ের জীবিকার পরিচয় দিল, তারপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে আর রীণার প্রবৃত্তি হল না।

একদিন জীবনে বিপর্যয় ঘটল।

দোকানে কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন ছিল, সেই জন্য সুকোমল বিকালে গাড়ীটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কেনাকাটা সেরে ফেরার পথেই বিপত্তি।

কি এক উপলক্ষ্যে বিরাট এক মিছিল চলেছে। পথঘাট বন্ধ। রাস্তার দু

ঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করে রীণা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

একসময়ে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে বলেছিল।

যোগীন্দর, গাড়ী ঘুরিয়ে অন্য কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না? রাস্তা কখন পরিষ্কার হবে কে জানে।

অন্য রাস্তা? যোগীন্দর চিন্তা করেছিল।

হ্যাঁ, সরু কোন সড়ক দিয়ে যাওয়া যায় না?

যাওয়া যায় মেমসাব। কিন্তু—

যোগীন্দরের কণ্ঠ দ্বিধান্বিত।

কিন্তু কি?

সড়কটা ভাল নয় মেমসাব।

ভাল নয়? হোক খারাপ। আস্তে আস্তে চল।

রীণার ধারণা ছিল, বোধহয় সড়ক মেরামত হচ্ছে।

ভাগ্য ভাল। মোটর চৌরাস্তায় আটকেছিল। ময়দানের পাশে। গাড়ী ঘোরাবার কোন অসুবিধা ছিল না। না হলে, ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হত।

গাড়ী ঘুরে ঘুরে সড়কে ঢুকল।

আর তখনই রীণা সড়কের স্বরূপ বুঝতে পারল।

রাস্তার দু পাশে সার সার মেয়ে দাঁড়িয়ে। মুখে রঙমাখা। কারও হাতে সিগারেট। কয়েকজন জটলা করে হাসিঠাট্টা করছে।

মোটর থেকে ঝুঁকে পড়ে রীণা দেখল।

এরাই পতিতা। এই ভাবে এরা জীবিকা অর্জন করে। শীতে, গ্রীষ্মে, দিনের পর দিন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার দু পাশে।

সড়ক পার হতে রীণা জিজ্ঞাসা করল।

এ গলিটার নাম কি যোগীন্দর?

রতন মিস্ত্রী লেন।

সারাটা রাত রীণা ঘুমাতে পারল না।

যতবার চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করে, চোখের সামনে রতন মিস্ত্রি লেনের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

সার সার মেয়েরদল। সস্তা প্রসাধনে নিজেদের সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর কি করে তারা?

খদ্দেরের সঙ্গে দরাদরি করে। দর ঠিক হলে লোকটাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

পৃথিবীর আদিমতম পেশা।

পরের দিন দুপুরে বাড়ী খালি হয়ে যেতে রীণা অদ্ভুত এক কাণ্ড করল।

নিজের পরনের শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে আলমারি খুলে কলেজ জীবনের কথঞ্চিৎ সস্তা দামের শাড়ী ব্লাউজ অঙ্গে জড়াল। মুখে পাউডারের প্রলেপ দিল। ঠোঁটে গাঢ় লাল রংয়ের লিপস্টিক।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়াল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজের প্রতিবিম্ব।

কালকের রাতের রাস্তার ওপর দাঁড়ানো মেয়েগুলোর মতন দেখাচ্ছে কি?

তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন দেখাবে রীণাকে!

কথাটা ভাবতে ভাবতে আর একটা কথা তার মনে পড়ে গেল।

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত হয়ে উঠল দুটি গাল।

তার মাও তো এইভাবেই দাঁড়াত!

লোকটা বলে গেছে, তার মা সস্তাদরের গণিকা ছিল।

এ ভাবে জীবিকার জন্য রাস্তায় দাঁড়ানো একটি মেয়ের গর্ভে তার জন্ম।

রক্তে তার গণিকাবৃত্তির বীজ।

হঠাৎ রীণার ভয় করতে লাগল।

একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অসহায় মনে হল নিজেকে।

মনে হল, অভিজাত এ সংসারের সে যেন কেউ নয়।

যে মানুষটা পরিবেশ ভুলে, জন্মের ইতিহাস ভুলে তাকে বুকে তুলে নিয়েছে তার ওপর সে তৃপ্ত নয়।

তার মানে এক পুরুষে সে বুঝি তৃপ্ত নয়?

টেনে টেনে রীণা শরীর থেকে পরিচ্ছদ খুলে ফেলল।

সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে।

রীণা নিঃসন্দেহে সুন্দরী।

শুধু সুন্দরীই নয়, সুগঠিতা দেহেরও অধিকারিনী।

একলা ঘরে থাকতে রীণার সাহস হল না।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দরজা খুলে বাইরে চলে এল।

এই মুহূর্তে সুকোমলকে তার খুব প্রয়োজন।

টেলিফোন তুলে নিয়ে নার্সিং হোমে ডায়াল করল।

একটি মেয়ে ফোন তুলল। সম্ভবত নার্স।

ডক্টর চৌধুরীকে একটু ডেকে দেবেন?

তিনি অপারেশন থিয়েটারে। কিছু বলতে হবে? তিনি বের হলে বলতে পারি। আপনি কে বলছেন?

মেয়েটির একগাদা প্রশ্নের উত্তরে রীণা ফোনটা নামিয়ে রাখল।

সুকোমল নিজের জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত।

অর্থ আর প্রতিপত্তি, এ ছাড়া অন্য কোনদিকে নজর দেবার তার অবকাশ নেই। কি প্রতিক্রিয়া হবে, রীণা যদি সুকোমলকে জানায়, সে সস্তা গণিকার মেয়ে। যে লোকটা তার বাবা বলে পরিচয় দিয়ে গেল, সে যে সত্যি তার বাপ, তার কোন প্রমাণ নেই।

বিশেষ একটা লোকের রক্ষণাধীনে না থাকলে, এককথায়, বিশেষ কারও রক্ষিতা না হলে, কে কার জনক বলা প্রায় অসম্ভব।

এসব শুনেও কি সুকোমলের প্রেম অটুট থাকবে!

প্রেম!

ইদানিং ক্লান্তদেহে সুকোমল যখন বাড়ী ফেরে, রাতের খাওয়ার পর, বিছানায় শরীর ঢেলে দেয়, তখন তার আর রীণার দেহের দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ থাকে না।

রীণাই বরং সাধ্যসাধনা করে লোকটাকে জাগিয়ে নিজের দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে।

রীণা নিজের দেহের উত্তাপ যখন সুকোমলের দেহে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত, তখনই কলিং বেল বেজে উঠেছে।

চাকর বাইরে থেকে ডেকেছে।

সাব, এক বাবু আয়া।

সুকোমল দ্রুতহাতে নিজের নগ্নশরীর স্লিপিং সুটে আবৃত করে বাইরের ঘরে এসেছে।

একটি লোক একেবারে মোটর নিয়ে এসেছে। তখনই যেতে হবে। তার স্ত্রীর অবস্থা বিপন্ন।

একটু ইতস্তত করে সুকোমল তৈরি হয়ে নিয়েছে। রাতে ডবল ফি। তাছাড়া প্রয়োজন হলে মহিলাকে নার্সিং হোমে ভর্তি হবার নির্দেশ দেওয়া যাবে।

অতৃপ্ত কামনা নিয়ে রীণা বিছানায় ছটফট করেছে।

সুকোমলের জীবিকা তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু রীণা কি করে জীবন কাটাবে!

একদিন কথাটা সে সোজাসুজি সুকোমলকে বলেই ফেলল।

সুকোমল বসে বসে একটা মেডিকেল জার্নাল পড়ছিল।

রবিবার। শুধু সকালে নার্সিং হোম ঘুরে আসে। বিকালে যেতে হয় না।

রীণা এসে পাশে বসল।

বেশ আছ তুমি!

জার্নাল থেকে মুখ তুলে সুকোমল বলল।

বেশ আছিই বটে। সাতনম্বর কেবিনে এক মাড়োয়ারি মহিলা এসে জুটেছে। সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রসব করার নাম নেই, কেবল চীৎকার। ফলস পেইন, কিন্তু সারা নার্সিং হোমে কারও চোখে ঘুম নেই।

আমি কিন্তু তোমাদের নার্সিং হোমে ভর্তি হব না।

তুমি! তুমি ভর্তি হবে কেন?

যে জন্য মেয়েরা ভর্তি হয়।

সে কি!

সুকোমল একেবারে আঁতকে উঠল। তারপরই রীণার মুখের দিকে কিছুক্ষণ দেখে বলল, যত বাজে কথা। হতেই পারে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে রীণা উত্তর দিল।

কেন, হতে পারে না কেন?

আমরা যথেষ্ট সাবধানী। সে সব কিছু হবার সম্ভাবনা তোমার নেই।

রীণা সোফায় বসেছিল। সোজা উঠে দাঁড়াল।

আমার শরীর নিয়ে আমি তোমাকে খেলতে দেব না। আমি মা হতে চাই।

আমার শরীরে মা হবার উপকরণ রয়েছে।

সুকোমল কিছুক্ষণ রীণার দিকে অপলক চোখে দেখল তারপর বলল, অবুঝ হয়ো না। তোমার এমন চমৎকার দেহ। নিটোল যৌবন। ছেলেমেয়ে হলে এ শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

রীণা আর কিছু বলল না। সুকোমলের সামনে থেকে সরে গেল।

তারপর থেকে সুকোমল যেন আরও সাবধান হয়ে গেছে।

পাশে বাড়তি যে শোবার ঘর ছিল, সেখানে শোবার আয়োজন করল।

রীণা জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

কি হবে! একটু বেশী রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হয় আজকাল। আলো জ্বালালে তোমার অসুবিধা হবে। তাই।

রীণা কোন কথা বলল না।

ঘর দিতে আমার আর কি অসাধ বাছা। হাঙ্গামা না হয়, তাতেই আমার ভয়।

তোমাদের মতন মেয়েই তো আমার লক্ষ্মী। শোন বাছা, ঘরভাড়া মাসে কুড়ি টাকা আর রোজগারের সিকিভাগ আমার পাওনা। আর দিশী যা আনাবে, আমার কাছ থেকে নিতে হবে। বাইরে থেকে আনাতে পারবে না। কী রাজী ?

রীণা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে একটা চাবি খুলে নিয়ে সোহাগীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সোহাগী, ছনম্বর ঘরটা খুলে দে। ঝাটপাট যা দেবার করিয়ে নে। কোণের দিকে বোধহয় বিছানা গোটানো আছে, পেতে নে।

কথাগুলো বলে মাসি আবার কাত হল।

তারপর থেকে শুরু হল রীণার রহস্যময় দ্বৈতজীবন।

এই নতুন জীবনের উৎস কি ?

সুকোমল চৌধুরী তার দেহের ক্ষুধা মেটাতে আগ্রহী নয়, সেই জন্য রীণা অন্ধকারের এই নরকে নেমে আসবে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সমাজের যে পর্যায়ে সুকোমলের স্থান, তার দৌলতে যে পরিবেশে রীণা ঘোরা-ফেরা করে, সেখানে সুন্দর পুরুষের অভাব নেই।

তেমন কোন পুরুষের সঙ্গে রীণা অনায়াসেই নিজেকে জড়াতে পারত।

তার অফুরন্ত সুযোগ। দিনের মধ্যে ক ঘণ্টা আর সুকোমল বাড়ীতে থাকে। তাছাড়া সে পুরুষকে নিয়ে বাইরে কোন হোটেলে চলে যাবার পথেই বা বাধা কোথায়।

কিন্তু এসব কিছু না করে রীণা একেবারে সস্তাদরের গণিকা সাজে। মুখে রং মেখে পথের ওপর দাঁড়ায়। দরদস্তুর বিশেষ করে না। সেটা ওকে করতে হয় না। তবে ওরই মধ্যে একটু বাছাই করে। টাকা দিলেও কুলিমজুরকে ঘরে ঢোকায় না।

এভাবে উপার্জনের পয়সাও বাড়ী আসে না।

মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আসে।

বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রীণা অনেক ভেবেছে।

কেন এমন হয়।

সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যেন রক্তের বান ডাকে। কে যেন ওকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে, সাজপোশাক বদলিয়ে রতন মিস্ত্রি লেনে টেনে নিয়ে যায়।

তার মা-ও পতিতা ছিল।

হয়তো এইভাবে সাজগোছ করে আর এক রতন মিস্ত্রি লেনে দাঁড়াত। দেহ

বাঁধা দিয়ে জীবিকা উপার্জন।

মায়ের নাম রম্ভা। বাপের নাম জানা নেই।

যে লোকটা তার ভরণপোষণের টাকা মাস মাস দিয়ে যাচ্ছিল, সেই যে তার বাবা, তার কোনই প্রমাণ নেই।

কি করে রীণা ভাল হবে!

বাইরে মোটরের শব্দ।

রীণা বিছানার ওপর উঠে বসল।

কতদিন সে মনে মনে ঠিক করেছে, ডাক্তার চৌধুরীকে সব কথা বলবে।

সম্ভবত এ এক ধরনের ব্যাধি। মনঃসমীক্ষক দিয়ে চিকিৎসা করালে সেরে যেতে পারে। রীণা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু রীণার সাহস হয় নি।

আশ্রয় হারালে সে কোথায় যাবে।

যে জীবিকা তার ভীতির উৎস, তাই সম্বল করে বাঁচতে হবে।

তখন আর উপার্জনের অর্থ বিলিয়ে দিয়ে আসা চলবে না।

রীতিমত দরদস্তুর করে নিজের মাংসের দাম ঠিক করতে হবে।

তার চেয়ে একমুঠো ঘুমের ওষুধ মুখে ফেলে দেওয়া অনেক আরামের।

গ্লানির জীবন থেকে অব্যাহতি।

দরজায় খুট খুট শব্দ।

সুকোমল ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

এই জন্য রীণার আরও রাগ হয়।

লোকটা এমন ব্যবহার করে যেন বাইরের কেউ।

শব্দ না করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেই বা ক্ষতি কি!

রীণা তো তার স্ত্রী।

তাকে যদি একটু অসংবৃত অবস্থায় দেখে তাহলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

এস।

সুকোমল ঘরের মধ্যে ঢুকল।

বালিশে হেলান দিয়ে রীণা আবার শুল।

তুমি দরজায় ঠক ঠক কর কেন বল তো?

বা, তুমি শুয়ে রয়েছ।

তাতে ক্ষতি কি! আমি যদি উলঙ্গ হয়ে থাকি, আমার শরীরে একটুকরো

সুতোও না থাকে, তাতে তোমার আসতে বাধাটা কোথায়! তোমার কাছে আমার আব্রুর কোন মানে হয়?

সুকোমল এককোণে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল।

রীণার গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজে মদ খায় না, কিন্তু তার ঘরে বসে মদ্যপান করায় বাধা দিতে পারে না।

অনেকেই মাসিকে দিয়ে বাইরে থেকে মদের বোতল আনায়, তার সঙ্গে মাংসের চাট।

কালকের ভদ্রলোক কোন এক অফিসের বড়বাবু। সাজপোশাকে মনে হল মাইনে ভালই পায়। মদ খেতে খেতে রীণার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশংসা করছিল।

শুনে রীণা রক্তিম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আবার ভালও লাগছিল।

সুকোমল সে সব শুনলে বোধহয় মূর্ছা যেত।

তোমার নার্সিং হোমের খবর কি?

এই প্রশ্নে সুকোমল উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ভালোই। রোগিনীর সংখ্যা দিন দিন খুব বাড়ছে।

রোগিনীর সঙ্গে প্রেমট্রেম করছ না।

রোগিনীর সঙ্গে প্রেম? সুকোমল বিস্মিত হল, তারা আমার এখানে আসে রোগ সারাতে কিম্বা প্রসব করতে। তাদের সঙ্গে প্রেম কি?

প্রেমও তো একধরনের রোগ, জান না?

কি জানি, জানা ছিল না। তোমার মাথাখারাপ হবার আর দেরী নেই।

মাথাখারাপ!

তাছাড়া আর কি। দিনরাত বাড়ীর মধ্যে বসে আছ। বললাম, গোল্ডেন ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাও।

তুমি নিয়ে চল সঙ্গে করে।

ঠিক আছে, সামনের রবিবার তোমাকে নিয়ে গিয়ে মেম্বার করে দেব।

মাঝরাতে রীণার ঘুম ভেঙে গেল।

নীলাভ বাতি জ্বলছে। রীণার অঙ্গে পাতলা চীনাংশুকের নাইটি। তার যৌবনকে আরও প্রকট, আরো উদ্দাম করে তুলেছে।

পা টিপে টিপে রীণা সুকোমলের ঘরে চলে এল।

সুকোমলের পরনে ফিকেনীল স্লিপিং সুট।

একটা হাত বুকের ওপর।

টেবিলল্যাম্পটা নেভায় নি। তার আলো সুকোমলের মুখের ওপর এসে পড়েছে। সুকোমলের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই রীণা থেমে গেল।

তার রতন মিস্ত্রি লেনের জীবনে বহু পুরুষের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়। কার কি রোগ আছে জানা সম্ভব নয়।

রীণা অবশ্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে, কিন্তু এসব বিষয়ে জোর করে কিছুই বলা যায় না।

যদি তার দেহে কোন রোগ এসে থাকে, কি হবে সুকোমলের দেহে সে রোগ সংক্রামিত করে।

তার চেয়ে আগে একবার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া সমীচীন।

ধীর পায়ে রীণা নিজের বিছানায় ফিরে এল।

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। অনেকক্ষণ ধরে।

মনে মনে ঠিক করল, কাল ছটার সময় বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাবে।

কোন সিনেমাহলে আত্মগোপন করে থাকবে, কিম্বা মার্কেটিং-এ ব্যস্ত।

সাতটার সময় বাড়ীর ধারেকাছে থাকবে না।

পরের দিন পাঁচটা বাজতেই রীণা বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

সিনেমার টিকিট আগে থেকে কিনে আনিয়েছে।

রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরে নেবে।

সাড়ে আটটায় সিনেমা শেষ।

রীণা সোজা বাড়ী ফিরবে না। নার্সিং হোমে গিয়ে সুকোমলকে অবাক করে দেবে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার সঙ্গে মোটরে ফিরবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের ঘরে পা রেখেছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

একটি ভদ্রলোক যেন বাইরে থেকে ছুটকে ঘরের মধ্যে পড়ল।

ডক্টর চৌধুরী আছেন? ডক্টর চৌধুরী?

মুখ তুলে 'না' বলতে গিয়েই রীণা থেমে গেল।

একি! এই লোকটাই তো দিনকয়েক আগে রতন মিস্ত্রি লেনে তার ঘরে অতিথি হয়েছিল। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রীণার অঙ্গ-প্রতঙ্গের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় মেতে ছিল।

এ লোকটা কি চায় এখানে?

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখে চাপা দিয়ে রীণা বলল ডক্টর চৌধুরীকে এখানে পাবেন না।

তবে কোথায় পাব?

তাঁর নার্সিং হোমে খোঁজ করুন।

নার্সিং হোমে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে নেই।

আপনি একটু বসুন, আমি দেখছি।

লোকটার সামনে থেকে রীণা পালিয়ে বাঁচল।

ওপরে এসে ফোন করল। নার্সিং হোমে।

ডক্টর চৌধুরী কাছে কোথায় পেশেন্ট দেখতে গিয়েছিলেন, এখন ফিরেছেন।

রীণা বলল, কে বলেছে, উনি বাড়ীতে এসেছেন, তাই বাড়ীতে ওঁকে একজন খুঁজতে এসেছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর ফোনের ওপার থেকে ভেসে এল।

হ্যাঁ, এখানকার নতুন রিশেপসনিস্ট ভুল করে বলেছে ডক্টর চৌধুরী বাড়ী গেছেন। আপনি দয়া করে লোকটিকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিন।

রীণা আর নীচে নামল না। নীচে নামবার সাহস তার নেই।

লোকটার মুখোমুখি হওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা।

কামিনীর মাকে দিয়ে খবর পাঠাল।

ডক্টর চৌধুরী নার্সিং হোমে। সেখানে গেলেই দেখা হবে।

জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে রীণা দেখল।

লোকটা যেতে যেতে বারদুয়েক থামল। পিছন ফিরে বাড়ীটার দিকে দেখল, তারপর হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল।

লোকটা সরে যেতে রীণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বেশ বুঝতে পারল লোকটাও দ্বিধাগ্রস্থ।

রতন মিস্ত্রি লেনের সাধারণ এক গণিকা আর অভিজাত সমাজের ডক্টর চৌধুরীর স্ত্রী যে এক এবং অভিন্ন এমন একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রায় অসম্ভব।

অথচ চেহারার এমন মিল তুচ্ছ করার মতন নয়।

লোকটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

রীণা সিনেমার টিকেট কেনা সত্ত্বেও বের হল না।

সাতটা বাজতেই চঞ্চল হয়ে উঠল।

দরজা বন্ধ করে পরনের শাড়ী ব্লাউজ সব খুলে ফেলল।

পরিবর্তে রোজকার মতন সস্তাদামের শাড়ীজামা পরল। কাঁচপোকার টিপ কেনা ছিল। একটা টিপ নিয়ে কপালে আটকাল।

তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল।

কতবার বাইরে যাবার জন্য দরজায় হাত রাখল। মনকে শক্ত করে আবার ফিরে এল।

একটু দূরে থেকে রিক্সার ঠুনঠুন শব্দ ভেসে আসছে।

অপেক্ষা করে করে চালক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

জানলা দিয়ে রীণা উঁকি দিল।

না, এখান থেকে রিক্সা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে রীণা সহজ হল।

এই প্রথম সে রতন মিস্ত্রী লেনে গেল না।

মানসিক ক্লান্তিতে বিবর্ণ, নিস্তেজ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কেন এমন হয়?

ঘৃণিত, জঘণ্য এক জীবনের প্রতি কেন এই দুর্নিবার লোভ!

তার মা সাধারণ গণিকা ছিল বলে তাকেও সেই জীবন গ্রহণ করতে হবে; এর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

রাত্রে সুকোমল চৌধুরী বাড়ী ফিরতে রীণা জিজ্ঞাসা করল।

কি ব্যাপার, তোমার লোকেরা এবার যে বাড়ীতে আসতে আরম্ভ কবেছে!

বাড়ীতে?

হ্যাঁ, আজ একজন খুঁজতে এসেছিল।

ও, সুকোমল হাসল, ভদ্রলোকের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা তাই ছুটোছুটি করছেন।

কি হল?

কি আর হবে। ভদ্রমহিলাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। রাত সাড়ে আটটায় তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। ভদ্রলোক আনন্দে অনেক টাকার সন্দেশ বিলি করলেন।

এই প্রথম সন্তান বুঝি?

না না, এটি ছ নম্বর। তবে পুত্র এই প্রথম। ভদ্রলোক এক একবার এক একটি নার্সিং হোমে মিসেসকে ভর্তি করেছিলেন। এবারে আমার নার্সিং হোমের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

রীণা এবারে এক আশ্চর্য কাণ্ড করল।

সুকোমলকে ব্যগ্রবাহুর বন্ধনে জড়িয়ে বলল।

শোন, এবার আমার একটি সন্তান চাই। তার আগে ডাক্তারকে দিয়ে নিজেকে একবার পরীক্ষা করতে চাই।

ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা! কেন?

আমার মনে হচ্ছে, আমার যেন একটা খারাপ রোগ হয়েছে।

খারাপ রোগ! সুকোমল হাসল, আমার মনে হয় তোমার মাথার গোলমাল

হয়েছে। আগে মাথার চিকিৎসা করা দরকার।

না না, সত্যি বলছি। তুমি আমার সম্বন্ধে কি জান? কতটুকু। বিয়ের আগে আমি কেমন মেয়ে ছিলাম, জান? এই যে সারাটা দিন আমি একলা থাকি, আমি কি করি তোমার তো জানবার কথা নয়।

সারাদিনে সুকোমলকে তিনটে ডেলিভারি কেস করতে হয়েছে। রীতিমত পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছে।

এখন এসব আবোলতাবোল কথা শোনবার অবসর নেই।

সে বলল, রীণা, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তাছাড়া আমি খুব ক্লান্ত। খেতে দেবার ব্যবস্থা কর।

খাওয়ার পর সুকোমল কিছুক্ষণ বসে বসে মেডিকেল জার্নাল পড়ে। কিন্তু সে রাতে আর পড়া হল না।

রীণা এসে পাশে বসল। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে।

রীণার দুঃখ যে সুকোমল একেবারে বোঝে না, তা নয়। জীবিকার জন্য সুকোমল জীবনকে অগ্রাহ্য করছে। রীণার নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য সে কিছুই করে নি। অবশ্য কিই বা সে করতে পারে।

সুকোমল ঠিক করে ফেলল, সে ছাড়া নার্সিং হোমে আরও দুজন ডাক্তার আছে। তাদের ওপর ভার দিয়ে অন্তত দিন পনেরোর জন্য রীণাকে নিয়ে বাইরে যাবে।

সেই কথাই রীণাকে বলল।

চল, কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে আসি।

রীণা খুব খুশী। আনন্দ-উদ্বেল কন্ঠে বলল।

সত্যি যাবে, কেবল তুমি আর আমি।

হুঁ শুধু দুজনে। তুমি কি ভেবেছ আমার নার্সিং হোমের পেশেণ্টদেরও নিয়ে যাব?

সে রাত্রে রীণা সুকোমলকে পলকের জন্যও চোখ বুজতে দিল না।

আদরে সোহাগে অস্থির করে দিল।

সকালে সুকোমল নার্সিং হোমে যাবার সময়ে রীণা আবার স্মরণ করিয়ে দিল।

ছুটি নেবার কথা মনে আছে তো?

মাথা নেড়ে সুকোমল মোটরে গিয়ে উঠল।

দুপুরবেলা রীণা বিছানায় শুয়েছিল, দরজায় খুট খুট শব্দ।

রীণা ঘুমায় না। ঘুমালে শরীরে মেদ সঞ্চার হবে। দেহের গঠন নষ্ট হবে।

জিজ্ঞাসা করল, কে রে?

কামিনীর মা বাইরে থেকে বলল।

আমি মা। আপনাকে নীচে একজন ডাকছেন।

আমাকে ?

অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করে নিয়ে দরজা খুলে রীণা জিজ্ঞাসা করল।

কে ডাকছে ?

চিনি না মা। বলছেন, মিসেস চৌধুরীকে ডেকে দিতে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রীণা নেমে এল।

তবে কি সুকোমল নার্সিং হোম থেকে বাইরে যাবার ব্যাপারে কোন খবর পাঠিয়েছে।

হয়তো কালই যাওয়া ঠিক হয়েছে। তাই দ্রুত গোছগাছ করে নিতে হবে।

বাইরের ঘরে পা দিয়েই রীণা থমকে দাঁড়াল।

সেই লোকটা।

একহাতে লাল গোলাপের গুচ্ছ, অন্যহাতে সন্দেশের বড় প্যাকেট।

কি চাই ?

রীণা রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

না, মানে ডক্টর চৌধুরীর জন্য এগুলো এনেছি।

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হল।

নার্সিং হোমে যান, এখানে কেন! আর তাছাড়া এসব কিসের জন্য ?

এবার লোকটির মুখে যেন হাসির আভা দেখা দিল।

আমার অনেকগুলো মেয়ের পর এবার ছেলে হয়েছে। ডক্টর চৌধুরীর হাতেই ডেলিভারি হয়েছে।

একটু থেমে লোকটি আবার বলল।

বুঝতেই পারছেন নার্সিং হোমে এসব নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে। সেখানে তো আরও ডাক্তার রয়েছেন। আপনি বারণ করবেন না, এগুলো এখানে রেখে যাচ্ছি।

লোকটা সেণ্টার টেবিলের ওপর গোলাপগুচ্ছ আর সন্দেশের বাক্স নামিয়ে রাখল। যেতে যেতে একবার ফিরে দেখল।

দৃষ্টিতে দুর্বার কৌতূহল।

এ দৃষ্টির অর্থ রীণার অজানা নয়।

লোকটা মিল খোঁজার চেষ্টা করছে।

কে জানে, ফুল আর মিষ্টি নিয়ে আসার আসল উদ্দেশ্য তার কৌতূহল নিরসন

করা কিনা।

এই লোকটার সামনে রীণা অনাবৃত দেহে ভোগের পশরা সাজিয়েছে ভাবতেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

লোকটাই বা কি!

বাড়ীতে আসন্নপ্রসবা স্ত্রী, এতগুলো সন্তানের জনক, তবু লালসার শেষ নেই। এমন অবস্থায় লোকটা দেহের তৃপ্তির খোঁজে রতন মিস্ত্রি লেনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

অবশ্য সাধারণ একটা গণিকা আর অভিজাত সমাজের ডঃ চৌধুরীর স্ত্রী এক এবং অভিন্ন এ কথা ভাববার মতন স্থূলবুদ্ধি নিশ্চয় লোকটার হবে না।

সে শুধু চেহারার মিল দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল।

রাত সাড়ে দশটায় যখন সুকোমল ফিরল, তখনও নীচের ঘরের সেণ্টার টেবিলে ফুলের গোছা আর মিষ্টির বাক্স একভাবে পড়ে।

রীণা কাউকে সেগুলো তুলে আনতে বলার উৎসাহ বোধ করেনি।

সুকোমল ওপরে এসে বলল।

কি ব্যাপার, নীচে গোলাপের গোছা দেখলাম। তোমার কোন ভক্তের দান নাকি?

রীণা হাসল।

আমার নয়, তোমারই ভক্তের উপহার।

তাই নাকি! কার?

নাম জানা নেই। তোমার কৃপায় অনেক মেয়ের পর যার ছেলে হয়েছে।

ও, মিস্টার মজুমদারের। কিন্তু তার পুত্রকে বাঁচানো মুস্কিল হবে।

কেন?

ভদ্রলোকের সিফিলিস রয়েছে। রোগটা মিসেসের দেহেও সংক্রামিত হয়েছে। ছেলেটির দেহও রোগমুক্ত নয়।

সেকি!

রীণা আর্তনাদ করে উঠল।

শুধু আর্তনাদ নয়, রীণার হাতে ক্রীমের শিশি ছিল। শিশিটা হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

কি হল?

রীণার মুখ বিবর্ণ, রক্তহীন।

ক্লান্ত, ক্ষীণকণ্ঠে রীণা বলল।

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।

তাকে সাবধানে বিছানার ওপর শুইয়ে দিতে দিতে সুকোমল বলল।

এত করে বলি, রোজ বিকালে একটু বেড়াও। দিনরাত বাড়ীর মধ্যে বন্দী থাকলে শরীর খারাপ তো হবেই।

সুকোমল রীণার প্রেসার, নাড়ি পরীক্ষা করল। মারাত্মক কিছু পেল না। আলমারি থেকে ব্রাণ্ডির বোতল বের করে গ্লাসে সামান্য একটু ঢেলে রীণাকে দিল।

নাও, খেয়ে নাও।

রীণা বলল, আজ রাতে তুমি আমার কাছে শোও। আমার একলা বড় ভয় করছে। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে জ্বালাতন করব না।

রীণার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুকোমল বলল।

ঠিক আছে। তুমি তো কিছু খাবে না। আমি খেয়ে আসি, তারপর তোমার কাছেই শোব।

সুকোমল খেয়ে যখন ফিরল, তখন তার হাতে গরম দুধের কাপ।

রীণা বিছানার ওপর উঠে বসেছে। জানলায় মাথা রেখে বাইরেব দিকে চেয়ে রয়েছে।

উঠে বসলে কেন?

রীণা মুখ ফেরাল।

বলল, একটু ভাল আছি। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। ওটা কি?

গরম দুধ। খেয়ে নাও।

আপত্তি না করে রীণা দুধ খেয়ে নিল।

হ্যাঁগো, সিফিলিস সারে না?

সারবে না কেন। চিকিৎসা করলেই সারে। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

একটু দম নিয়ে রীণা বলল।

না, ওই ছেলেটার কথা ভাবছি।

সুকোমলের মুখটা কঠিন হয়ে গেল।

স্কাউণ্ড্রেল, এই সব লোককে চা[illegible]কানো উচি[illegible] বিয়ে করেছে, সন্তান রয়েছে, তাও লালসা মেটে না। বাজারে[illegible]লের কা[illegible] সুখ খুঁজতে যায়।

রীণা বুঝতে পারল, আ[illegible] সারা দেহের[illegible]ক্ত মুখে এসে জমছে। কাঁপছে আঙুলের ডগাগুলো। উঠে দাঁ[illegible]তে গেলেই হয়[illegible] ছিটকে পড়ে যাবে।

তার মনে হল একটা থামে তাকে বেঁধে সুকোম[illegible] যেন প্রাণপণ শক্তিতে চাবুক

চালাচ্ছে। চাবুকের ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীর।

সর, শুয়ে পড়ি।

না, তুমি বরং তোমার ঘরেই যাও।

কেন, তুমিই তো এখানে শুতে বললে।

বলেছিলাম, কিন্তু এখন ভাবছি, আমার যদি সারারাত ঘুম না হয়, তুমি কেন কষ্ট পাবে।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

একটা হাত দিয়ে রীণাকে বেষ্টন করে সুকোমল শুয়ে পড়ল।

পরিশ্রান্ত সুকোমল একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রীণার চোখে ঘুম নেই।

সিফিলিস ঠিক কি ধরনের রোগ তাব জানা নেই। তবে তার ভয়াবহতার কথা কিছু কিছু শুনেছে। কলেজ জীবনে চটুল বান্ধবীদের কাছে।

সত্যি যদি রীণা সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে!

কি কৈফিয়ৎ দেবে সুকোমলের কাছে।

সুকোমল তার অতীত জানতে চায় নি, বংশপরিচয় নয়, যেটুকু পেয়েছে সেটুকুই বুকে তুলে নিয়েছে।

সেই মহানুভবতার কি রীণা এইভাবে প্রতিদান দেবে!

পরের দিন সুকোমল বেরিয়ে যেতেই রীণা টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে বসল।

পাতা উল্টে উল্টে ডাক্তারের খোঁজ করল। যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ।

প্রথম যাঁকে ফোন করল, তাঁকে পেল না। বাড়ী থেকে বলল, তিনি মাসদুয়েকের জন্য কণ্টিনেন্টে গেছেন। কি এক মেডিকেল কনফারেন্সে।

দ্বিতীয়জন ডাক্তার রাহা। তিনি নিজেই ফোন ধরলেন। ঠিক হল বেলা দশটার সময় তাঁর চেম্বারে যাবে।

ঠিক সময়ে রীণা ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাসেল স্ট্রীটে চেম্বার। ট্যাক্সি থেকে নেমে রীণার একটু ভয় ভয় করল।

কি জানি ডাক্তার রাহা কি মনে করবেন।

খুব সাজানো চেম্বার। পরিষ্কার ঝকঝকে।

রীণা গিয়ে বসতেই একটি তরুণী তার সামনে একটা খাতা প্রসারিত করে দিল।

নাম আর অ্যাপয়েন্টমেণ্টের সময় লিখতে হবে খাতায়।

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপর রীণা নামের ঘরে লিখল কৃষ্ণা বসু

একটু পরেই ডাক পড়ল।

সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ডাক্তার।

রীণা নিজের সন্দেহের কথা বলল।

ডাক্তার রাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ রীণাকে দেখলেন, তারপর বললেন আপনার এ রকম সন্দেহ হবার কারণ?

একটু ইতস্তত করে রীণা বলল।

আমার স্বামীর চরিত্রদোষ আছে। প্রায়ই রাত্রে বাইরে কাটান, তাই ভয় পাচ্ছি।

হুঁ, স্বামীকে নিয়ে আসবেন এখানে। তিনি না সারলে তো আপনার চিকিৎসা করা অর্থহীন। অবশ্য যদি আপনাদের এ রোগ হয়ে থাকে।

কথা শেষ করে ডাক্তার রাহা টেবিলের ওপর রাখা ঘণ্টিটা বাজালেন।

একজন বেয়ারা এল।

পরিতোষকে ডেকে দাও।

একটু পরে একজন এসে দাঁড়াল। পরনে সাদা অ্যাপ্রন, গলায় মালার আকারে স্টেথস্কোপ।

পরিতোষ এঁর ব্লাডটা টেস্ট করতে হবে।

একটা কাগজে খসখস করে কি লিখে ডাক্তার রাহা পরিতোষের দিকে এগিয়ে দিলেন।

তারপর রীণার দিকে ফিরে বললেন।

কাল বিকাল চারটেয় এসে রিপোর্ট নিয়ে যাবেন।

রীণা দর্শনীর টাকা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে এল।

পুরো একটা দিন, একটা রাত।

দুঃসহ প্রতীক্ষায় কাটাতে হবে।

এই রিপোর্টের ওপর রীণার জীবনমরণ নির্ভর করছে।

যদি সত্যিই সে ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে থাকে, তাহলে কি তার করণীয়?

শুধু নিজের চিকিৎসা করলেই চলবে না, সুকোমলের রক্তও পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সুকোমলকে রক্ত পরীক্ষায় কি ভাবে রাজী করাবে?

নিজের এই রোগের উৎসেরই বা কি ব্যাখ্যা দেবে?

বিকালে রীণা চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে বসেছিল। এই সময়ে মহানগরী জনস্রোতে জাল হয়ে ওঠে। বিচিত্র সব কোলাহল।

হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই রীণা চমকে উঠল।

বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাতে সেই লোকটি। মিস্টার মজুমদার।

বোঝা যায় লোকটার মনেও সন্দেহ হয়েছে। সে আবার যাচাই করতে এসেছে।

রীণা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল।

লালসা কোন কিছুর বাছবিচার করে না। রোগগ্রস্থ একজন স্বামী, নিজের রোগ স্ত্রীপুত্রের ওঁপর সংক্রামিত করেছে। সদ্যোজাত পুত্র মরণাপন্ন, তবু দেখতে এসেছে রতন মিস্ত্রি লেনের সে রাতের দেহপশারিণী মেয়েটি আর ডাক্তার চৌধুরীর স্ত্রী একলোক কি না!

অবশ্য রতন মিস্ত্রি লেনে রীণার মতন মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যে রীতিমত আশ্চর্যজনক, সেটা লোকটার চোখের তারাতেই ফুটে উঠেছিল।

রীণার ছোট্টঘরের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ লোকটা কথাই বলতে পারে নি, তারপর একসময় আস্তে আস্তে বলেছিল।

এমন রূপ তোমার, এমন চেহারা, তুমি তো সিনেমায় নামলেই পার।

লোকটার শরীরে শরীর ঠেকিয়ে দু চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে রীণা বলেছিল, আমার তো চেনাজানা লোক নেই, কে আর নামাবে। বাবুর কেউ আছে নাকি?

লোকটা রীণাকে আদর করতে করতে উত্তর দিয়েছিল, আমারও কেউ নেই।

তবে আমি খোঁজ করব।

রতন মিস্ত্রি লেনে গিয়ে দাঁড়ালে শুধু মন নয়, রীণার কথাবার্তা, বলার ভঙ্গীও যেন বদলে যেত।

কে জানে, তার মায়ের প্রেতাত্মা এসে বুঝি রীণার দেহমনে ভর করত।

রীণা লক্ষ্য করল লোকটা কিছুক্ষণ পায়চারি করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

আশ্চর্য নয় লোকটা রতন মিস্ত্রি লেনে হানা দিয়ে হয়তো শুনেছে কদিন রীণা সেখানে আসছে না।

সেখানেও রীণা একটা বিস্ময়।

নিজের উপার্জনের টাকা অন্য মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আসে, মদ ছোঁয় না। বাইরে থেকে ঘণ্টাদুয়েকের জন্য আসে, এ আবার কেমনধারা মেয়ে।

পরের দিন ডাক্তার রাহার চেম্বারে যাবার সময় রীণার বুকের মাঝখানে তীব্র একটা ব্যথা, মানসিক উত্তেজনার জন্যই সারাশরীরে একটা ক্লান্তি।

কি জানি, কি পাওয়া যাবে রিপোর্টে।

এই রিপোর্টের ওপর তার ভবিষ্যৎ জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে।

ডাক্তার রাহার সহকারী যখন রিপোর্টটা রীণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মিসেস

বাস্, নিগেটিভ হয়েছে, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।

রিপোর্টটা আঁকড়ে ধরে উল্লসিত কণ্ঠে রীণা বলল, অনেক ধন্যবাদ। আমি বোধহয় মিথ্যাই ভয় পেয়েছিলাম।

রিপোর্টটা পথের মাঝখানেই রীণা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

ঠিক হল দুজনে দিনপনেরর জন্য পলাশপুর যাবে।

বাংলা-বিহারের সীমারেখায় স্বাস্থ্যকর জায়গা। এখনও প্রচুর বাড়ী হয় নি।

স্বাস্থ্যান্বেষীর ভীড় কম।

রীণা কলকাতা ছাড়বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।

এখানে সর্বনাশ যেন তার কালো পক্ষ বিস্তার করে রয়েছে। রীণাকে গ্রাস করবে।

স্টেশনে নেমে দুজনেরই খুব ভাল লাগল।

প্ল্যাটফর্মের পরেই শাল আর মহুয়ার জটলা। লাল ফুলে যেন দিগন্ত ছেয়ে রয়েছে। দুটো সাইকেলরিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল। একটাতে দুজনে, আর একটাতে মালপত্র।

সুকোমলের এক রোগীর একটি বাংলো ছিল। নাম বসন্ত বাহার।

সেখানে ওঠবার ঠিক হয়েছিল।

দূর থেকেই বাংলো দেখা গেল।

সাদা দেয়াল, লাল টালির ছাদ। সামনের বাগানের হরেকরকমের মরশুমি ফুল। মালি আছে। সেই সব কিছুর তদারক করে।

মালি আগেই খবর পেয়েছিল। সে গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল।

এগিয়ে এসে মালপত্র তুলে নিল।

বৈদ্যুতিক বাতি নেই, বড় বড় দেয়ালগিরি। তার আলোও কম উজ্জ্বল নয়।

রীণা আর সুকোমল ভিতরে ঢুকেই অবাক।

মেহগনি কাঠের আসবাব, দামী পালঙ্ক। বড় বড় আলমারি।

পাশাপাশি তিনটে ঘর। দুটো মালি খুলে দিল। একটা তালা লাগানো।

রীণা জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা, রান্নার কি হবে?

মালি বলল।

বাবুরা যখন আসেন, তখন যা হোক কিছু আমিই করে দিই।

তুমি রান্না করতে পার?

সে রকম কিছুই নয়। কোন রকমে কাজ চালানো গোছের।

রাত্রে খাবার সময় বোঝা গেল মালিটি অতিমাত্রায় বিনয়ী।

শুধু রুটি, মুরগীর মাংস আর আনারসের চাটনি করেছে, কিন্তু রান্না যেন অমৃত। সুকোমল খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানী, কিন্তু সে-ও বারদুয়েক রুটি আর মাংস চেয়ে নিল।

পরের দিন সকালে সাইকেলে একটি ভদ্রলোক এসে হাজির।

মালি বলল, উনি এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সুকোমল অবাক।

আমি আসব জানলেন কি করে?

মালি মাথা চুলকাল।

দিনদুয়েক আগে হাটে দেখা হতে আমিই বলেছিলাম।

অগত্যা সুকোমলকে ভদ্রলোকের সামনে যেতে হল।

ভদ্রলোক বিগলিত।

বিনয়নম্রকণ্ঠে অনুরোধ করল।

যদি অসুবিধা না হয় স্যার, চলুন একবার হাসপাতালটা দেখে আসবেন। বুঝতে পারবেন কত অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়।

সে সব দেখে আর আমি কি করব, আমার তো প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতা নেই।

তা নাই বা রইল। আপনাদের উপদেশ নির্দেশের দাম কম?

ভদ্রলোক সাইকেলে, সুকোমল সাইকেলরিক্সায় রওনা হয়ে গেল।

রীণা স্নানের ঘরে ছিল। বেরিয়ে এসে দেখল সুকোমল নেই।

মালিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল সুকোমল হাসপাতাল দেখতে গেছে।

রীণা কপাল চাপড়াল।

উঃ, এখানেও হাসপাতাল।

রীণা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরল, তারপর বন্ধ ঘরের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, মালি, এ ঘরে কি আছে?

আজ্ঞে, ও ঘরে পুরানো সব জিনিসপত্র রাখা আছে। বাবুর বাপের আমলের।

খোল না দেখি।

মালি একটু ইতস্তত করে কোমরের চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বের করে তালা খুলে দিল।

ঘর অন্ধকার। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

মালি বলল, ডানদিকে সুইচ আছে।

রীণা হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল।

এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত বড়।

মেঝের ওপর পুরানো কার্পেট পাতা। অনেক জায়গা ছিঁড়ে গেছে।

একটা কোণে তানপুরা আর একজোড়া তবলা।

দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়েই রীণা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিরাট সাইজের একটা ফটো।

একজন মহিলা হাটুমুড়ে বসে গান গাইছে।

মহিলার মুখচোখের ভঙ্গী, পোশাকপরিচ্ছদ দেখলেই বেশ বোঝা যায় মহিলা ঠিক ভদ্রঘরের নয়।

খুট করে শব্দ হতেই রীণা পিছন ফিরে দেখল, দরজার গোড়ায় মালি এসে দাঁড়িয়েছে।

মালি, এ ছবি কার?

খুব মৃদুকণ্ঠে মালি উত্তর দিল, জানকীবাইয়ের।

জানকীবাই!

হ্যাঁ মা, একজন বাইজী। বাবুর বাবার আমলে আসাযাওয়া করত। শেষ-জীবনটা এখানেই কাটিয়েছিল।

কোথাকার বাইজী? বেনারস, লক্ষ্ণৌ ওই দিককার?

না মা, ইনি বাঙালী। নাম ছিল জানকী দেবী। কলকাতার মেয়ে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে গানবাজনা শিখেছিল।

মুখ দেখে রীণার সেই সন্দেহই হয়েছিল। একেবারে বাঙালীর মুখ।

অনেকক্ষণ রীণা চেয়ে চেয়ে দেখল। প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

জীবন্ত ছবি। রীণার মনে হল, এখনই বুঝি জানকীবাই গান শুরু করবে।

বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়।

মালি, তুমি একে দেখেছ?

দেখেছি মা। আমি তখন খুব ছোট। গানের কিছু বুঝতাম না, কিন্তু কি রূপ। যেন আগুনের মতন চেহারা।

একটু থেমে মালি বলল।

ঠিক, আপনার মতন চেহারা।

আমার মত! আবার রীণার দেহে রক্তের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। বাইজির সঙ্গে তার মিল। এ মিল বুঝি সামান্য একটা মালিরও চোখে পড়েছে।

অনেক কষ্টে রীণা নিজেকে সংযত করে রেখেছে।

সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রতন মিস্ত্রি লেনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে নিজেকে আটকে রেখেছে।

কিন্তু তবু নিস্তার নেই।

সে যে ভদ্রমহিলা একথা বুঝি কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

রক্তের ঋণ কবে শোধ হবে! কতদিনে! কিসের বিনিময়ে!

সুকোমল যখন ফিরল, তখন বেলা দুপুর।

অপেক্ষা করে করে রীণা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

কি ব্যাপার তোমার ?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সুকোমল উত্তর দিল।

আর বল কেন! ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধানভানার আমন্ত্রণ আসে। এসেছি বিশ্রাম করতে, হাসপাতাল দেখবার জন্য টেনে নিয়ে গেল।

কেমন দেখলে ?

ব্যবস্থা মোটামুটি একরকম, কিন্তু বেচারী ডাক্তার নার্স করবেই বা কি! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। না আছে ওষুধপত্র, না ছুরিকাঁচি।

যাক, যাও স্নান করে এস। ওসব পরে শুনব।

খাওয়াদাওয়ার পর সুকোমল বিছানায় শুয়ে পড়ল। রীণা পাশে বসল।

রীণাই একসময়ে বলল।

জানকীবাঈয়ের নাম শুনেছ ?

সুকোমল ভ্রূ কোঁচকাল।

জানকীবাঈ! তিনি কে ?

নামকরা বাঈজী। এখানে থাকত।

সুকোমল বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল না।

তাই বুঝি! তুমি এত খবর যোগাড় করলে কোথা থেকে ?

মালি বলেছে।

বা, বেশ রসিক মালি দেখছি তো।

তোমার পেশেণ্টের বাপের আমলে থাকত।

তাই হবে। বাপঠাকুর্দার আমল ছাড়া বাইজী রাখবার আর ক্ষমতা ছিল কোথায়। একটা বৌ পুষতেই আমরা কাহিল।

এবার রীণা এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে দুটো হাত রেখে বলল।

আমার কিন্তু বাইজী হতে খুব ভাল লাগে। হাটুমুড়ে বসে গান গাইব। সামনে পাতা থাকবে রুপোর থালা। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে থালার ওপর ঝপঝপ করে নোটের স্তূপ পড়বে।

সুকোমল পাশ ফিরে শুল।

তোমার পাগলামী শোনার সময় নেই। আমার ঘুম পাচ্ছে।

সুকোমল যদি এদিকে ফিরত, দেখতে পেত, রীণা ঠিক জানকীবাইয়ের ভঙ্গীতে, হাতের মুদ্রা করে দাঁড়িয়ে আছে।

সময় পেলেই রীণা জানকীবাইয়ের বন্ধঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে।

কখনও ফটোর সামনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও তানপুরার তারে হাত ছোঁয়ায়। সব তার নেই, কিন্তু তারে হাত ছোঁয়ালেই অদ্ভুত এক শব্দ সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বন্দিনী জানকীবাই বুঝি মুক্তি চাইছে।

রীণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে।

তার মাও কি এমনই ছিল? জানকীবাইয়ের মতন?

যেটুকু সে লোকটার কাছে শুনেছে, তাতে এইটুকুই জেনেছে, মা একেবারে সাধারণ পতিতা ছিল।

কিন্তু অনেক সাধারণ পতিতাও গানবাজনায় পারদর্শিনী হয়। কেউ কেউ নাচতেও পারে।

রতন মিস্ত্রি লেনে রীণা দেখেছে, শুনেছে।

আশপাশের ঘর থেকে গানের সুর ভেসে আসত। ঘুঙুরের শব্দ।

রীণা গাইতে পারে। খুব ভাল নয়। চলনসই।

নাচবার চেষ্টা অবশ্য কোনদিন করে নি। এখন শরীর সামান্য ভারি হয়ে গেছে।

এ শরীর নিয়ে নাচা সম্ভব নয়।

তবে তার খুব ইচ্ছা হয়, এ ঘর পরিষ্কার করে, জানকীবাইয়ের ফটোর সামনে বসে গান করে, কিম্বা নাচের চেষ্টা।

পলাশপুরে একটা বড় সুখ। রীণা সুকোমলকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে পেল।

জীবিকার বাধা নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুকোমল আর রীণা। সকালবিকাল দুজনে হাত ধরাধরি করে জঙ্গলের পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় বসে বসে গল্প।

ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে অবশ্য সুকোমল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত।

কলকাতার নার্সিং হোম থেকে সহকর্মী ডাক্তারদের চিঠি আসত।

কিছু সার্জিকাল যন্ত্রপাতি কেনা দরকার। তার জন্য টাকার প্রয়োজন। সুকোমল আর কতদিন বাইরে থাকবে।

একপক্ষ শেষ হতে সুকোমল বলল।

একটা কাজ করা যাক।

কি ?

এখানে তোমার শরীরের বেশ উন্নতিই হচ্ছে। তুমি বরং আরও কিছুদিন থাক। মালি রয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তারকেও বলে যাব, মাঝে মাঝে তোমার দেখাশোনা করবে। পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

রীণা রাজী।

কলকাতা তার কাছে বিভীষিকার নামান্তর।

রতন মিস্ত্রি লেন রয়েছে, মিস্টার মজুমদারের সন্দেহদীর্ণ দৃষ্টি।

সেখানে গেলে রীণা মনের জোর হারিয়ে ফেলে।

রীণা স্টেশন পর্যন্ত গেল।

ট্রেন ছাড়ার সময় বার বার বলল, অন্তত সপ্তাহে একটা চিঠি দেবে কিন্তু।

রুমাল নাড়তে নাড়তে সুকোমলও বলল, তুমিও দিও।

মালির সঙ্গে রীণা বাড়ী ফিরে এল।

নিজেকে বেশ অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হল।

তার চেয়েও মারাত্মক, মনের গোপনের সেই পাপ চিন্তা, অসামাজিক ইচ্ছাটা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই অস্বস্তি নামে।

যে মেয়েটা ঝাড়ামোছার কাজ করে তার নাম মুংরি।

বয়স সতের আঠারোর বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই শরীরে দুর্বার যৌবন। শাড়ীতে সে যৌবন আবৃত রাখা যায় না।

তার সঙ্গে রীণা বসে বসে কথা বলে।

তোর বাড়ীতে কে কে থাকে ?

আমি আর বাড়ীর মানুষ। তাও রেতেরবেলা মানুষটা থাকে না।

ওমা, রাতেরবেলা কোথায় যায় ?

মুংরি উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে ঘর মুছতে লাগল।

কিরে ? কি হল, বললি না ?

সে ভারি লজ্জার কথা বৌদিমণি।

আমাকে বল। আমি আর কাকে বলতে যাব !

একটু পরে মুংরি বলল।

গাংপারে যায়।

গাংপারে যায়। সেখানে কি ?

শাল আর মহুয়ার জঙ্গলের পাশ দিয়ে পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। শীতে রুপোলী সুতোর মতন, গরমে হেঁটে পার হওয়া যায়, বর্ষায় খরস্রোতা।

এদেশের লোকেরা বলে গাং।

রীণা কোনদিন যায় নি, তবে গাংয়ের কথা শুনেছে।

সেখানে সব নষ্ট মেয়েদের আস্তানা।

রীণা অনুভব করতে পারল, তার রক্তস্রোতে আবার সমুদ্রের কল্লোল। দেহের কোষে কোষে চাঞ্চল্যের স্পর্শ।

এরা সব এল কোথা থেকে ? কি জাত ?

নানাদিক থেকে এসেছে বৌদিমণি। এদের কি আর জাত আছে। নষ্টামিই এদের জাত।

তুই এক কাজ কর মুংরি।

কি বউদিমণি ?

ওদের মতন সাজগোছ করে মানুষটাকে ভোলাবার চেষ্টা কর।

মুংরি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রীণার দিকে দেখল, তারপর বলল, ভিতর থেকে ভালবাসা না এলে বাইরের সাজপোশাকে ভুলিয়ে লাভ কি, বউদিমণি ? সে ভোলানোর দাম কতটুকু ! দেহের খিদে মিটলেই তো সব শেষ।

মুংরির কথায় রীণা চমকে সোজা হয়ে বসল।

সামান্য অশিক্ষিতা একটা গ্রাম্যমেয়ের যা বুদ্ধি, সে বুদ্ধি রীণার নেই।

রতন মিস্ত্রি লেনের জীবন থেকেও কি রীণা শেখে নি।

মানুষগুলো আসত, দরদাম করত, কেউ কেউ আবার ভালবাসার কথা বলত, তারপর কাজ মিটলেই হাওয়া।

সত্যিই তো, এ ভালবাসা শুধু দেহকেন্দ্রিক। এখানে মনের কোন সম্পর্ক নেই।

সবই বোঝে রীণা, তবু কেন এমন হয় !

রতন মিস্ত্রি লেন আর গাংপারের নাম কানে গেলেই শরীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সামাজিক পরিবেশ, পদমর্যাদা সব ভুলে রীণার যেন রুপান্তর হয়।

পরের দিন মালির কাছ থেকে চাবি নিয়ে রীণা আবার এদিকের ঘর খুলল।

অদ্ভুত জীবন্ত ছবি জানকীবাইয়ের। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় এখনই বুঝি গান আরম্ভ করবে।

রীণা সাবধানে এগিয়ে গিয়ে তানপুরাটা তুলে নিল।

কয়েকটা তার ছেঁড়া। খাঁজে খাঁজে ময়লা জমেছে।

একটা কাপড় দিয়ে রীণা ময়লা পরিষ্কার করল। ছেঁড়া তারগুলো বাঁধবার চেষ্টা করল, পারল না।

তারপর ঠিক জানকীবাইয়ের ভঙ্গীতে বসে তানপুরা নিয়ে মীরার ভজন শুরু করল।

একসময়ে রীণার গানের গলা ছিল। কোনদিনই বিশেষ রেওয়াজ করে নি। গলাটা মিষ্টি ছিল।

রীণা আস্তে আস্তে গলা চড়াল। তন্ময় হয়ে গাইতে লাগল।

যখন খেয়াল হল দেখল মুংরি আর মালি দরজার গোড়ায় বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

গান থামতে মালি বলল।

কি আশ্চর্য!

রীণা মালির দিকে ফিরে ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

এ গানটা জানকীবাইও গাইতেন। এটা তাঁর খুব প্রিয় গান ছিল। আমি ছোট ছিলাম মা, কিন্তু গানের কথাগুলো আমার বেশ মনে আছে। মেরে গিরিধারী গোপাল ঔর কহি নহি।

মুংরি বলল।

বাইজীকে আমি কখনও দেখিনি বউদিমণি, কিন্তু আপনি যখন গান করছিলেন তখন ঠিক ওঁর মতন দেখাচ্ছিল।

রীণা উত্তর দিল না। ওরা তো জানে না, ওই রকম একজনের রক্তই তার শিরায় শিরায়।

যতই সে ভদ্রঘরের বউ সেজে থাকুক, অভিজাতসমাজের বলে প্রচার করুক নিজেকে, সে যে কি, সেই জানে।

দিনদুই পরে সুকোমলের চিঠি এল।

সুকোমল ব্যস্ত মানুষ। বড় চিঠি লেখার মতন সময়ই নেই। কোন রকমে লাইন কয়েক লিখেছে।

সুকোমল ভাল আছে। তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। রীণা যেন দুবেলা বেড়ায়। কোন রকম শরীর খারাপের আভাস পেলেই যেন মালিকে দিয়ে

হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়।

রীণা, ছোট চিঠি, তাও বারতিনেক পড়ল।

সকালে হয় না, মালির অনেক কাজ থাকে। বিকালে রীণা নিয়ম করে মালির সঙ্গে বেড়াতে যেত।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে শালের জঙ্গলের কাছাকাছি এসে রীণা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এখানে গাংটা কোথায়?

মালি পিছন পিছন আসছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল।

এই জঙ্গলের পরেই মা। এখান থেকে দূর আছে। মাইলদুয়েক হবে।

আমাকে একদিন গাংপার নিয়ে যাবে মালি?

মালি রীণার আপাদমস্তক দেখল, তারপর বলল।

সে বাজে জায়গা মা। সেখানে আপনাদের মতন ভদ্রঘরের মেয়েবৌরা যায় না।

জেনেশুনেও রীণা অজ্ঞ সাজল।

কেন বলত? বাজে জায়গা কেন?

মালি হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। কি উত্তর দেবে বোধহয় ভাবল।

একসময়ে চাপাগলায় বলল।

ওখানে সব খারাপ মেয়েছেলেদের আস্তানা মা।

রীণা এবার মারাত্মক প্রশ্ন করল।

তুমি জানলে কি করে? তুমি ওসব জায়গায় গেছ বুঝি?

মালি হাঁড়িয়া খায়। খিস্তি করে। তার তিনকুলে কেউ নেই। বৌ মারা গেছে বছরদশেক। একটা ছেলে ছিল। জোয়ান বয়সে সে-ও সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে।

এখন বয়স প্রায় প্রৌঢ়ত্বের শেষকোঠায়।

এককালে মালির যৌবন ছিল, স্বাস্থ্যও ছিল।

কিন্তু এসব দিকে মন ছিল না।

বৌকে খুবই ভালবাসত। বৌ মারা যাবার পর বিবাগী হবার ইচ্ছাও হয়েছিল। তাই রীণার এ প্রশ্নে সে একটু বিরক্তই হল।

মুখটা গম্ভীর করে বলল।

না মা, ওসব জায়গায় আমার যাবার বাসনা হয় নি। আমি সংসারী লোক। সংসার আঁকড়ে ধরেছিলাম, কি করব সংসার আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। জোয়ান বেটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল।

শেষদিকে মালির কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

রীণা অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

নিজেকেই বুঝতে পারে না। কোথায় একটা রহস্যের বীজ লুকানো আছে। যার জন্য তার মনকে টেনেহিঁচড়ে নোংরামির দিকে নিয়ে যায়।

রীণা নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।

অনাথ আশ্রমে মানুষ।

সেখানে পরিচালকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও, আশপাশে যে সব বালিকারা ছিল তারা গোত্রহীন, পরিচয়হীন, অনেকে নামহীনও, ফাদাররা নামকরণ করেছিল, তারা পালাবার চেষ্টা করত।

ছেলেবেলা থেকে রীণা শুনেছে সে পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। এক অপরিচিত উদার ভদ্রলোক তার ব্যয়ভার বহন করছে।

তার সঙ্গিনীরা অনেকেই বাজে ধরনের মেয়ে ছিল। তারা জানত তারা কোথা থেকে এসেছে। কি করে জানত ভগবান জানেন।

একটু বড় হতেই দু একজন স্পষ্টই বলত।

আমরা তো অবাঞ্ছিত। আমাদের মেরে না ফেলে পথে রেখে দিয়ে গেছে। আমরা কারও ভালবাসার প্রতীক নই, আমরা কামনা, ব্যভিচারের, অন্যায়ের ফল।

স্বাভাবিকভাবেই রীণারও ধারণা হয়েছিল, তার জন্মের কাহিনীও এই রকম। মানুষের সাজানো সমাজের প্রতি তার একটা জন্মগত বিতৃষ্ণা ছিল।

তারপর রীণা একটু একটু করে বড হল। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে ঢুকল। এই অশালীন চিন্তার ওপর কৃষ্টির পালিশ পড়ল।

ইতিমধ্যে অনাথ আশ্রম থেকে তার মতন উঠতি বয়সের কিছু মেয়ে নিখোঁজ। অনাথ আশ্রমের কড়া নজর পার হয়ে ঠিক তারা এদিক ওদিক বেরিয়ে যেত, তারপর আর ফিরত না।

রীণার জীবনে সুকোমল না এলে কি হত বলা যায় না। তার অন্ধকার জীবনে আলোর কণার মতন সুকোমল এসেছিল। তার অতীতের অনুসন্ধান না করে তাকে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু তবু কোথায় একটা লুকানো দাহ ছিল। জ্বালা।

রীণা ছটফট করত।

সুকোমলকে সে যদি অষ্টপ্রহর পেত, তাহলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু সুকোমলের জীবিকা দুজনের জীবনকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল।

তার আগেই সেই লোকটা সর্বনাশা পরিচয় বহন করে এনেছিল।

রীণা পতিতার সন্তান।

এই পরিচয়ই যেন স্বাভাবিক। অন্য রকম পরিচয় পেলেই রীণা আশ্চর্য হত।

অন্তর্জ্বালার চরম প্রকাশ হল সেদিন, যেদিন তার মোটর রতন মিস্ত্রি লেনের মধ্যে ঢুকল।

রীণা চোখের সামনে দেখল, সার সার বারবণিতা। শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত।

তাদের সঙ্গে রীণা একাত্মতা বোধ করেছিল।

তার ধারণা হয়েছিল, এই তার প্রকৃত জীবিকা, এটাই তার আসল আশ্রয়।

যে সংসারে, যে সমাজে সে প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে রীণার শত্রুতার সম্পর্ক।

দিনচারেক পর বাড়ীর সামনে এক সাইকেলরিক্সা এসে থামল।

বারান্দায় বসে রীণা চা খাচ্ছিল। মেঝের ওপর বসে মুংরি একমনে কথা বলে যাচ্ছিল।

তার কথার বেশীর ভাগই রীণা শুনছিল না।

সাইকেলরিক্সা থেকে যে লোকটা নামল, তাকে দেখেই রীণা চমকে উঠল।

প্রশান্তবাবু।

নার্সিং হোমের সুপারিন্টেডেন্ট। সুকোমলের একান্ত বিশ্বাসভাজন।

কি আবার প্রশান্তবাবু হঠাৎ এখানে কেন?

রীণা গেটের কাছে এগিয়ে গেল।

নমস্কার মিসেস চৌধুরী, ভাল আছেন?

প্রতিনমস্কার করে রীণা বলল।

হ্যাঁ, ভাল। কি ব্যাপার, আপনি যে?

ডক্টর চৌধুরী পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

রীণার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণের স্রোত।

এমন কি জরুরী দরকার তাকে?

তবে কি সুকোমল গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কিছুদিন আগেও সুকোমলের কাছ থেকে যে চিঠি এসেছে, তাতেও রীণার যাবার কোন উল্লেখ ছিল না।

ওঁর কিছু হয়েছে?

রীণার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল।

প্রশান্তবাবু মাথা নাড়ল।

না না, ডক্টর চৌধুরী খুবই ভাল আছেন।

তবে?

আমি তো আর কিছু জানি না। আমাকে ডক্টর চৌধুরী শুধু বলে দিয়েছেন,

আজ বিকেলের ট্রেনেই যেন আপনাকে নিয়ে যাই।

কি আশ্চর্য, সবচেয়ে আগে মিস্টার মজুমদারের মুখটা রীণার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ভদ্রলোক সুকোমলের সঙ্গে দেখা করে কিছু বলে নি তো।

কিন্তু কি সে বলতে পারে?

বলবে, ডক্টর চৌধুরীর স্ত্রী সন্ধ্যাবেলা রতন মিস্ত্রি লেনে সাধারণ গণিকার বেশে গিয়ে দাঁড়ায়।

অসম্ভব। এমন একটা কথা কে বিশ্বাস করবে।

এর কি প্রমাণ আছে?

প্রমাণ!

কথাটা মনে হতেই রীণা শিউরে উঠল।

এ সম্ভাবনার কথা তার মনেই হয় নি।

একটা জড়ুল। উরুসন্ধিতে একটা বড় জড়ুল।

মনে আছে এই লোকটা সেই জড়ুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল।

তোমার জড়ুলটা ভারি সুন্দর।

লোকটা যদি বলে, ডাক্তার চৌধুরী আপনার স্ত্রীর দেহে একটা বড় জড়ুল আছে। সে জড়ুল এমন জায়গায় যে দেহ নগ্ন না করলে দেখা সম্ভব নয়।

তাহলে। তাহলে কি হবে?

রীণা আর ভাবতে পারে না।

তার বেশ মনে হচ্ছে, সর্বনাশ তার কালো পাখা বিস্তার করে তাকে আচ্ছন্ন করার জন্য এগিয়ে আসছে। এবার আর তার নিষ্কৃতি নেই।

প্রশান্তবাবু বলল, নিন, তৈরী হতে আরম্ভ করুন। রাত সাতটায় ট্রেন।

রীণা বুঝতে পারল ফাঁসির আসামীকে নির্দিষ্ট দিনে যেমন টানতে টানতে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তার কোন আপত্তিতে কর্ণপাত করা হয় না, তেমনই রীণাকেও টেনেহিঁচড়ে শহরে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুকোমল আর মিস্টার মজুমদারের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

রীণা যখন বাড়ী পৌঁছাল, তখন সুকোমল লেক. নার্সিং হোমে।

সারা ঘর রীণা তন্নতন্ন করে খুঁজল, সুকোমল যদি কোন চিঠি লিখে রেখে গিয়ে থাকে।

না, কিছু নেই।

সুকোমল বোধহয় কিছু লিখে যেতে চায় নি। এসব কথা লেখা অনুচিত। যা বলবার মুখেই বলবে।

রীণা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সুকোমল ফিরল।

মোটর গ্যারেজে রেখে ওপরে উঠতে রীণা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, জরুরি তলব!

সুকোমল একবার আড়চোখে রীণাকে দেখে নিয়ে বলল, দাঁড়াও, খেয়ে নিই। তারপর বলব।

রীণা কিছু বুঝতে পারল না।

তাহলে কি সুকোমল একেবারে চরম কথা বলে দেবে।

বলবে, আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করছি, তুমি তোমার ব্যবস্থা কর।

অন্যদিন সুকোমলের খাবার সময়ে রীণা তার সামনে গিয়ে বসে। সেদিন কিন্তু বসল না। বসতে পারল না।

বুকের মাঝখানে তীব্র একটা যন্ত্রণা। রীণার মনে হল হৃদস্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

খাওয়া শেষ করে সুকোমল যখন ঘরের মধ্যে এল, রীণা বুকে বালিশ চেপে চুপচাপ বিছানার ওপর বসে রয়েছে।

সুকোমল একটা চেয়ার টেনে বসল।

রীণা, অমর রায় কে?

যিনি মিশনে আমার সমস্ত খরচ চালাতেন, কলেজেও পড়িয়েছিলেন তাঁর নাম অমর রায়।

তোমার কেউ হন?

সত্য গোপন করে রীণা বলল।

শুনেছি, আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

সুকোমল নিজের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে রীণার দিকে এগিয়ে দিল।

এই নাও, পড়।

রীণা যখন হাত বাড়িয়ে পোস্টকার্ডটা নিল, তখন তার হাত থরথরিয়ে কাঁপছে। কি জানি আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলো তার জীবনের কোন্ ভয়াবহ অধ্যায়ের সূচনা করবে। কোন্ অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

কয়েকটা লাইন।

রীণা,

আমি মৃত্যুশয্যায়। চলে যাবার আগে তোমাকে কয়েকটা দরকারী কথ

বলে যেতে চাই। ইতি—অমর রায়।

চিঠির তলায় ঠিকানা লেখা।

পোস্টকার্ড পড়া শেষ করে বীণা মুখ তুলে সুকোমলের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে দেখল।

সে দৃষ্টির অর্থ বুঝেই সুকোমল বলল।

তুমি কাল সকালেই চলে যাও রীণা। মোটর আমাকে নার্সিং হোমে নামিয়ে দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে।

রাত্রে বার বার রীণার ঘুম ভেঙে গেল।

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা না জানি নতুন করে কি সর্বনাশের কথা শোনাবে।

তবু ভাল যে, সুকোমল তার সঙ্গী হতে চায় নি। বলে নি, তোমার একলা গি দরকার নেই। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

মনের দিক থেকে সুকোমল যতই উদার হোক, যতই আলোকপ্রাপ্ত, বীণার গণিকা এমন একটা কথা নিশ্চয় সে বরদাস্ত করতে পারবে না।

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকা। সরু গলি। নোনাধরা, শ্যাওলাপড়া বাড়ি সার। নম্বর খুঁজে খুঁজে রীণা এগিয়ে গেল।

মোটর গলির মোড়ে। ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

একটা বাড়ীর সামনে এসে রীণা থামল।

দুতলা বাড়ী। জরাজীর্ণ। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না বাড়ীর মধ্যে কে আছে।

রীণা কড়া নাড়ল। খট্ খট্ খট্।

অনেকক্ষণ কড়ানাড়ার পর দরজা খুলে গেল।

ছেঁড়া গেঞ্জি, লুঙ্গিপরা শীর্ণকায় একটি লোক এসে দাঁড়াল।

কাকে চাই?

অমর রায়।

কোথা থেকে আসছেন?

আমাকে আসতে চিঠি লিখেছিলেন।

একটু অপেক্ষা করুন।

লোকটি ভিতরে চলে গেল।

মিনিট কয়েক, তার মধ্যেই ফিরে এল।

আসুন।

লোকটার পিছন পিছন রীণা ভিতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে এত অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

আলো জ্বলছে।

এককোণে একটা তক্তপোষ পাতা। পাশে গোল টেবিলে নানা আকারের শিশি।

কাছে এগিয়ে রীণা দেখতে পেল, একজন লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে।

এখানে এস।

শব্দ লক্ষ্য করে রীণা একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

এবার অমর রায়কে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। শীর্ণ দেহ, বুকের পাঁজরগুলো যেন গোনা যায়। বিস্ফারিত দুটি চোখ। দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

দেখে মনে হয় হাঁপানীর রোগী।

দেখা করতে লিখেছিলেন কেন?

রীণা প্রশ্ন করল।

বলছি। একটু জিরিয়ে নিই।

দুটো হাত দিয়ে বুক চেপে অমর রায় কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর রীণার দিকে চেয়ে বলল, ওই লাল ওষুধটা একদাগ গ্লাসে ঢেলে দাও তো।

রীণা দিল।

ওষুধটা খেয়ে অমর রায় একটু যেন সুস্থবোধ করল।

আস্তে আস্তে বলল, অনেক কথা বলবার আছে। সব না বললে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। বুঝতে পারছি আমার শেষদিন ঘনিয়ে আসছে। যা বলবার, তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে হবে।

রীণা কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতন তার কিছু ছিলও না। কোলের উপর দুটো হাত রেখে চুপচাপ বসে রইল।

বাইরে প্রকৃতিস্থ থাকার যতই চেষ্টা করুক, শরীরের মধ্যে উদ্বেগের জ্বালা তাকে অস্থির করে তুলতে চাইছিল।

কি বলবে লোকটা?

লোকটা যদি সত্যিই মৃত্যুপথযাত্রী হয়, তাহলে চলে যাবার সময়ে একটা মেয়ের জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে লাভ কি।

একজন শিক্ষিত বেকার একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। ছেলেটি বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল। অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারে নি।

মেয়েটির বাপ নেই, মা আছে।

গল্পচ্ছলে অমর বলতে আরম্ভ করল।

দোকানপাট যা করার মেয়েটিই করত।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়ানো অন্য ছেলেদের হাত থেকে মেয়েটিকে ছেলেটিই রক্ষা করত।

সেই থেকেই আলাপ। আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা।

সে যুগে এ যুগের মতন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া ছেলের দল ছিল না, তারা অভিভাবকদের শাসনকে ভয় করত, একবার বারণ করলে পিছিয়ে যেত।

ছেলেটি একটা মনিহারির দোকানে কাজ পেল।

সামান্য কাজ। কোনরকমে একজনের চলে।

ছেলেটি অবশ্য একলা। তিনকুলে কেউ ছিল না।

এই সামান্য চাকরিতেই মেয়েটির অসীম উৎসাহ।

আড়ালে ছেলেটিকে বলত।

এই তো শু[illegible]' আমি বলছি ক্রমে ক্রমে দেখ তুমি একটা দোকানের মালিক হবে।

দুতলা বাড়ীর ওপরে আমরা থাকব। নীচে দোকান।

দোকান যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি নেমে এসে দোকান সাজিয়ে দেব। [illegible]মুছে সব পরিষ্কার করব।

ছেলেটি উত্তরে শুধু বলত।

দোকানের নাম রাখব রত্না স্টোর্স।

রত্না! রত্না স্টোর্স? রীণা চেঁচিয়ে উঠল, আমার মার নামই [illegible] বলেছিলেন, রত্না, তাই না? তাহলে আমার মা ভদ্রঘরের নয় কেন?

অমর হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল।

আগে শোন সব কথা।

ছেলেটি প্রায় না খেয়ে যথাসম্ভব পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করল। যেমন করেই হোক জীবনে দাঁড়াতে হবে। না দাঁড়ালে রত্নাকে পাওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে চুলের ফিতা, টিপ, আলতা এনে রত্নাকে উপহার দিত।

ছেলেটি থাকত এক বাড়ীর পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে।

গোয়ালঘরটি বাড়ীর পিছনে। খিড়কীর রাস্তার ওপর।

একরাত্রে সেই গোয়ালঘরের দরজায় ঠুক্ ঠুক্ শব্দ।

সারাদিন পরিশ্রম করে ছেলেটি অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

হঠাৎ উঠল না।

একসময়ে তার ঘুম ভেঙে গেল।

দরজা খুলেই সে অবাক।

দরজার ওপারে রত্না।

কি ব্যাপার, এত রাত্রে ?

রত্নার দু চোখে জল। সমস্ত শরীর কাঁপছে।

ছেলেটির দুটি হাত ধরে কেঁদে উঠল।

আমাকে বাঁচাও।

ছেলেটি ভয় পেল।

মাঝরাতে চেঁচামেচি শুনে বাড়ীর লোক জেগে উঠে যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে ছেলেটিকে বিনামূল্যের এই আস্তানাটি ছাড়তে হবে।

তাই নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ছেলেটি বলল।

চুপ। কি হয়েছে, চুপি চুপি বল ?

মেয়েটি বলল।

তার বয়স ষোল হয়েছে, এবার মা তাকে জাতব্যবসায় নামাতে চায়। আগেও অনেক চেষ্টা করেছিল, মেয়েটি আপত্তি করেছে, রাজী হয় নি, কিন্তু এবার মা নিজে বাবু ঠিক করে ঘরে আনছে। মেয়েটির বাঁচবার কোন পথ নেই।

সে রাতেও তাই হয়েছে। মদে চুর হওয়া এক ভদ্রলোককে ঢুকিয়ে মা পাশের রেঁচলে গিয়েছিল। মেয়েটি পর পর দুখানা গান গেয়ে শুনিয়েছে, তারপর াইরে যাবার নাম করে ছেলেটির কাছে পালিয়ে এসেছে।

ছেলেটির সব মনে পড়ে গেল।

মেয়েটি আর তার মা যে বস্তিতে থাকত, তার খুব সুনাম ছিল না।

সেজেগুজে রংমেখে কেউ রাস্তায় দাঁড়াত না বটে, কিন্তু রাত হলেই প্রায় ঘর কে গানের সুর ভেসে আসত, নূপুরের বোল।

মেয়েটিকেও একদিন এ ব্যবসায় নামবার প্রশ্ন উঠবে এটা ছেলেটি খেয়াল র নি।

ছেলেটি বলল।

আজ রাতটা কোনরকমে বাড়ীতে কাটাও। কাল তোমার একটা ব্যবস্থা করব। য়েটি মাথা নাড়ল।

না, আমি ফিরে গেলেই দৈহিক নির্যাতন তো আছেই, তাছাড়া মা আমাকে টকে দেবে। আর বের হতে দেবে না। যা করার, আজই কর।

ছেলেটি মুশকিলে পড়ল।

এ গোয়ালঘরে মেয়েটিকে রাখা যায় না। লোক জানাজানি হয়ে যাবে। এ বাড়ীর লোকের কাছে ছেলেটির দেবার মতন কৈফিয়ত কিছু থাকবে না।

একটু ভেবে নিয়ে ছেলেটি বলল।

ঠিক আছে, চল।

দরজা বন্ধ করে মেয়েটিকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

সারা শহর অঘোরে ঘুমাচ্ছে। পথ জনমানবহীন। কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর শুধু জটলা করছে।

যে দোকানে ছেলেটি কাজ করত, মেয়েটিকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল।

মালিক দোকানের মধ্যেই থাকত। পিছন দিকে।

কয়েকবার ধাক্কা দিতে দরজা খুলেই অবাক।

এ কি রে! এত রাত্রে কাকে এনেছিস?

ছেলেটি সব বলল। শুধু একরাতের আশ্রয় প্রার্থনা করল।

কিন্তু এইটুকু জায়গা, কোনরকমে তক্তপোষ ফেলে আমি শুই, এখানে জায়গা হবে কি করে?

কোন রকমে হোল।

তক্তপোষের ওপর মালিক, নীচে ছেলেটি। মেয়েটি দোকানের সামনের দিকে শিশিবোতল সরিয়ে শোবার জায়গা করে নিল।

ভোর ভোর ছেলেটি আর মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

সোজা কালীমন্দিরে।

বিয়ে সেরে দুজনে ফিরল।

সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। মেয়েটির অপরূপ মূর্তি।

মালিকই বলল।

একটা কাজ করা যাক। আমি এবার থেকে বাড়ীতেই শোব। তোমরা দুজনে দোকান আগলাও। তোমার বৌকেও কাজে লাগিয়ে দাও। দোকানে বসবে। তাহলে বিক্রি বাড়তে পারে।

তাই ঠিক হল।

ছেলেটি যোগাড়যন্ত্র করে দিত। মেয়েটি শুধু জিনিসগুলো খদ্দেরদের হাতে তুলে দিয়ে, দাম নেবে।

এ তল্লাটে মেয়েছেলের দোকানে জিনিস বিক্রি করতে বসা এই প্রথম। খবরটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যেতে সত্যিই বিক্রিটা বাড়ল।

মেয়েটির মা জানতে পেরে একদিন গাছকোমর বেঁধে এসে হাজির।

মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে। তার মেয়েকে ফুসলিয়ে বের করে এনেছে, এই মর্মে পুলিশে খবর দেবে।

কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। মেয়ে বেঁকে বসল। আশপাশের অনেকেই। ছেলেটি বলল, তার বিয়েকরা পরিবার। উল্টে সেই পুলিশে খবর দেবে।

বেগতিক দেখে মেয়েটির মা সরে গেল।

যাবার আগে ছেলেটির চোদ্দপুরুষ তুলে খিস্তি।

মেয়েটি ছেলেটির কাছে অহোরাত্র জপ করতে লাগল।

মনে থাকে যেন, তোমাকে আলাদা দোকান করতে হবে।

এই পর্যন্ত বলে অমর থেমে বুকে হাত বোলাতে লাগল।

রীণা বলল, আপনার যখন কষ্ট হচ্ছে, তবে থাক। বাকিটা পরে শুনব।

অমর ম্লান হাসল।

পরে বলার হয়তো আর সময় পাব না। যা বলার আমাকে তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে হবে। একটু জল দাও তো।

জলের সন্ধানে রীণা এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখল কোণের দিকে একটা কুঁজো রয়েছে। মুখে গ্লাশ চাপা।

গ্লাশে জল নিয়ে অমরের মুখের কাছে ধরল।

একটু একটু করে অনেকটা জল পান করে অমর গ্লাশ রীণার হাতে ফিরিয়ে দিল। চাপাকণ্ঠে অমর আবার বলতে শুরু করল।

ছেলেটি নিজের পায়ে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। শুধু দোকানে বেচাকেনাই নয়, কোন্ মাল কোন্ দোকান থেকে কি দামে খরিদ করা হয়, তারও খোঁজ রাখতে আরম্ভ করল।

বছরদুয়েক পর শহরতলীর রাস্তায় ছোট একটা ঘর ভাড়া করে দোকান শুরু করল। দোকানের নাম দিল রত্না স্টোর্স।

এখানেও রত্না দোকানে বসল। ছেলেটি হিসাবপত্রের ভার নিল।

প্রথম কয়েক মাস বেশ ভালই চলল।

দোকানের আয়তন একটু বাড়ল। জিনিসপত্রও বেশী রাখতে লাগল।

তারপর দুর্দিন শুরু হল।

আশেপাশে নানা আকারের দোকান গজিয়ে উঠল। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে গোলমালও।

পাড়ার কিছু ছোকরা, বোধহয় অন্য দোকানীদের প্ররোচনায়, রত্না স্টোর্সে

সামনে গণ্ডগোল করতে লাগল।

সে গণ্ডগোল একসময় মিটল, কিন্তু অসুবিধা হল অন্য জায়গায়।

যাদের কাছ থেকে ধারে মাল নেওয়া হত, তারা তাগাদা দিতে শুরু করল।

আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আগের টাকা না পেলে নতুন করে জিনিস আর তারা দেবে না।

দুজনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

রত্নার গায়ে সামান্য যা অলঙ্কার ছিল, শেষ হল। ছেলেটির যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিও খতম।

তখন রত্নার কোলে একবছরের একটি মেয়ে।

সোৎসাহে রীণা প্রশ্ন করল।

তার মানে আমি?

এ প্রশ্নের অমর কোন উত্তর দিল না।

অর্থের অকুলান হলেই অশান্তি শুরু হয়। দাম্পত্য বিরোধ। তাই হল।

সামান্য ব্যাপারেই দুজনে রেগে যেতে লাগল।

ছেলেটিই বেশী। সব কিছুতে মেয়েটির ওপর দোষারোপ করল।

এ কথাও বলে ফেলল, তার জীবনে মেয়েটি শনি। মেয়েটি না থাকলে একলা পুরুষমানুষ তার ভাবনা কি!

দরকার হলে মুটেগিরি করে জীবিকা অর্জন করত।

ক্রমে অবস্থা চরমে উঠল।

পাওনাদাররা মামলা করার ভয় দেখাল। দোকানের মাল আটক করতে চাইল। বাকি ভাড়াবাবদ বাড়ীওলা মামলা দায়ের করল।

দুজনের চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। আলোর সামান্য রেখাও কোন-দিকে নেই।

ছেলেটি ক্ষেপে উঠল।

কি হবে এবার?

রত্নার দু চোখে অবিরল জলের ধারা।

কি হবে আমি বলি কি করে? মেয়েটাকে কি করে বাঁচাব বল?

রত্না দু একবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করার চেষ্টা করল।

কিন্তু সুবিধা হল না।

বাড়ীর গিন্নিরা বলল।

না বাছা, তোমার মতন এই বয়সের মেয়ে, আগুনের মতন রূপ ঘরে ঢুকিয়ে কি

নিজের বিপদ ডেকে আনব।

কান্নাকাটি করেও কোন ফল হল না।

এবার ছেলেটি ফণা তুলল। বাচ্ছা মেয়েটা সকাল থেকে কিছু খায় নি। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি ফেটে পড়ল।

জাতব্যবসায় নেমে পড়। বাঁচতে তো হবে।

মেয়েটি দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল, ছেলেটির কথা কানে যেতেই চমকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

কি, কি বললে ?

যা বললাম তাতো বেশ জোরেই বলেছি, না শুনতে পাবার কথা নয়।

তুমি এমন কথা বলতে পারলে আমাকে ?

কেন পারব না। এ ছাড়া তোমার আর কি যোগ্যতা আছে।

মেয়েটি একটি কথাও না বলে, দ্রুত পা ফেলে খোলা দরজা দিয়ে বের হযে গেল।

পরের দিন ছেলেটা অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথাও পেল না।

দিনপনের কাটল।

ছেলেটি অনেক চেষ্টা করে এক স্টেশনারি দোকানে কাজ পেল। যৎসামান্য মাইনা। কিন্তু বাধা হল কন্যা।

একে কোথায় রেখে যাবে ? কার কাছে ?

অনেক ভেবেচিন্তে এক ছুটির দিন মেয়েকে কোলে করে বেরিয়ে পড়ল। ডায়মণ্ড হারবার রোডের ওপর এক অনাথ আশ্রম। যেতে আসতে লক্ষ্য করেছে। কয়েকজন পাদ্রী পরিচালনা করে।

মেয়েকে তাদের জিম্মায় রেখে দিল।

স্পষ্টই বলল, মেয়েকে খাওয়াবার, পরাবার সামর্থ তার নেই। ভাগ্যের খোঁজে সে বিদেশে চলে যাচ্ছে। কাজেই, সায়েবরা দয়া করে যদি মেয়ের দেখাশোনা করে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে তার সাধ্যমত খরচ সে যোগাবে।

পাদ্রীরা সহজে নিল না।

থানায় ফোন করল। এ বয়সের, এ রকম দেখতে কোন মেয়ে হারিয়েছে কিম্বা চুরি গিয়েছে কি না।

সন্তুষ্ট হয়ে তবে মেয়েকে রাখতে রাজী হল।

ছেলেটি আর একটি কথাও বলল।

মেয়েটিকে পিতৃপরিচয় যেন না দেওয়া হয়, তাহলে সে পিতাকে ঘৃণা করবে।

রীণা তন্ময় হয়ে শুনছিল, এবার সে বলল।

আপনার বলতে কষ্ট হচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত না হয় থাক।

অমর মাথা নাড়ল, না না, শোন। আর বেশী বাকি নেই।

রত্নার অনেক খোঁজ করেছিল ছেলেটি, কিন্তু সন্ধান পায় নি। মাসের শেষে একটি লোক এসে ছেলেটিকে মোটা টাকা দিয়ে যেত। লোকটিকে দেখে মনে হত ড্রাইভার। হিন্দুস্থানী।

তার খবর জিজ্ঞাসা করলে বলত, মাইজী পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠিকানা বলা মানা আছে। মাপ করবেন।

ছেলেটি এইটুকু বুঝতে পেরেছিল সে কোন বড়লোকের কাছে দেহ বন্ধক রেখে এই টাকা উপায় করছে।

দু একবার ভেবেছিল, এ পাপের টাকা স্পর্শ করবে না। কিন্তু টাকার লোভের কাছে হার মেনেছিল।

তাকে বাচতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য টাকার প্রয়োজন। যখন বছর ঘুরল, তখন ছেলেটির হাতে ভালই টাকা জমেছে।

সে ঠিক করেছিল মসলাপাতির দোকান দেবে। বেশ কয়েক মাস বড়বাজারে ঘুরে ঘুরে হালচাল দেখল। কমিশনে কাজও করল তারপর দোকান ভাড়া নিয়ে নিজের কারবার খুলল।

অদৃষ্ট বোধহয় এবার প্রসন্ন। ভালই আয় হল।

মেয়েটার স্কুলের খরচ, পোশাকের জন্য টাকা বাড়িয়ে দিল।

নিজে যখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে তখন ভাবল এবার রত্নাকে বাড়ীতে নিয়ে আসবে।

পরের মাসে ড্রাইভার আসতে ছেলেটি সে কথা বলবার আগেই ড্রাইভার বলল, মাইজী এসেছেন।

মাইজী! কোথায়?

গাড়ীতে বসে আছেন।

রাস্তায় বেরিয়ে ছেলেটি মোটর দেখতে পেল না।

ড্রাইভার বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

একটু দূরে পার্কের পাশে কালো একটা মোটর।

কাছে গিয়েই ছেলেটি চমকে উঠল।

ঝলমলে পোশাকে রত্না বসে আছে রাজেন্দ্রাণীর মতন।

রং যেন আরও উজ্জ্বল, কিঞ্চিৎ মেদের সঞ্চার হয়েছে, কিন্তু কাছে গেলে বোঝা

বায়, দ্বটি চোখের কোলে কালির ছোপ। বিষণ্ণ দৃষ্টি।

ছেলেটি কাছে যেতেই সে বলল।

রীণাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। একবার দেখাবে?

তাকে অনাথ আশ্রমে রেখেছি।

মনে হল তার দ্বটো ঠোঁট অল্প কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল। জানি। তাকে একবার দেখব।

ছেলেটি রত্নার পাশে উঠতে যেতেই সে হাত নেড়ে বারণ করল।

না, এখানে নয়। তুমি সামনে বস।

ছেলেটি ড্রাইভারের পাশে বসল যথেষ্ট ক্ষ্বধচিত্তে।

সে রীণার কাছে গেল না। মেয়েরা দলবেঁধে মাঠে খেলছিল দ্বর থেকে তাকে দেখলে।

একটা গাছের মোটা গুঁড়ির পিছনে নিজেকে প্রায় অদৃশ্য রেখে জলভরা চোখে রত্না দেখল। হয়তো ভাবল, কাছে গেলেও মেয়ে মাকে চিনতে পারবে না। দ্বজনের মাঝখানে অপরিচয়ের প্রাচীর উঠেছে।

রত্না আর ছেলেটি ফিরে এল।

ছেলেটিকে নামিয়ে দেবার সময় সে বলল।

আর তো তোমার টাকাপয়সার দরকার নেই?

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আমি পায়ের তলায় মাটি পেয়েছি। আর তোমাকে টাকা পাঠাতে হবে না। এবার তুমি ফিরে এস।

রত্না মুচকি হাসল।

ঠিক আছে, আমি পরশ্ব আসব।

ছেলেটি সারাদিন ধরে বাড়ী সাজাল। খাট, আলমারি কিনল। দ্ব একটা শাড়ী। সোনার একছড়া হার। ঠিক করল, রত্না আসার পরের দিন রীণাকে অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে আসবে।

আশ্চর্য মানুষের মন। রত্নার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করতে করতেই মনে হল, কি করে তাকে স্পর্শ করবে! বহুচারিণী এক নারীকে কি করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। কিন্তু এ চিন্তা স্থায়ী হল না।

ছেলেটি ভাবল, রত্না যা করেছে তা শ্বধ্ব একটা সংসার বাঁচাবার জন্য

বাইরে মোটরের হর্ন বাজতেই ছেলেটি ছ্বটে বাইরে গেল।

রত্না আসে নি। খালি মোটর।

ড্রাইভার নেমে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বোড়ো কাকের মতন।

মাইজী? মাইজী আসে নি?

মাইজী আর আসবে না বাবুজী। কাল রাতে ঘুমের বড়ি খেয়ে মাইজী শেষ হয়ে গিয়েছে।

ছেলেটি অনুভব করল শুধু পায়ের তলার মাটিটুকুই নয়, সারা পৃথিবী কাঁপছে। চোখের জলে সামনের রাস্তা ঝাপসা।

একসময়ে চীৎকার করে উঠল।

গণিকা, গণিকার মতনই কাজ করেছে। কেউ সংসার করুক সেটা তার বাসনা নয়।

বার বার ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে গিয়ে রত্নার নিথর দেহটা একবার দেখে আসি। কেন সে আমাকে এমন শাস্তি দিয়ে যাবে! তারপরই মনে পড়ে গিয়েছিল, তার দেহ কখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

তখন থেকে বুকের মধ্যে জ্বলে গেলেও রত্নার কথা আর ভাবি নি। যখন ভাবতাম তখন এই কথাই ভাবতাম সে স্বৈরিনী।

সেই পরিচয়ই তোমাকে দিয়েছিলাম।

নিজে সংসার বাঁধতে পারি নি, তাই আক্রোশ ছিল, আর কাউকে সংসার বাঁধতে দেব না।

সেই জন্যই তোমার বিয়ের পর তোমাকে বলেছিলাম, স্বামীকে সব কথা বলতে। তুমি আমার প্রলাপ না শুনে ভালই করেছ।

আমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমার মা নিজের দেহ বাঁধা দিয়ে রোজগার শুরু করেছিল, যে মুহূর্তে আমি পায়ের তলার মাটি পেলাম, তাকে সংসারে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানালাম, সে চলে গেল, কারণ সে জানত বহুভোগ্যা দেহ নিয়ে সে সংসারের পবিত্র অঙ্গনে আসতে পারবে না।

দু হাতে মুখ ঢেকে অমর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে রীণা তার মাথায় হাত রাখল।

ভাবল, তার মা যদি অসতী হয়, তো সতী কে! রীণা কি করবে? সে-ও তো মূর্খের মতন দেহ কলুষিত করেছে। সুকোমলের সংসারে ফিরে যাবার অধিকার কি সে হারিয়েছে!

স্মৃতি-বিস্মৃতি

সোমা পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল, নিথর হয়ে গেল। একটা হাতে মেয়ের হাত ধরা ছিল। সে হাত শিথিল।

দরজার মাঝখানে গোল কাঁচ বসানো। তার মধ্য দিয়ে ভিতরের সব দেখা যায়। সোমা দেখতে পেয়েছিল।

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে কাগজে সই করছিল। মাথা তুলতেই চেনা গেল।

অনেক বছরের ব্যবধান। তবু মনে হল খুব পরিবর্তন হয় নি।

কানের দু পাশের চুলে রুপালী স্পর্শ। চোখে চশমার কাঁচ আরো ভারি হয়েছে।

রং, মুখচোখ ঠিক আগেরই মতন। দূর থেকে তাই মনে হল।

এ বয়সে শরীরে একটু বাড়তি মেদের সঞ্চার হয়, এর বেলা কিন্তু তা হয় নি।

দেখার পর সোমা আর ভিতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। সামনে যেন দর্পণ, এইভাবে নিজের চেহারার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।

এ ক' বছরে সোমাও কি অনেক বদলেছে!

মনের পরিবর্তন তো নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু দেহের।

সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই কি নিরুপম চিনতে পারবে?

নিরুপমের নামটা উচ্চারণ করতেই সোমা শিউরে উঠল।

খুব পরিচিত একটা নাম। রক্তের সঙ্গে মেশানো। শরীর থেকে আলাদাকরা যেন সম্ভব নয়। অন্তত সোমার একদিন সেই ধারণাই ছিল।

অথচ কত সহজে আলাদা হয়ে গেল।

যে বন্ধন অচ্ছেদ্য বলে মনে হয়েছিল, সে বন্ধন ছিন্ন করতে বছরকয়েকের বেশীও লাগে নি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোমা ভাবতে লাগল।

ভালবাসার নদী বেয়ে নিরুপম তার জীবনে আসে নি।

দাদার বন্ধু, সেই সুবাদে বাড়ীতে আসত। সোমার মাবাপের ছেলেটিকে ভাল লেগেছিল। সরকারি কলেজের অধ্যাপক। সুশিক্ষিত, মার্জিত। ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হবার সম্ভাবনা।

সোমা তখন বি-এ পরীক্ষা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সংসারের এই নতুন আগন্তুককে ভাল করে দেখার, তার সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগই পায় নি।

সোমার বাবা নিরুপমের বাপের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

মেয়ে দেখা, পছন্দ হওয়া, দেনাপাওনা সম্বন্ধে কথাবার্তা, ঠিক ধাপের পর ধাপ, এসব স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিল।

তারপর বিয়ে।

বাসরঘরেই মনে হয়েছিল নিরুপম অস্বাভাবিক গম্ভীর। মেয়েদের চটুল পরিহাসে বার বার তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

শুধু বাসরঘরে নয়, জীবনেও তাই।

নিরুপম একটা ছকবাঁধা পথে চলাফেরা করে। সারাজীবনের দিনলিপি তার প্রায় কণ্ঠস্থ। অধ্যাপনা আর অধ্যয়ন, জীবনের মাকু এই দুটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

দুদিনেই সোমা হাঁপিয়ে উঠল।

বি-এ পাশ করার পর নিরুপমের ইচ্ছা ছিল, সোমা এম-এ পড়ুক, কিন্তু সোমা রাজী হয় নি।

বলেছে, মাথা খারাপ, সারাটা জীবন যদি কেবল পরীক্ষাই দেব তো, জীবন উপভোগ করব কখন?

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে নিরুপম প্রশ্ন করেছিল।

জীবন উপভোগ করা মানে কি বোঝ? চটুল সিনেমা দেখা আর সস্তা নভেল পড়া?

না, দৃঢ়ভাবে সোমা উত্তর দিয়েছে, ওসব হবে কেন! তোমার আমার দুজনের স্রোতকে একমুখী করা।

বিস্ময়ে অনেকক্ষণ নিরুপম চোখ ফেরাতে পারে নি সোমার দিক থেকে।

কি, বুঝতে পারলে না?

সোমা প্রশ্ন করেছে।

না, স্বীকার করেছে নিরুপম, কলেজে বাংলা পড়াই বটে, কিন্তু গদ্য আমাকে পড়াতে হয়, কাব্য নয়। তুমি একটু সবলভাবে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

ঘরের কোণ থেকে শান্তিনিকেতনী মোড়াটা নিয়ে সোমা নিরুপমের কাছে বসেছিল।

তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াবে। দিল্লী, জয়পুর, বম্বে, তা না হয় তো হাজারীবাগ, রাঁচী, আর তাও যদি না সম্ভব হয়, তাহলে ভিক্টোরিয়া, বটানিকস্, ডায়মণ্ড হারবার।

কবে?

যেদিন থেকে তোমার খুশী। ইচ্ছা হলে কাল থেকেই।

টেবিলের ওপর স্তূপাকারে রাখা পরীক্ষার খাতাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে নিরুপম বলেছিল।

এগুলোর কি হবে ?

উত্তর দিতে সোমার একটুও দেরী হয় নি।

আগুন ধরিয়ে দাও।

নিঃসন্দেহে সদিচ্ছা, কিন্তু এগুলোয় আগুন ধরানো মানে নিজের কপালে আগুন ধরানো তা বুঝলে ?

তাহলে ? সোমার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তপ্ত, তাহলে এক কাজ করা যাক। তুমি বসে বসে খাতা দেখ, আর আমি বসে বসে আসন্ন শীতের জন্য তোমার সোয়েটার বুনি। কি সুন্দর জীবন!

তা কেন, নিরুপম আপোষ করার চেষ্টা করেছে, তুমি এম-এটা পড়তে আরম্ভ কর। বাংলা নিয়েই পড়, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ব্যাপারটা লঘু করার চেষ্টায় সোমা বলেছে।

উহুঁ, ছোকরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে আমার পড়তে ভরসা হয় না।

নিরুপম গম্ভীর হয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে আর কথা হয় নি।

মাসকয়েকের মধ্যে সোমার জীবন নতুন খাদে বইতে শুরু করল।

কলেজ জীবনের বান্ধবী সুধা। ডেপুটি কমিশনারের মেয়ে। ঝকঝকে মোটরে কলেজে আসত। নিজেকে সাজাত প্রজাপতির ঢঙে।

বসত সোমার পাশে। তার সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা ছিল বেশী।

ভালবেসে এক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে জীবন জড়িয়েছিল, কিন্তু সে বাঁধন অটুট হয় নি।

সুধা নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল।

এখন সে কোন্ এক অফিসে বড় চাকরী করে, আর অবসর সময়ে সমাজ সেবা। গোটাতিনেক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা, আরো কয়েকটার সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত।

সুধার সঙ্গে সোমার দেখা হল নিউ মার্কেটে।

সোমা পর্দা বাছাই করছিল, সুধা পিছন থেকে হাত জাপটে ধরল।

পর্দা কেনা পড়ে রইল, দুই বান্ধবীতে অফুরন্ত গল্প।

সুধার মোটরেই সোমা ফিরেছিল।

বর কি করে ?

কি করে সোমা বলল।

কলেজের মাস্টার? অবজ্ঞায় সুধা নাক কুঁচকে ছিল, খোঁজ করে দেখিস, ছাত্রীদের সঙ্গে কোন 'অ্যাফেয়ার' ছিল না তো?

সোমা হেসেছে।

দূর, একেবারে নিরামিষ। কোন যোগ্যতা নেই।

সময় কাটাস কি করে?

সময় আর কাটে কই? সোমা অনুযোগ করেছে, বাড়ীর লোকটা কলেজফেরত দুটো টুইশনি সারে। তার ওপর 'ডি ফিল'-এর থিসিস নিয়ে মাঝরাত অবধি কাটায়।

চল, কাল তোকে নারী কল্যাণ সমিতিতে নিয়ে যাব। আমরা একটা বিচিত্রানুষ্ঠান করছি। তুই তো গান গাইতে পারিস। চারটার সময় তৈরি থাকিস।

সেই শুরু।

অসুবিধা কিছু নেই। বাড়ীতে ঝি আছে। নিরুপম ফিরলে তার চা জলখাবারের ব্যবস্থা সেই করতে পারে।

তবে চা জলখাবারের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেটা নিরুপম ছাত্রদের বাড়ীতেই সেরে আসে।

আটটার মধ্যে সোমা বাড়ী ফেরে।

প্রথম প্রথম সোমার ধারণা হয়েছিল নারীকল্যাণ সমিতি শুধু নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই ভুল ভাঙল।

একেবারে পিছন দিকে জন পাঁচছয় যুবক। তাদের পোশাকে মনে হ'ল বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

সোমা জনান্তিকে সুধাকে প্রশ্ন করেছিল।

ওঁরা কেন? মেয়েদের ক্লাব না?

সোমার অজ্ঞতায় সুধা বিস্মিত হয়েছিল।

টিকেট বেচা, বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, সবই তো ওঁদের করতে হবে। ওঁদের না হলে চলে? সবাই বড় চাকুরি করে, প্রচুর জানাশোনা।

এর দিনকয়েক পরেই রিহার্সাল শেষ হতে সুধা বলল।

সোমা, আজ আর তোকে নামিয়ে দিতে পারছি না ভাই। আমাকে একবার পোশাকের দোকানে যেতে হবে।

ঠিক আছে, আমি ট্যাক্সি করে চলে যাব।

ট্যাক্সি করে যাবি কোন্ দুঃখে? দাঁড়া তোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তপনবাবু, একমিনিট।

সুবেশ একটি তরুণ এগিয়ে এল।

কিছু বলছেন ?

আমার এই বান্ধবীকে যদি একটু লিফ্‌ট্‌ দেন। আপনার বাড়ীর দিকেই থাকে।

একটু নীচু হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাইটের কায়দায় তপন বলল।

খুবই আনন্দের সঙ্গে।

মোটরেই কথা হল।

তপন বলল।

অপূর্ব আপনার কণ্ঠ। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উপযোগী আপনার স্বর জানেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রাণ হচ্ছে অনুভূতি। ভাব আর ভাষা হৃদয়ে অনুভ করতে না পারলে, সঙ্গীতে ফোটানো অসম্ভব।

অন্যদিনের তুলনায় রাত একটু বেশী। তবে কলকাতার পক্ষে এমন কিছু বে নয়।

এলোমেলো বাতাসে বারবার সোমার শাড়ীর আঁচল উড়ে তপনের দেহের ওপ গিয়ে পড়ল। তপনের চুল থেকে দামী একটা সুগন্ধের রেশ ভেসে আসছে।

এ ধরনের প্রশংসায় সোমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কোন উত্তর দিতে পারল না ঠিক বাড়ীর সামনে বিপর্যয় ঘটল।

দরজার কাছে মোটর থামতেই হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল সামনে নিরুপম সে বোধহয় তখনই ফিরছে।

সোমা নামতে তপন হেসে বলল।

গুড নাইট। কথা রইল, আমার মোটরেই প্রত্যেক দিন কিন্তু আপ ফিরবেন।

সোমা নিরুপমকে দেখেছিল, কাজেই কোন উত্তর দিল না।

মোটর সরে যাবার পর, অন্ধকারে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল।

নিরুপম আর সোমা।

সোমা আশা করেছিল নিরুপমই প্রথম কথা বলবে। তাই বলল।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে নিরুপম বলল।

নারী কল্যাণ সমিতিতে কি আজকাল পুরুষ সদস্যও নেওয়া হচ্ছে নাকি ?

তখনই সোমা কোন উত্তর দিল না। কোন উত্তর তার তৈরিও ছিল না।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে বিছানার ওপর বসে বলল।

ইনি সদস্য নন। কোন পুরুষ সদস্য নেই।

হাতের বইখাতা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে নিরুপম উত্তর দিল।
এঁরা সদস্য নন, তবে এঁরা কি সদস্যাদের মনোরঞ্জনের সঙ্গী?
অনেক চেষ্টা করেও সোমা নিজেকে সংবরণ করতে পারল না।
তুমি না অধ্যাপক, ছাত্রদের শিক্ষাদান কর। ভাষাটা অন্তত ভদ্র কর।
কথা শেষ করে সোমা আর দাঁড়াল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল।
একই টেবিলে দুজনে মুখোমুখি খেতে বসল, কিন্তু একটি কথাও হল না।
বড় গরম এই অজুহাতে সোমা বালিশ নিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। পাখার ঠিক নীচে।
পরের দিনও কোন কথা নয়। খেয়েদেয়ে নিরুপম কলেজ বেরিয়ে গেল।
সোমা বাড়ীর কাজে নিজেকে অযথা ব্যস্ত রাখল।
সেদিনও বিকালে তপন এসে দাঁড়াল।
চলুন, সারথি প্রস্তুত।
সোমা এ পরিহাসের কোন উত্তর দিল না।
পাশ কাটাবার ভঙ্গীতে বলল।
আজ আমার অন্যদিকে যেতে হবে।
তপন হাসল। অমায়িক হাসি।
আমার রথ তো অন্যদিকেও যেতে পারে।
এবার সোমা প্রমাদ গণল।
তপন ভব্যতার গণ্ডি ছাড়াচ্ছে। এখন থেকেসাবধান না হলে বিপদের সম্ভাবনা।
তাই সোমা একটু গলা চড়াল।
আপনাকে তো বললাম আমি অন্যদিকে যাব। সুধার বাড়ীতে।
সোমার মুখের ভাব দেখে তপন আর সাহস করল না। পিছিয়ে গেল।
কিন্তু দুদিন পরে সেই একই ব্যাপার।
সুধা আসে নি। সোমা গিয়ে একটু অপ্রস্তুত হল।
যথারীতি রিহার্সাল হল। সোমা একটু তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ল।
বাসস্টপে যখন দাঁড়িয়েছিল, তখন পিছনে মোটরের হর্ন।
চমকে সোমা মুখ ফেরাল।
তপনের মোটর। তপন চালকের আসন থেকে মুখ বের করে রয়েছে।
সোমা কিছু বলার আগেই তপন মোটরের দরজা খুলল
উঠে আসুন। এ পথে বাস সহজে আসে না।
সোমার আশেপাশে কিছু লোকের জটলা। সবাই বাসের জন্য অপেক্ষা

করছিল।

তারা একবাক্যে তপনের কথায় সায় দিল।

নাটকীয়তা এড়াবার জন্যই সোমা তাড়াতাড়ি মোটরে উঠে বসল।

তপন মোটর চালু করে বলল।

একটা কথা আছে।

মাত্র একটা? আমি তো হাজার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তপনের উচ্ছ্বাসে সোমা কান দিল না।

বলল, আমি বাড়ী যাব না। অন্য জায়গায় আমাকে নামিয়ে দেবেন।

কি ব্যাপার বলুন তো?

তপন সোমার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

কিসের কি ব্যাপার?

বাড়ীর লোকটির সঙ্গে কি ঝগড়া চলছে নাকি?

কেন, ঝগড়া চলবে কেন?

সেদিন বললেন, বাড়ী যাব না। আজও তাই। জটিল দাম্পত্য কলহ বলে যেন মনে হচ্ছে।

না, না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোমা মাথা নাড়ল, আমার নিজের একটু কা[illegible] আছে।

আর কোন কথা হল না।

সুপটু হাতে মানুষ কাটিয়ে কাটিয়ে তপন এগিয়ে চলল। গতি কখনও মৃদ কখনও দ্রুত।

সোমা মনে মনে ভাবতে লাগল, ঠিক কোথায় নামবে।

বাড়ীর কাছাকাছি কোন জায়গা হলেই ভাল হয়। তাহলে বাড়ী ফেরবার জ[illegible] কোন যানবাহনের প্রয়োজন হবে না।

গলির মোড়ে এসে সোমা বলল।

একটু থামান।

তপন মোটর থামাল।

আমি এখানে নামব।

আমি অপেক্ষা করব?

না, আমার দেরী হবে, কিছু মার্কেটিং করার আছে।

তপনকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জোরপায়ে সোমা এগিয়ে গে[illegible] একপ্যাকেট চা আর একটা সাবান কিনে সোমা ফেরবার সময় সতর্ক চোখে এ[illegible]

ওদিক দেখল।

না, তপনের মোটর ধারেকাছে কোথাও নেই।

বাড়ী ফিরে দেখল, নিরুপম একমনে টেবিলের ওপর কি লিখছে।

সোমা একটু শব্দ করেই ঘরে ঢুকল, কিন্তু নিরুপম ফিরেও দেখল না।

পাখা বন্ধ ছিল। সোমা পাখার সুইচ খুলে দিল।

দমকা বাতাসে টেবিলে রাখা কাগজপত্রগুলো ইতস্তত উড়ে গেল।

নিরুপম চেয়ার থেকে উঠে কাগজগুলো জড় করে আবার টেবিলে রাখল। চাপা দিয়ে।

পাশের চেয়ারে সোমা বসল।

দূর, আর ভাল লাগছে না।

নিরুপম চেয়ে দেখল। কোন কথা বলল না।

কাল থেকে আর রিহার্সালে যাব না।

এবার খুব মৃদুকণ্ঠে নিরুপম বলল।

হঠাৎ অমৃতে অরুচি?

অমৃত আবার কি? বাড়ীতে বসে একলা করবই বা কি?

কেন, মোটরবিহারীকে আমন্ত্রণ জানালেই পার। পথে পথে না বেড়িয়ে ঘরের নিভৃতিতে অসুবিধা কম হবার কথা।

তার মানে?

সোমা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

সোজা বাংলাভাষাও বুঝতে পারবে না, এটা কিন্তু আশা করি নি।

আঁচল দিয়ে সোমা মুখ মুছে নিল।

শুধু মুখের ঘাম নয়, বুঝি কিছুটা উত্তেজনা প্রশমিত করারও চেষ্টা।

একজন ভদ্রলোক একদিন বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, সেটা কি এমন গর্হিত কাজ যে তার জন্য তোমার মুখে ইতরামির বন্যা বইবে?

কলমটা বন্ধ করতে করতে নিরুপম উত্তর দিল।

একদিন? আজও তো ভদ্রলোক তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তবে আজ বাড়ীর দরজায় নয়, গলির মোড়ে।

কয়েক মুহূর্তের একটু বিমূঢ় ভাব, তারপরই সোমা ফণা তুলল।

তুমি বুঝি আমার পিছনে আজকাল গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ?

নিরুপমের কণ্ঠ শান্ত।

তোমার সুবিধার জন্য অন্ধ তো আর হতে পারি না

সোমা একটু দম নিল, তারপর বলল।

তুমি না শিক্ষিত? শিক্ষার গর্ব কর।

নিরুপম মুচকি হাসল। ব্যঙ্গের হাসি।

তুমিও তো গ্র্যাজুয়েট, অন্তত বিয়ের সময় তাই শুনেছিলাম। গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষিতই বলা হয়।

এবার সোমা সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেরুদণ্ড টান করে।

তুমি কি বলতে চাও?

কি বলছি একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। তুমি যা করে বেড়াচ্ছ সেটা খুব প্রীতিকর নয়, অন্তত আমার পক্ষে।

সোমা আর দাঁড়াল না। তার মাথায় আগুন জ্বলছে। এখন কথা বলতে গেলে বিশ্রী কিছু একটা বলে ফেলবে।

পাশের ঘরে গিয়ে সোমা সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

এটা বাক্স-প্যাঁটরা রাখবার ঘর। অপরিসর। কিছুটা অপরিচ্ছন্নও।

মাঝে মাঝে এ ঘরে সোমা রাত কাটিয়েছে।

সাময়িক মনোমালিন্যের সময়।

সে মনোমালিন্যের মধ্যে অবশ্য আজকের মতন পরপুরুষের ছায়া ছিল না।

মাটিতে বসতেই সোমার দু চোখে জল ভরে এল।

কিছুটা অভিমানে, কিছুটা অপমানে।

আজ যদি নিরুপম ওকে সঙ্গদান করত, তাহলে এসবের প্রয়োজনই হ'ত না।

কাল থেকে নারী কল্যাণ সমিতিতে আর যাবে না। সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করলেই তপনের সঙ্গে দেখা হবে না।

সোমার ধারণা ছিল, নিরুপম রাতে একবার দরজায় টোকা দেবে। অনুচ্চকণ্ঠে সোমাকে ডাকবে।

কিন্তু নিরুপমের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সোমা বুঝতে পারল একসময় নিরুপম চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল। চটির শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তার মানে নিরুপম খাবার ঘরে গেল।

পরনের শাড়ীটা কিছুটা খুলে সোমা শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর নিরুপম ফিরে এল। চেয়ার টেনে আবার বসল।

এই সময় সে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। সোমার সঙ্গেও দু একটা কথা বলে।

আজ বেশীক্ষণ আলো জ্বলল না। নিরুপম বাতি নিভিয়ে দিয়ে সম্ভবত শুয়ে পড়ল।

ও ঘর অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে এদিকের ঘরও অন্ধকার হয়ে গেল।

হঠাৎ সোমার খেয়াল হল।

মেয়ের হাতধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একভাবে।

মনটা দ্রুত পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। হারানো বছরের ঘটনাগুলো আবর্তিত হচ্ছিল মনের সামনে।

কাঁচের মধ্যে দিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখল, নিরুপম নেই। চেয়ার খালি। কখন উঠে গেছে।

তার মানে, হয়তো সোমার সামনে দিয়েই গেছে।

সোমা আস্তে আস্তে এসে সামনে পাতা বেঞ্চের ওপর বসল। মেয়েকেও পাশে বসাল।

একটা বেয়ারা যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে সোমা জিজ্ঞাসা করল।

রেক্টর কি বাইরে গেছেন?

হ্যাঁ, লাঞ্চে। দুটোর পর আসবেন।

এখন একটা পাঁচ। রেক্টরের ফিরতে অনেক দেরী।

বাতাসে হিমের স্পর্শ। বাইরের বিস্তীর্ণ লনে দু একটি ছোট ছেলে ঘোরাফেরা করছে।

সোমা মেয়েকে নিয়ে লনে চলে এল।

পাহাড়ে জায়গায় শীত একটু আগেই আসে। নীল আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ।

পরের দিন দুপুরবেলা সুধা এসেছিল।

এই শোন, আর তো হাতে বেশী সময় নেই। আজ থেকে চারটেয় রিহার্সাল। তাই বলতে এলাম।

আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমি বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব না।

সুধা চমকে উঠল।

সেকি, দর বাড়াচ্ছিস নাকি?

না ভাই, বাড়ীর লোকের এসব খুব পছন্দ নয়।

বাড়ীর লোকের? মানে নিরুপমবাবুর?

সোমা কোন উত্তর দিল না।

ঠিক আছে, আমি না হয় কথা বলে নেব। কখন ফিরবেন ভদ্রলোক?

দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে সোমা বলল।

আজ সাড়ে তিনটেয় ফেরার কথা।

বেশ আমি বসলাম। তুই আমাকে এককাপ কফি খাওয়া।

সোমা রান্নাঘরে চলে গেল।

কফি তৈরি করতে করতে ভাবল, এ ভালই হল। সুধার সঙ্গে নিরুপমের মুখো-মুখি কথা হওয়াই সমীচীন।

নিরুপম যখন ফিরল, তখন সুধা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছিল।

নিরুপম ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল।

এর আগে সুধার সঙ্গে বারদুয়েক দেখা হয়েছিল। কিছুটা আলাপ।

সুধা দু হাত জোড় করে নমস্কার করল।

আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আমার সঙ্গে? বলুন।

হাতের বইগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে নিরুপম একটা চেয়ার টেনে বসল।

আপনি নাকি সোমাকে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নিতে বারণ করেছেন?

বিচিত্রানুষ্ঠান? কাদের?

নারী কল্যাণ সমিতির।

এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। বারণ করা তো দূরের কথা।

সোমা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

সুধা তার দিকে চোখ ফেরাতে সে বলল।

কোন পুরুষের সঙ্গে আমার বাড়ী ফেরা চলবে না, তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ।

নিরুপম সুধার দিকে চেয়েছিল। সেইদিকে চেয়েই বলল।

নারী কল্যাণ সমিতি বললেন না?

হ্যাঁ। পুরুষরা সদস্য নন, শুভানুধ্যায়ী।

তাঁদের কাজ কি মহিলাদের এগিয়ে দেওয়া?

সুধা চটতে গিয়েও চটল না।

তাকে সমাজ সেবার কাজ করে বেড়াতে হয় এবং সেজন্য নানা মেজাজের লোকেরও সম্মুখীন হতে হয়।

কাজেই চটলে তার চলে না।

সে হাসল। হেসে বলল।

বোঝা যাচ্ছে আপনি স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসেন।

এ কথার নিরুপম কোন উত্তর দিল না।

চুপচাপ বসে রইল।

নিরুপমবাবু একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই।

বলুন।

নিরুপমের কণ্ঠ নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ। কোন আগ্রহের ছিটে নেই।

যে সব পুরুষ আমাদের সমিতিতে আসেন, তারা সকলেই শিক্ষিত এবং ভদ্র।

তাতে কি?

এবারেও নিরুপমের স্বর নিস্তেজ।

কোন ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে দিতে আসা মানেই তার সঙ্গে কোন রকম অশোভন আচরণ কেউ করে, এমন ধারণা আমার নেই।

নিরুপম কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল।

সোমা মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

নিরুপমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে সুধাকে বলল।

একটু অপেক্ষা কর, আমি শাড়ীটা বদলে নিই।

নিরুপম গম্ভীর মুখে হাতের কাছের বইটা খুলল। আর মুখ তুলল না।

মোটরে বসে সুধা বলল।

কাজটা কিন্তু খুব খারাপ করলি সোমা।

কেন?

নিরুপমবাবু যখন পছন্দ করেন না, তখন তোর আর সমিতিতে না আসাই বরং ভাল।

এবার সোমা বলে উঠল।

ড্রাইভার সামনে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল।

আমি কি আগের যুগের বারো বছরের বৌ যে গলবস্ত্র হয়ে স্বামীর সব কথা শুনতে হবে? আমার আলাদা কোন সত্তা থাকতে পারে না? আমার ব্যক্তিগত রুচিঅরুচি?

সবই থাকতে পারে সোমা, কিন্তু বৌ চিরদিনই বৌ। স্বামীর পথই তার পথ।

দেখ, এখনও বল, মোটর ঘোরাতে বলি।

মাথা খারাপ। এই বিচিত্রানুষ্ঠানে আমি গান গাইবই। তাতে যা হবার হবে।

সেদিন মহলায় সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সোমা স্বভাবতই স্বল্পবাক। বেশী কথা বলতে পারে না। একেবারে অন্তরঙ্গ দু একজনের সঙ্গে ছাড়া কথাও বলতে পারে না। কিন্তু সেদিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হৈ হৈ করল।

নিজের গান শেষ হতেই পুরুষদের মাঝখানে গিয়ে বসল।

তপন, অরিন্দম, মণিময়ের পাশে।

তাদের সামান্য রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ল।

নিজেও হাসাবার চেষ্টা করল।

সুধা যে একেবারেই কিছু বুঝল না, এমন নয়।

কিন্তু কিছু বলল না।

মহলা শেষ হতে সোমা তপনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আজ আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

তপন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। একটু বিব্রত কণ্ঠেই বলল।

সুধাদির গাড়ীতে যাবেন না?

না। সুধা একরাশ লোক নামাতে নামাতে যায়, ভাল লাগে না।

চৌরাস্তায় এসে সোমা বলল।

এখন তো সবে আটটা। চলুন একটু গঙ্গার ধারে ঘুরে যাই।

বিস্মিত তপন মোটর ঘোরাল।

তিথিটা বোধহয় পূর্ণিমার কাছাকাছি। আকাশে অখণ্ড চাঁদ। গঙ্গার বুকে হাজার চাঁদের ছায়া।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস বল।

প্রথমে গুণ গুণ করে তারপর একটু একটু করে সোমা গলা চড়াল।

গান শেষ হতে তপন উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল।

চমৎকার। কি মধুর আপনার কণ্ঠ।

উত্তেজনায় একটা হাত বাড়িয়ে তপন বোধহয় সোমার একটা হাতই ধরে ফেলত, কিন্তু তার আগেই সোমা সাবধান হয়ে গেল।

সীটের এককোণে সরে গিয়ে সোমা বলল।

জোরে চালান, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার স্বামীদেবতা আবার একটুতে আকুল হয়ে পড়েন।

সারাটা পথ আর কোন কথা হল না।

তপন স্টিয়ারিং ধরে রইল। সোমা বাইরের দৃশ্যে মনোনিবেশ করল।

বাড়ীর সামনে এসে সোমা একবার উপর দিকে চেয়ে দেখল।

ঘর অন্ধকার। তার মানে নিরুপম এখনও ফেরেনি।

তপনের দিকে আর পিছন ফিরে না দেখে সোমা সোজা ওপরে উঠে গেল।

অনুমান ঠিক।

দরজায় তালা।

সোমার কাছে বাড়তি চাবি আছে। ঘর খুলে সোমা ভিতরে ঢুকল। ঝি রান্না সেরে, টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা দিয়ে চলে গেছে।

এখনই খেতে সোমার ইচ্ছা করল না।

একটা বই নিয়ে সে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

যখন তন্দ্রা ভাঙল, বইটা বুকের ওপর। একটি লাইনও পড়া হয় নি।

উঠে বসে সোমা দেয়ালঘড়ির দিকে দেখল।

প্রায় দশটা। আর তিন মিনিট বাকি।

দরজার দিকে সোমা চোখ ফেরাল।

ভিতর থেকে বন্ধ। তার মানে নিরুপম এখনও ফেরে নি।

এত রাত তো কোনদিন করে না।

কলেজে কি মিটিং আছে ?

সিনেমা থিয়েটার যাবার মানুষ নিরুপম নয়।

সোমা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

রাতের কলকাতা। অজস্র মানুষ চলেছে। যানবাহনের বিচিত্র শব্দ।

কলকাতায় যেন কোনদিন রাত হয় না।

তার স্পন্দন চিরন্তন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোমা ক্লান্ত হয়ে বিছানায় ফিরে এল।

গেল কোথায় লোকটা ?

কাল থেকে কথা বন্ধ, কাজেই বলে যাবারও অবকাশ পায় নি।

সোমা খাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

একবার ভাবল, নিরুপমের জন্য অপেক্ষা করবে। সে এলে দুজনে পাশাপাশি বসবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের মধ্যে অভিমানের মেঘ জমে উঠল।

কেন অপেক্ষা করবে ? ওই সন্দেহবাদী মানুষটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। নিরুপম যদি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, তো সোমাও পারবে।

নিরুপমের সঙ্গে আপোষ করা মানে নিজের ব্যক্তিত্বকে বলি দেওয়া। স্বীকার করে নেওয়া, এতদিন সোমা যা করেছে, তা ভুল, তা অন্যায়।

ভ্রূকুটির কশাঘাতে স্ত্রীকে বশ করা যায় না, তাকে কাছে টেনে নিতে হয় অনাবিল প্রেমে।

তাতো নিরুপম পারে নি।

বরং দুজনের মাঝখানে অপ্রীতির প্রাচীর গড়ে তুলেছে। সোমাকে নিজের

সান্নিধ্য থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

ঢাকা খুলে সোমা খেতে শুরু করল।

অবশ্য প্রতিটি গ্রাস মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আশা করছিল, এই বুঝি সিঁড়িতে নিরুপমের পায়ের শব্দ শোনা যায়।

কিন্তু সিঁড়িতে কোন শব্দ নয়, ঘড়িতে এগারোটা বাজার আওয়াজ হল।

এইবার সোমা সত্যি সত্যিই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

লোকটার কোন বিপদআপদ হয় নি তো ?

এ শহরে প্রতি পথের বাঁকে বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে। বিপর্যয় মানুষের নিত্য সঙ্গী।

নিরুপম যে পরিমাণে আত্মভোলা, দুর্ঘটনা হয়ে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

যদি কিছু একটা হয়, কি করবে সোমা ?

কার সাহায্য ভিক্ষা করবে ?

হাসপাতালে খবর নেবে, না পুলিশ স্টেশনে।

চঞ্চল পায়ে ঘোরাফেরা করতে করতে সোমা একসময় চেয়ারের ওপর বসে পড়ল, তার তখনই চোখে পড়ল।

কি আশ্চর্য, এটা এর আগে চোখে পড়ে নি।

ভাঁজকরা কাগজ। পাতলা একটা বই চাপা দেওয়া।

চিঠিটা খুলে সোমা পড়তে শুরু করল।

চিঠি ঠিক নয়, কারণ তলায় নাম থাকলেও, ওপরে কোন সম্বোধন নেই।

লাইন তিনেক। রূঢ়, কর্কশ ভাষা।

অন্যত্র থাকাই স্থির করলাম। একসময় এসে আমার বইপত্র নিয়ে যা[illegible]। তুমি নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছ, তোমার পথ, আমার পথ এক নয়।—নিরুপম।

এতক্ষণ ঘরে না-ফেরা মানুষটার জন্য যে চিন্তা ছিল, উদ্বেগ ছিল, তার অবসান।

তার পরিবর্তে শরীর জ্বালা করে উঠল।

এত সামান্য একটা কারণে লোকটা সরে গেল।

কি এমন করেছে সোমা! পরপুরুষের সঙ্গে এমন কি বেলেল্লাগিরি, যার জন্য সোমার সঙ্গে এক ঘরে, এক ছাদের নীচে কাটাতেও নিরুপমের আপত্তি।

সোমা শাড়ী বদলে শুয়ে পড়ল।

শোবার আগে লক্ষ্য করল, নিরুপমের সুটকেশটা নেই। তার মানে তার দর-কারি জামাকাপড় নিয়ে সে চলে গেছে।

ঘুম এল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতেই ভাবতে লাগল, মানুষটা যদি আর না ফেরে তাহলে সোমা কি করবে।

এ শহরে গ্র্যাজুয়েট মেয়ের অভাব নেই। সোমার পক্ষে চাকরি পাওয়া মোটেই সহজ হবে না।

একমাত্র উপায় বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়া।

কিন্তু সে ফিরে যাবার মধ্যে কতটা গ্লানি আর অপমান লুকানো আছে, সেটা মনে করেই সোমা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

নিরুপমের বাপ বারানসীতে। জীবনের শেষভাগ সেখানেই কাটাবেন, এই তাঁর সংকল্প।

ছোট একটা ভাই ব্যাঙ্গালোরে কাজ করে। তার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও কম।

কাজেই স্বামীরকুলের কারো কাছে আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই।

তাছাড়া, যেখানে স্বামীই মুখ ফিরিয়ে আছে, সেখানে অলীক সম্পর্কের জের টেনে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো অর্থহীন।

চিন্তা করতে করতে সোমা কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

সকালে উঠে পরিস্থিতি বুঝতে কিছুটা সময় নিল।

পাশে বালিশ রয়েছে, কিন্তু পাশের মানুষটার শোবার কোন চিহ্ন নেই।

হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সোমা ভাবতে বসল।

কাল রাত্রে রাগ হয়েছিল, আজ কিন্তু অভিমানের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দু চোখ বেয়ে।

লোকটা কি পাষাণ। এভাবে নিজের স্ত্রীকে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ফেলে রেখে কি করে সরে যেতে পারল।

লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড দিতে একটু তার বুক কাঁপল না।

রাত্রের দৃঢ়তা সকালে অনেক নরম হয়ে গেল।

এভাবে ভুল বোঝাবুঝির জের টেনে গেলে ভবিষ্যতে সোমারই ক্ষতি।

ছোট্ট একটা ফাটল কালক্রমে বিরাট খাদে পরিণত হতে পারে।

সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে সোমা বেরিয়ে পড়ল।

কলেজের সামনে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখনও ছাত্রদের ভীড় শুরু হয় নি।

সোমার জানা ছিল, মঙ্গলবার নিরুপমের এগারোটায় ক্লাশ।

সে গেটের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠিক সাড়ে দশটায় নিরুপমকে দেখা গেল।

বই হাতে দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হচ্ছে।

গেটের কাছ বরাবর সোমা এসে ধরল।

এই শোন।

নিরুপম চমকে মুখ তুলল।

এ কি, তুমি?

না এসে আর উপায় কি। তুমি তো বেশ ছেড়ে চলে এলে।

শেষের দিকে সোমার কণ্ঠ অভিমানে গাঢ় হয়ে এল।

নিরুপম কিছুক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে দেখে বলল।

তুমি দুটো ঘণ্টা কোথাও কাটাতে পারবে?

দু ঘণ্টা! দু ঘণ্টা কোথায় কাটাব?

মানে দু ঘন্টা পরে আমার ছুটি, তারপর তোমার সঙ্গে বাড়ী ফিরতাম।

একটু ভেবে নিয়ে নিরুপম আবার বলল।

এক কাজ করতে পার।

কি?

তুমি বাড়ী চলে যাও। আমি ক্লাশ শেষ করে যাচ্ছি।

না, তোমাকে না নিয়ে ফিরব না।

এক রাতেই এত অবিশ্বাস?

নিরুপম হেসে ফেলল।

অবিশ্বাসের কাজ করলে অবিশ্বাস হবে না। বেশ, একটা কাজ করা যাক।

বল।

আমার কিছু মার্কেটিং করার আছে। দু ঘণ্টা অবশ্য লাগবার কথা নয়। কিছু মার্কেটিং সেরে আমি প্যারাডাইস রেস্তরাঁতে অপেক্ষা করব, কেমন?

না, না, তুমি বাড়ীই ফিরে যাও। আমি ক্লাশ শেষ করেই যাব।

নিরুপম কলেজের মধ্যে ঢুকে গেল।

মনে মনে সোমা ভারি খুশী হল।

একটা কঠিন সমস্যার কত সহজে সমাধান হয়ে গেল।

যদি গম্ভীর হয়ে সোমা বাড়ীতে বসে থাকত কিংবা চলে যেত বাপের বাড়ী, তাহলে বিপদ কি পরিমাণ বাড়ত ভাবতেও সোমার ভয় করল।

সোমা বাড়ী ফিরে গেল।

নিরুপম যখন ফিরল, তখন সোমা বিছানায় শুয়েছিল।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল।

নিরুপমের হাতে সুটকেশ।

হেসে বলল, এক রাতের বাসা একেবারে উঠিয়ে দিয়ে এলাম।

এক রাতের জন্য মেসে উঠেছিলে না কি ?

না, বীরুর ওখানে ছিলাম।

বীরুর নাম সোমা অনেকবার শুনেছে। বিয়ের সময়, বৌভাতের দিন সে এসেছিল, কিন্তু সোমার মনে নেই।

তারপর কলেজ থেকেই দু বছরের জন্য বিলাত গিয়েছিল, ফিরেছে দিনপনের।

তারপর আর সোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

সোমা একটু জানত, নিরুপম আর বীরেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রায় অভিন্ন-হৃদয়। নিরুপমের কাছে বীরেন সম্বন্ধে সোমা অনেক কথা শুনেছে।

কি বললে বন্ধুর কাছে, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার আশ্রয়ে এসেছি ?

সুটকেশটা ঠিক জায়গায় রাখতে রাখতে নিরুপম বলল।

মাথা খারাপ, ও কথা কখনও বলা যায়। বললাম, স্ত্রী এখানে নেই। গৃহ অরণ্য, তাই তোমার কাছে এলাম।

আশ্চর্য লাগল। স্বভাবতই নিরুপম একটু গম্ভীর প্রকৃতির। এ ধরনের লঘু কথাবার্তা সচরাচর বলে না। একরাতেই এতটা পরিবর্তন !

আজ সন্ধ্যায় বীরেনকে আসতে বলেছি। এখানে খাবে।

নিরুপমের এই কথায় সোমা বিব্রত হয়ে পড়ল।

সর্বনাশ, সে কথা বলবে তো। বাজার থেকে জিনিসপত্র এনে দাও, রান্নার ব্যবস্থা করি।

নিরুপম মাথা নাড়ল।

উহুঃ, ব্যতিব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। বীরেনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, পাঞ্জাবির দোকান থেকে সন্ধ্যাবেলা মাংস আর রুটি নিয়ে আসব তিনজনের জন্য। মিষ্টিও আনব।

নিরুপম থামল, তারপর কঠিন কণ্ঠে বলল।

তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কতকগুলো কথা আছে।

আবার কি কথা।

আচমকা নিরুপমের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে সোমা একটু বিস্মিত হল।

তোমার সুধাদি মহিলাটি সুবিধার নয়।

কেন ?

পুরোনো প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সোমা ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

একটি মহিলা সম্বন্ধে এভাবে নিশ্চয় আমি অযথা অপবাদ দেব না।

ব্যারিস্টার-স্বামীর সঙ্গে তার ডাইভোর্স হয়েছিল, সেজন্য একথা বলছ ?

না।

তবে ?

যেখানে উনি কাজ করেন, সেখানে আমার এক বন্ধু অডিট করে। মহিলা সম্বন্ধে সব কিছুই সে জানে। চাকরি বড়, মাইনে বেশী, এসব সত্ত্বেও সুধা যে একটি "কল গার্ল" সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। সমাজসেবা একটা প্রতারণা, সাধারণ মানুষকে ভোলাবার উপাদান।

সোমা কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

এই মুহূর্তে তিক্ততার সৃষ্টি করতে তার মন চাইল না।

একটা ব্যাপার স্থির করে ফেলল।

নারী কল্যাণ সমিতিতে আর যাবে না।

সুধাকে স্পষ্ট বলে দেবে, তা সে যাই মনে করুক।

তিনদিন কাটল। সুধা এল না।

সোমা একটু আশ্চর্যই হল।

একদিন নিরুপমকে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল।

তোমার সঙ্গে সুধার দেখা হয়েছে ?

নিরুপম মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছিল। দাগ দিয়ে দিয়ে।

সোমার দিকে ফিরে বলল।

দেখা হয় নি। আমি ফোন করে দিয়েছি।

কি বলেছ ?

বলেছি তুমি আর রিহার্সালে যাবে না। ঠিক বলি নি ?

সুধা ঘাড় কাত করল।

ঠিকই বলেছ। আমিও তাই বলব ভেবেছিলাম।

এ নিয়ে আর কথা হল না।

দুপুরের দিকে সোমা বিছানায় শুয়েছিল, কলিং বেলের আওয়াজ।

এ সময় নিরুপমের ফেরার কথা নয়। টিউশনি, সেরে তার ফিরতে রাত হবে।

তবে ? তবে কে এল এই অসময়ে ?

নামতে নামতে সোমার একবার মনে হল, সুধা আসেনি তো ?

নিরুপমের ফোন পেয়ে আসল কথাটা জানতে এসেছে।

কিন্তু নিরূপায়। কলিং বেল বেজেই চলেছে।

দরজা খুলেই সোমা পিছিয়ে এল।

ঝ্যাকরাশ চুল, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, সুগৌর বর্ণ। দীর্ঘ কান্তিমান চেহারা।

আগে দেখেছে কিনা সোমা ঠিক মনে করতে পারল না।

নিরুপম নেই ?

এমন অন্তরঙ্গ সম্বোধনে সোমা বিব্রত হল। তার স্বামীকে যখন এ ভাবে জানে, তখন লোকটিকে সোমার হয়তো চেনা উচিত।

না, কলেজে।

আজ তাড়াতাড়ি ফেরার কথা, না ?

আজ বরং দেরী হবে।

সোমা হেসে ফেলল।

আমাকে চিনতে পারছেন ?

সোমা মাথা নাড়ল। না।

আমি বীরেন।

ও, আপনি তো আমার বিয়েতে এসেছিলেন।

এসেছিলাম বৈকি। চিনতে পারলেন তো, এবার বাড়ীতে ঢুকতে দিন।

অপ্রস্তুত সোমা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিল।

বীরেন ওপরে উঠে এল।

পিছন পিছন সোমা।

বীরেন নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

সোমা বসল তক্তপোষের ওপর।

সোমাই কথা বলল।

আপনি আর উনি তো এক কলেজে, তাই না।

না, তাহলে আর নিরুপমের গতিবিধির কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব কেন?

আপনি এখন কোথায় ?

আমি এখন সরকারের একটা কাজ করছি। ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে মৌলিক গবেষণা। বিলাতেও তাই করতে গিয়েছিলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কিছু কাগজপত্র বৃটিশ মিউজিয়ামে আছে কিনা।

কথা বলতে বলতে বীরেন হঠাৎ থেমে গেল।

কি হল ?

আপনি কিন্তু এখন আরো সুন্দরী হয়েছেন। বিয়ের সময় যা দেখেছিলাম, তার

চেয়ে অনেক বেশী।

রাগতে গিয়েও সোমা রাগতে পারল না।

একজন অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ তার রূপের প্রশংসা করছে, এটা শুনতেও ভাল লাগল।

আচ্ছা লোক তো আপনি ?

আচমকা এই অভিযোগে সোমা অবাক হয়ে গেল।

কেন, কি করলাম ?

অনায়াসে এককাপ কফি খাওয়াতে পারেন।

খাবেন কফি ? দাঁড়ান এনে দিচ্ছি। একটু বসুন।

সোমা রান্নাঘরে চলে গেল।

স্টোভ জ্বালিয়ে জল বসিয়ে দিতেই পিছনে খুট্ করে শব্দ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, বীরেন ঢুকছে।

একলা একলা ভাল লাগল না, তাই এ ঘরে চলে এলাম। এই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসছি।

বীরেন বলল।

বোঝা গেল, বীরেন যথেষ্ট পরিমাণে সপ্রতিভ। তাছাড়া নিরুপমের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মাত্রা খুব বেশী বলেই সে সোমার কাছে এত সহজ হতে পেরেছে।

তাই সোমাও সহজ হবার চেষ্টা করল।

একলা একলা থাকতে যখন ভাল লাগছে না, তখন সঙ্গিনী আনার ব্যবস্থা করুন।

সঙ্গিনী ?

হ্যাঁ, জীবনসঙ্গিনী। সুন্দরী একটি মেয়ে।

তাহলে কফিটা তাড়াতাড়ি করে দিন, খেয়ে নিয়ে খুঁজতে বের হই।

সোমা হেসে ফেলল।

আপনি খুঁজলে হবে না। আমাদের খুঁজতে হবে। আপনার বন্ধু আর আমি।

তা মন্দ নয়। নিরুপম আমার পছন্দের কথা সবই জানে। এভাবে ভৃত্যের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে আর চলছে না। জানেন, আজ সকালে ঝোল থেকে গুণে গুণে আটটা লঙ্কা তুলেছি। অন্য দেশ হলে কেস হয়ে যেত।

সোমা কফি ঢালতে ব্যস্ত ছিল। কোন উত্তর দিল না।

কফি খাওয়া শেষ হতে দুজনে আবার শোবার ঘরে ফিরে এল।

দুজনে দুটো চেয়ার নিয়ে বসল।

কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়, কথাটা সোমার মনে হতেই বীরেন বলল।

আপনি তো গান গাইতে পারেন, তাই না? নিরুপম যেন বলেছিল।

সোমা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বলল।

দুপুরবেলা গান গাইলে পাড়ার লোক বলবে কি?

বীরেন সজোরে হেসে উঠল। দরজাজানলা কাঁপিয়ে।

আপনি পাড়ার লোককে খুব সমীহ করে চলেন বুঝি? নিন, আস্তে আস্তেই একটা গান শুরু করুন।

সোমা অসূর্যম্পশ্যা নয়। কিছু পুরুষের সঙ্গে সে মিশেছে। কলেজজীবনে, কলেজজীবনের বাইরে।

কিন্তু এ লোকটা যেন স্বতন্ত্র। প্রাণের প্রাচুর্যে ঠাস বোঝাই। মৃদুকণ্ঠে কথা বলতে পারে না। অবারিত-হৃদয়।

এর অনুরোধ অবহেলা করা যায় না।

নিরুপম যখন ফিরল, তখন সোমা বাথরুমে।

বীরেন টেবিল চাপড়ে বেসুরো বেতালা কন্ঠে গান ধরেছে।

নিরুপম অবাক।

কিরে, তোর না সন্ধ্যেবেলা আসবার কথা?

তাই তো ছিল। দুপুরবেলা বসে বসে মৃত কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে আর ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম। তোর বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম। বেশ বৌ হয়েছে তোর। গানের গলাও বেশ।

গান শুনলি নাকি?

হ্যাঁ, সারাদুপুর তো গানই শুনছিলাম।

বাথরুমের দরজা খুলে সোমা বাইরে আসছিল, কথাগুলো কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিরুপম কি বলবে কে জানে।

নিভৃতে স্বল্পপরিচিত এক ভদ্রলোককে গান শোনানো হয়তো পছন্দই করবে না।

নিরুপম বলল।

মন্দ গায় না। আমি তো গানের বিশেষ কিছু বুঝি না।

তুই একটা বেরসিক, বদখত লোক। তোর উচিত ছিল কোন মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপালকে বিয়ে করা।

দুই বন্ধু উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

দু হাতে দু কাপ নিয়ে সোমা যখন ঘরে ঢুকল, দেখল বীরেন বিছানায় চিত

হয়ে শুয়ে আছে। বালিশটা বুকের ওপর।

চেয়ারে নিরুপম। হাতমুখ নেড়ে কি বলছে।

চাপা স্বভাবের নিরুপমকে এত উচ্ছ্বসিত হতে এর আগে আর সোমা দেখে নি।

বৌদি বসুন।

শুয়ে শুয়েই বীরেন বলল।

সোমা কিছু উত্তর দেবার আগেই আবার বলল।

হিসাব করলে নিরুপম হয়তো আমার চেয়ে মাসদুয়েকের ছোটই হবে, তবু আপনাকে বৌদিই বলছি, কারণ ভাসুর হতে আমার ভীষণ আপত্তি।

এবার সোমা বলল।

আপনি উঠুন, নইলে চা খাবেন কি করে ?

বীরেন উঠে পড়ল। বালিশটা একপাশে সরিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল।

দিন।

সোমা কাপটা দিল।

সম্ভবত অনিচ্ছাকৃত, কিংবা ইচ্ছাকৃত হওয়াও বিচিত্র নয়, বীরেনের হাতটা সোমার হাতের ওপর এসে পড়ল। খুবই অল্পক্ষণ।

তাতেই সোমার সারামুখ আরক্ত হয়ে গেল।

সোমা আড়চোখে নিরুপমের দিকে দেখল।

না, নিরুপমের এদিকে দৃষ্টি নেই। একমনে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চলেছে।

সোমা একটা চেয়ার টেনে নিরুপমের কাছাকাছি বসল।

বা ফাইন, তোর বৌ অনেক গুণের রে নিরুপম।

নিরুপম সোমার দিকে ফিরে একবার দেখল, তারপর বলল।

তা সত্যি, কিন্তু কথা শোনে না, এই যা দোষ।

কি কথা তোমার শুনি না ?

সোমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

বীরেন হেসে উঠল।

বা, এতক্ষণ পরে জমেছে। দাম্পত্য কলহ না থাকলে বিবাহিত জীবন বিস্বাদ।

নিরুপম বলল।

বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তুই কি জানিস ?

কেন, বিয়ে করি নি বলে ? আরে ব্রাদার, বোকারা ঠেকে শেখে, আর বুদ্ধিমানরা দেখে শেখে।

নিরুপম সোমার দিকে ফিরল।

ওই যে তোমার নারী কল্যাণ সমিতি। বারণ করি নি যেতে?

বারণ করেছ, যাই নি, কিন্তু কাল থেকে তো আবার যেতে হবে।

স্পষ্ট দেখা গেল নিরুপমের দুটো ভ্রূর মাঝখানে আঁচড় পড়ল। বিরক্তির চিহ্ন।

আবার যেতে হবে?

হ্যাঁ, তোমার এই বন্ধুটির জন্য পাত্রী যোগাড় করতে হবে যে।

এবার নিরুপমের মুখে হাসি ফুটল।

নারী কল্যাণ সমিতির পাত্রীতে বীরেনের দরকার নেই। তার চেয়ে ও সাতজন্ম আইবুড়ো থাকবে।

বীরেন কপট কাতরোক্তি করল।

বাবা, সাতজন্ম। একজন্মেই কাহিল হয়ে পড়েছি।

বীরেনের কথার ধরনে সবাই হেসে উঠল।

এতদিন বাড়ীর মধ্যে চাপা গুমোট একটা ভাব ছিল, অনেকদিন পরে যেন বাতাস বইতে শুরু করল।

একটু পরে নিরুপম উঠে পড়ল।

আমি যাই, খাবারের যোগাড় করি। তোমরা গল্প কর।

বীরেন বিছানা থেকে আগেই উঠে পড়েছিল। এবার দাঁড়িয়ে বলল, আমি একটু বাথরুম থেকে আসি বৌদি। তোয়ালে কই?

আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে সোমা এগিয়ে দিল।

হঠাৎ যেন সোমার চমক হল।

বাইরে রোদ ম্লান হয়ে এসেছে। গাছের ছায়া দীর্ঘতর।

মেয়েটা একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে খেলা করছে।

সোমা ডাকল।

মিমি।

মিমি মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুজনে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

রেক্টরের ঘরের সামনে।

কাচের মধ্যে দিয়ে দেখল। চেয়ার খালি। ঘরের মধ্যে কেউ নেই

বেয়ারা সোমাকে দেখে এগিয়ে এসেছিল।

বলল, সাব, এখনও ফেরেনি মেমসাব।

কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা সোমা দেখল। প্রায় চারটে বাজে।

সায়েব কি আসবেন ?

বেয়ারা মাথা চুলকাল।

বোধহয় না। আপনি বরং কাল দুটায় আসবেন।

মিমির হাত ধরে সোমা নেমে এল।

নামতে নামতেই ভাবল।

বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলে হত, রেক্টরসায়েবের বাড়ীটা কোথায়। বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে নিরুপমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে হত।

চিনতে পারবে না নিরুপম ?

বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রতীক এই মিমি। সোমার দেহে যে আর একজন পুরুষের ছায়াপাত হয়েছিল মিমি তার সজীব সাক্ষ্য।

কিন্তু সোমা তো আর পুরানো সম্বন্ধে ফিরে যেতে আসে নি।

এতদিন পরে, এত বয়সে, তা সম্ভবও নয়।

অবশ্য মিমিকে নিয়ে নিরুপমের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া আর পথও নেই। এই ছোট পাহাড়ে শহরে স্কুল এই একটাই। মিশনারি স্কুল।

আর একটা স্কুল আছে পাহাড়ী ছেলেদের জন্য।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিল।

এন. বাগচী। রেক্টর। সেন্ট ফেলোমেনা স্কুল।

কিন্তু এন. বাগচী যে নিরুপম বাগচী একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

অথচ মিমিকে ভর্তি করাতে হবে।

জীবনের অবশিষ্ট দিন সোমার হয়তো এখানেই কাটবে। কাজেই মিমিকে এখানকার স্কুলে দিতেই হবে।

ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে সোমা ফিরে চলল।

জীবন তাকে কিছুই দেয় নি। জীবনের কাছ থেকে তার অনেক প্রত্যাশা ছিল। দু হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছিল নেবার জন্য।

কিন্তু কতটুকু সে পেয়েছে। কয়েক বিন্দুর বেশী নয়।

তার জন্য সব দোষটুকু কি তার !

সে সন্ধ্যাটা খুব ভালই কেটেছিল।

একটা টেবিল ঘিরে তিনজন। সোমা আর নিরুপম কথা বলার বিশেষ অবকাশই পায় নি। সব কথা বলেছে বীরেন।

বিলাতের সমাজজীবনের কথা, সেখানকার নারীদের ফ্যাশন-প্রিয়তার অবিশ্বাস্য সব কাহিনী।

কেবল কথার ফাঁকে একবার সোমা প্রশ্ন করেছিল।

সেখান থেকেই একটি ঘরণী বেছে আনতে পারতেন।

প্রশ্ন করেই সোমা লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, বীরেনের উত্তর শুনে।

মাথা খারাপ বৌদি। প্রেম কখনো বিদেশী ভাষায় জমে? আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের কামনা, এসব কথাগুলো বাংলায় না বলতে পারলে সুখ আছে।

বীরেন যখন উঠেছিল, তখন রাত প্রায় এগারোটা।

রাত্রেই সোমা আর নিরুপমের মধ্যে কথা হ'ল।

নিরুপম বলল। সোমা শুনল।

বীরেনের মনটা একেবারে শিশুর মতন। অত বড় স্কলার, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অযথা প্রকাশ নেই।

সোমা কোন উত্তর দিল না। মনে মনে সায় দিল।

বীরেন আবার যেদিন এল, দিনদশেক পরে, সেদিনও নিরুপম ছিল না।

নিরুপম আগেই বলেছিল ফিরতে দেরী হবে। ছাত্রের বাড়ীতে খাওশাদাওয়া আছে।

সোমা গা ধুয়ে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন সারছিল, দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়তে ফিরে দাঁড়াল।

আজ নীচেই ছিল, তাই কলিং বেলের প্রয়োজন হয় নি।

অসময়ে এসে পড়লাম।

বীরেন চৌকাঠের ওপারে সরে দাঁড়াল।

সোমা অসম্বৃত শাড়ী ঠিক করে নিল। তারপর বলল, আসুন, আসুন।

বীরেন ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল।

আজও নিরুপম নেই তো?

সোমা ঘাড় নাড়ল। না।

পাড়ার লোকে কি মনে করবে কে জানে।

কি মনে করবে?

এই আমি যেন ঠিক তাল বুঝে নিরুপম না থাকলেই আসি।

সোমা মাথা নিচু করে রইল। অনেকক্ষণ মাথা তুলতে পারল না।

একটা কাজ করতে হবে বৌদি।

কি?

শাড়ী বেছে দিতে হবে।

শাড়ী ?

সোমা অবাক।

কি, চোখ বড় বড় করে ফেলছেন যে ? শাড়ী কেনা বুঝি অপরাধ, বিশেষ করে অবিবাহিতের পক্ষে ?

না, তা কেন হবে। তবে বান্ধবীকে একবার দেখতে পারলে শাড়ী কেনার সুবিধা হত।

আবার সেই ছাদ কাঁপিয়ে উচ্চহাস্য।

বান্ধবী নয়, বান্ধবী নয়। সে ভাগ্য কি আর করেছি। বন্ধুর ভাবী স্ত্রী। সামনের মঙ্গলবার বিয়ে। শাড়ী একটা দেওয়া দরকার, কিন্তু ও রসে বঞ্চিত কবি গোবিন্দ দাশ। চলুন, আমার সঙ্গে একবার নিউ মার্কেট যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্তের সামান্য দ্বিধা, কিন্তু সেই দ্বিধা সোমা কাটিয়ে উঠল।

নিরুপম সবই বলেছে। বীরেন সম্বন্ধে তার মত জানা হয়ে গেছে সোমার। এমন লোক নাকি দুর্লভ।

কাজেই তার সঙ্গে বের হলে নিরুপম কিছু মনে করবে না।

একটু দাঁড়ান ঠাকুরপো, আমি তৈরি হয়ে নিই।

এই প্রথম সোমা বীরেনকে ঠাকুরপো বলে সম্বোধন করল।

ইচ্ছা করেই। সম্পর্কটা পরিচ্ছন্ন করার জন্য।

আধঘণ্টার মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকদিন পর সোমা বাইরে বের হ'ল।

বীরেনের পাশাপাশি চলতে তার ভালই লাগল।

চৌরাস্তায় গিয়ে বীরেন একটা ট্যাক্সি নিল।

সোমা আপত্তি করেছিল।

ট্যাক্সি কি হবে ? এখন তো এদিকের বাস ফাঁকা।

তা কখনও হয়। দুনিয়ার লোক আপনাকে দেখতে দেখতে যাবে তা আমি সহ্য করব কি করে।

সোমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এমন একটা লোকের সঙ্গে কোন কথা না বলাই সমীচীন। লোকটার মুখে কিছু আটকায় না।

নিরুপম বলবে সরল, কিন্তু এই কি সরলতা !

শাড়ীর দোকানে অনেকক্ষণ কাটল।

সোমা ভেবেছিল বন্ধুর বিয়েতে বীরেন মাঝামাঝি ধরনের শাড়ী দেবে। সচরাচর লোকে যা করে, কিন্তু বীরেন দোকানীকে অপেক্ষাকৃত দামী শাড়ীই দেখাতে বলল।

শাড়ী বাছাবাছি শেষ করে বগলে প্যাকেট নিয়ে বীরেন বের হ'ল। পিছনে সোমা।

বাইরে যেতে গিয়েই সোমা বাধা পেল।

ওদিকে নয়, এদিকে আসুন।

আর কিছু কেনবার আছে নাকি?

বা, এত মেহনত করে শাড়ী পছন্দ করে দিলেন, কিছু জলযোগ করবেন না?

সোমা প্রতিবাদ করতে সাহস করল না। বীরেনকে বিশ্বাস নেই।

রেস্তরাঁর মধ্যে ঢুকতে গিয়েই সোমা থেমে গেল।

সুধা একটা কেবিন থেকে বের হচ্ছে। পাশে একটি অবাঙ্গালী ভদ্রলোক।

দুজনের হাতে হাতে সংবদ্ধ।

পলকের জন্য সুধা একটু চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিল।

সোমা ফিরে ফিরে দু'একবার দেখল।

বীরেন লক্ষ্য করল।

কি, আপনার চেনা কেউ নাকি?

হুঁ।

স্বামীস্ত্রী বলে কিন্তু মনে হ'ল না।

কেন এ কথা বলছেন?

স্বামীস্ত্রীর এত হৃদ্যতা দুর্লভ।

সোমা আর কথা বলল না।

তার নিরুপমের কথা মনে পড়ে গেল।

নিরুপম সুধার সম্বন্ধে এই ধরনের একটা অভিযোগ করেছিল।

অবশ্য অবাঙ্গালী কারো সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু এভাবে হাতে হাত রাখাটাই বিসদৃশ।

সোমাদের ট্যাক্সি যখন বাড়ীর দরজায় এসে থামল, ঠিক সেই সময়ে নিরুপমও এসে পৌঁছল।

ট্যাক্সি থেকেই বীরেন চেঁচাল।

এই নিরুপম, তোর বৌকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলাম। আমি এই ট্যাক্সিতেই ফিরছি।

নিরুপম উত্তর দেবার আগেই ট্যাক্সি চলে গেল।

নিরুপম শুধু জিজ্ঞাসা করল।

কোথায় গিয়েছিলে?

বীরেনঠাকুরপোর এক বন্ধুর বিয়ে। শাড়ী পছন্দ করতে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম।

আর কোন কথা নয়।

চাবি দুজনের কাছেই ছিল। নিরুপম দরজা খুলল।

সোমা কথা বলল ঘরের মধ্যে এসে।

তোমার না আজ দেরী হবার কথা ছিল?

ছাত্রের বাড়ী খাওয়াদাওয়া ছিল কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল। ছাত্রের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

আরো কয়েকটা কথা হ'ল, কিন্তু সোমার মনে হ'ল নিরুপম যেন বেশ একটু অন্যমনস্ক।

দু'তিনবার প্রশ্ন করলে একবার উত্তর দেয়।

কি তোমার শরীর খারাপ নাকি?

শরীর? না, শরীর খারাপ হবে কেন?

তবে, কথার উত্তর ঠিকমত দিচ্ছ না?

একটু চিন্তার মধ্যে আছি।

কি চিন্তা?

নিরুপম বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

পায়চারি করতে করতে বলল।

বাইরের কলেজে ভাল একটা চাকরি পাবার আশা আছে।

বাইরে কোথায়?

শিলিগুড়িতে।

কলকাতা ছেড়ে শিলিগুড়ি?

আমার কাছে কলকাতা আর শিলিগুড়িতে কোন প্রভেদ নেই।

অবশ্য তা ঠিক। বাইরের জীবনে অনভ্যস্ত এই লোকটার কাছে যে কোন শহরই এক। বেশী সময়টুকু কলেজে কাটিয়ে, বাকি সময় টিউশনিতে কাটাবে, কিংবা বই খুলে বসবে।

অধ্যয়ন সর্বস্ব জীবনে আর কোন কিছুর অবকাশ নেই। স্ত্রী শুধু সংসারের একটা প্রয়োজনীয় বস্তু। তার বেশী নয়।

তার সাধ আহ্লাদের দিকে কখনও ফিরেও দেখে না।

আর্থিক উন্নতির জন্যই কি নিরুপম বাইরে যেতে চাইছে?

তা নয়, মানুষটা ভয় পেয়েছে।

বীরেন তার বিশেষ বন্ধু, অন্তরঙ্গ, সবই ঠিক, তবু বীরেনকে তার সন্দেহ।

বীরেনও যেন সীমা অতিক্রম করছে।

নিরুপমের রোগ সোমার কাছে ধরা পড়েছে।

সোমা নিরুপমের কাছে এগিয়ে গেল। খুব কাছে।

জিজ্ঞাসা করল।

একটা কথা বলব ?

বল।

কলেজ থেকে মাসখানেকের ছুটি নাও।

কেন ?

চল আমরা দুজনে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

সোমার মনে হ'ল ক্ষণেকের জন্য নিরুপমের দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল।

আশায়, আনন্দে।

তারপরই চোখের দ্যুতি নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

হতাশ কণ্ঠে বলল।

এখন বাইরে যাওয়া তো মুস্কিল। সামনে পরীক্ষা। ছাত্রদের অসুবিধা হবে। পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে।

সোমা সরে এল।

এ মানুষটাকে উদ্দীপিত করা সম্ভব নয়। এর জীবিকা জীবনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পরে, যখন সোমার ধারণা হয়েছিল, নিরুপম কোন উত্তর দেবে না তখন নিরুপম বলল।

পুজোর সময় বাইরে যাবার চেষ্টা করব।

বলল বটে, কিন্তু সোমা জানে, নিরুপম কোথাও যাবে না।

এখানে, এ শহরে নিরুপমের পায়েশিকল বাঁধা।কোথাও তার যাবার উপায় নেই।

বীরেন এল দিনচারেক পর।

ছুটির দিন। হাতে কাগজের বাণ্ডিল।

নিরুপম বাড়ীতেই ছিল। খবরের কাগজ পড়ছিল।

সোমা ঘুমাচ্ছিল।

নিরুপম দরজা খুলে দিল।

সোমার শোবার ভঙ্গীটা বিশ্রী, তাই নিরুপম বীরেনকে খাবার ঘরে বসাল।

অনেকদিন থেকে নিরুপম ভেবেছে বাসাটা বদলাবে। আর একটা বসবার

ঘরের তার খুব দরকার।

যদিও তার বন্ধু সংখ্যা নেইই প্রায়, তাও একটা বসবার ঘর অপরিহার্য। কিন্তু অন্য বহু সৎ চিন্তার মতন এ চিন্তা শুধু চিন্তাই থেকে গিয়েছে।

তোর বৌ কই রে?

ঘুমাচ্ছে।

সর্বনাশ। ডাক, ডাক। এত ঘুমালে মোটা হয়ে পড়বে যে। ডাক, কথা আছে।

নিরুপম হয়তো খুব প্রসন্ন হ'ল না।

কি এমন কথা যে সোমাকে ছাড়া বলা চলে না।

নিরুপম সোমাকে ঠেলে ওঠাল।

কি হ'ল?

বীরেন এসেছে।

এখন!

জানলা দিয়ে সোমা দুপুরের রোদের দিকে দেখল। ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখেই লজ্জা পেল।

অসম্বৃত পোশাক। ঘামে সারামুখ জবজব করছে।

সোমা শাড়ী গুছিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

হালকা প্রসাধন সেরে সোমা যখন খাবার ঘরে ঢুকল, দেখল দুই বন্ধু গল্পে মশগুল।

কি খবর? আপনার হাতে অত কাগজের বাণ্ডিল যে? বন্ধুর মতন আপনারও খাতা দেখার বাতিক আছে নাকি?

বীরেন হাসল।

খেপেছেন বৌদি। নিজেদের কাগজ দেখেই কূল পাই না, আবার ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখব। এসব আমার নিজের কাগজ। ছুটির দিন একজায়গায় নিরিবিলি বসে কাজ করি।

একটা চেয়ার টেনে সোমা বসল। নিরুপমের পাশাপাশি।

আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

সোমার দিকে ফিরে বীরেন বলল।

আমাকে?

সোমা যুগপৎ বিস্মিত আর লজ্জিত হ'ল।

মানে আপনাকে একলা নয়, নিরুপমও থাকবে।

সোমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এ লোকটাকে বিশ্বাস করা মুশ্কিল। মুখের কোন আগল নেই। যখন যা খুশী নির্বিবাদে বলে ফেলতে পারে।

শুনুন, সামনের রবিবার গরীবের কুটিরে মাছভাত খাবার নিমন্ত্রণ। বিলাত হলে বলতাম 'পটলাক'।

সোমা বলল।

কিন্তু আপনার তো রন্ধন সমস্যা রয়েইছে। ভৃত্যের কথা যা বলছিলেন।

বীরেন বাধা দিল।

বিরাট আয়োজন তো কিছু নয়। সামান্য ব্যাপার। কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

বীরেন উঠে পড়ল।

যাবার মুখে আবার মনে করিয়ে দিল।

সাতদিন আগে নোটিশ দিয়ে গেলাম, যেন ভুল না হয়।

বীরেন চলে যেতে সোমা জিজ্ঞাসা করল।

কি ব্যাপার বল তো? হঠাৎ নিমন্ত্রণ যে?

নিরুপম বিশেষ আমল দিল না।

বীরেনের কোন ব্যাপার ট্যাপার নেই। ভীষণ খেয়ালী। যখন যা ইচ্ছা হয়, তাই করে।

বীরেনের গৃহস্থালী দেখার খুব কৌতুহল ছিল সোমার। অবশ্য অবিবাহিতের আস্তানা সম্বন্ধে তার মোটামুটি একটা ধারণা ছিল।

কিন্তু বীরেনের বাড়ীতে পা দিয়েই তার ধারণা বদলাল।

মাঝারী সাইজের দুখানা ঘর। ফিটফাট। জানলা দরজায় ভাল পর্দা। কৌচের আবরণের ডিজাইনও মনোরম।

যে কটি আসবাব আছে, সে কটি গৃহস্বামীর রুচি আর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষ্য বহন করে।

বীরেন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, নিরুপমদের দেখে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল।

কৃতাঞ্জলিপুটে বলল।

আসুন, আসুন, আমার কুঁটির আজ পবিত্র হ'ল।

নিরুপম হাসল।

এ সব নাটকীয়তা তো তোর আগে ছিল না। হঠাৎ এ রোগ হ'ল কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বীরেনের উত্তর।

রোগ কেন হয়, রোগীর তা কি জানার কথা।

আহার্যও বেশ পরিচ্ছন্ন।

সব বাড়ীর তৈরী নয়। কিছু বীরেন বড় হোটেল থেকে নিয়ে এসেছে।

খাবার টেবিলেই নিরুপম বলল।

এবার একটা বিয়ে করে ফেল বীরেন।

বীরেন ফিস-ফ্রাই চিবাচ্ছিল, সেটা শেষ করে বলল।

লাঙ্গুলহীন শৃগালের অন্য শৃগালদের লাঙ্গুল কাটতে অনুরোধ করার গল্পটা কোথায় আছেরে, 'কথামালা'য় না?

সোমা বলল।

কেন, আপনি তো আমায় পাত্রী খুঁজতে বলেছেন।

কপট নিশ্বাস ফেলে বীরেন বলল।

সে তো ছ মাস আগের কথা। আপনি আর জোটাতে পারলেন কই।

দাঁড়ান, সবুরে মেওয়া ফলে।

বেশী সবুর করলে আবার মেওয়া পচেও। তাছাড়া আমার তো আর মেওয়াতে দরকার নেই। একটি ডাশা পেয়ারা হলেই আমার যথেষ্ট।

কথাটা শেষ করে বীরেন যেভাবে সোমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তাতে সোমা রীতিমত আরক্ত হয়ে উঠল।

ফেরার পথে সোমা নিরুপমকে জিজ্ঞাসা করল।

কি ব্যাপার বল তো? তোমার বন্ধু এমন ভাল চাকরি করে, থাকেও ভালভাবে, বিয়ে করছে না কেন?

নিরুপম কি ভাবল, তারপর বলল।

আমার মনে হয় চাপ দেবার মতন কেউ নেই বলে বেচারির বিয়ে করা হয়ে উঠছে না।

তুমি চেষ্টা কর না।

আমার কথা কি শুনবে? তাছাড়া ঘটকালি করার ব্যাপারে আমার খুব হাতযশ নেই। পাত্রীর সন্ধানই রাখি না।

এস, আমরা দুজনে মিলে চেষ্টা করি।

বেশ তো।

নিরুপম কথাটা ভুলেই গেল। সোমা ভুলল না।

রবিবারের খবরের কাগজ থেকে উপযুক্ত পাত্রীর সংবাদ কেটে কেটে রাখল। একবার ভাবছিল, পত্রালাপও করবে। কিন্তু বীরেনকে জিজ্ঞাসা না করে, তার মত না

নিয়ে, চিঠি লেখাটা ঠিক হবে না।

বীরেন এল কয়েকদিন পর। নিরুপমের সঙ্গেই এল।

বোধ হয় পথে দেখা হয়েছিল।

সোমা কথাটা পাড়ল।

এই দেখুন, আপনার জন্য গোটাসাতেক পাত্রীর খবর রেখেছি। কোন্‌টা পছন্দ হয় বলুন।

খাতা খুলে সোমা পাত্রীদের বিবরণ দেখাল।

বীরেন কোনই ঔৎসুক্য প্রকাশ করল না।

হেসে বলল, আপনার মতন পাত্রী কেউ আছে নাকি?

আমার মতন? আমার মতন পাত্রী কি হবে?

কেন বিয়ে করব।

ইঙ্গিতটা সোমা গায়ে মাখল না। পাশ কাটিয়ে বলল।

আমি আর কি পাত্রী। এখানে সিভিল্ সার্জনের একমাত্র বিদুষী মেয়ে আছে, ফরেস্ট অফিসারের অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা।

ও সবে আমার দরকার নেই।

তাহলে আর আপনার অদৃষ্টে বিয়ে নেই।

না থাক, তবু ওসব আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে ঘরে আনতে পারব না। ও সব মেয়ের আলোর বিকীরণে সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মুখে কিছু না বললেও কথাটা সোমার ভাল লাগল।

কিন্তু নিজে সে তো এমন বিদুষী নয়, তবু তার সংসার এমন শিথিল, এমন ছন্নছাড়া কেন।

নিরুপমের ভালবাসা তাও যেন মাত্রানুযায়ী। জীবনটাকে নানা ভাগে নিরুপম ভাগ করে ফেলেছে। নটা থেকে দশটা পরীক্ষার খাতা দেখা, দশটা থেকে সাড়ে দশটা আহার, সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা অধ্যয়ন, তারপর মিনিট কুড়ি দাম্পত্য প্রেম।

সেই জন্যই নিরুপমের স্পর্শে প্রাণের উত্তাপ নেই।

কিন্তু বীরেনের কি মতলব?

নিরুপমের তার ওপর অভ্রান্ত বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসের মর্যাদা কি বীরেন রাখবে? পারবে রাখতে?

সোমার মনে হ'ল বীরেন যেন ধাপে ধাপে এগোচ্ছে।

সত্যিই তাই।

সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পথে এক হাঁটু জল। ভিজে কাকের দল কার্নিশের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

কলিং বেলের ঝংকার।

বৃষ্টিতে ভিজে বেলের আওয়াজটাও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

দরজা খুলেই সোমা তিনহাত পিছিয়ে এল।

আগাগোড়া বর্ষাতি ঢাকা বীরেন।

কি ব্যাপার, এমন দিনে?

সরুন, সরুন বৌদি, ভিজে গেলাম।

সোমা সরে দাঁড়াল।

সোমাকে পার হয়ে বীরেন ওপরে উঠে গেল।

দরজা বন্ধ করে সোমা যখন ওপরে উঠল, দেখল বীরেন বর্ষাতি খুলে রেখে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে।

আপনি এলেন কি করে?

মোড় পর্যন্ত ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি গলির মধ্যে ঢুকল না। জল কেটে কেটে আসছি।

কিন্তু এই দুর্যোগে!

কাজ করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম, ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। আপনার কথা মনে পড়ে গেল। সেই যে একটা গান আছে না, বধু এমন বাদরে তুমি কোথা?

সোমা দু চোখে বিদ্যুৎ হানল।

আমি কি আপনার বধু নাকি?

ব্যস, আর কিছু বলার অবসর পেল না।

দুটো বলিষ্ঠ হাত নিবিড় আলিঙ্গনে সোমাকে প্রশস্ত একটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে এল।

তারপর অসম্ভব জ্বালায় দুটো ঠোঁট জ্বলে উঠল।

বর্ষণমুখর আকাশ, বাইরের রূপ, রস, গন্ধ সব মুছে গেল।

সোমার সত্তার স্বাতন্ত্রও হারিয়ে গেল।

সে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল বীরেনের বুকের ওপর।

তারপর হঠাৎ একসময়ে সচেতন হয়ে ধাক্কা দিয়ে বীরেনকে সরিয়ে বলল।

ছি!

বীরেন গেল না। চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল।

সোমা বিছানার ওপর শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, বীরেনের ওপর রাগ করতে পারল না।

তার মনে হ'ল, নতুন একটা আবেশে দেহমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এতদিনের বিবাহিত জীবনের যে মাধুর্য অনাস্বাদিত ছিল, সে মাধুর্য তার দেহের প্রতি কোষে নতুন এক কামনার সঞ্চার করল।

এ তো পাপ! এ তো অন্যায়!

বার বার অস্ফুট কণ্ঠে সোমা উচ্চারণ করল।

এরপর কি করে সে নিরুপমের সামনে দাঁড়াবে।

দু হাতে মুখ ঢেকে সোমা শুয়েছিল, অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে দেখল, চেয়ার খালি। বীরেন নেই।

অগোছাল শাড়ী ঠিক করে নিয়ে সোমা উঠে পড়ল।

নীচের দরজা খোলা।

দরজা বন্ধ করে স্নানের ঘরে ঢুকল।

এখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে হাওয়া। স্নান করার উপযুক্ত আবহাওয়া নয়। তবু সোমা স্নান না করে পারল না।

তার মনে হ'ল দেহ যেন অশুচি হয়ে গেছে।

কিন্তু জলের অবিরল ধারায় কি অশুচিতা মুছে যাবে? শুচিতা ফিরে আসবে?

সোমা তা বলতে পারবে না।

কিছু ক্লেদ তো অপসারিত হবে!

সত্যি স্নান সেরে বেরিয়ে নিজেকে অনেক পরিচ্ছন্ন বোধ হ'ল।

পাটভাঙা শাড়ী পরল। ফর্সা ব্লাউজ।

দর্পণের সামনে সাজতে বসল।

অন্যদিন চুলের ফাঁকে খুব সরু সিঁদুরের রেখা থাকে। আজ সোমা চিরুনীর পিঠ দিয়ে খুব মোটা করে সিঁদুরের দাগ দিল।

এয়োতির লক্ষণ।

কিন্তু সিঁদুরের রেখা কি সতীত্বেরও প্রতীক?

সোমা কি করতে পারে? কোন নরপশু যদি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে তাকে নষ্ট করে?

নষ্ট করা ছাড়া আর কি!

যা একান্তে স্বামীর প্রাপ্য তা হরণ করার কোন অধিকার অন্য লোকের নেই। যত সামান্যই হোক।

কিন্তু ভয় সোমার অন্য কারণে।

যতটা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত, সোমা কিছুতেই ততটা ক্রুদ্ধ হতে পারছে না। মনের সঙ্গোপনে ভাললাগা ভাবটুকু কিছুতেই তাকে বীরেনের ওপর বিরূপ হতে দিচ্ছে না।

সোমার মনে হচ্ছে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ বুঝি এই স্পর্শটুকুর অপেক্ষায় ছিল।

নিরূপম এল।

এসেই বলল।

তোমার শরীর কি খারাপ?

চেয়ারটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে সোমা বসেছিল। জনতা আর যানবাহন দেখে একটু অন্যমনস্ক হবার প্রয়াস। কিন্তু সব প্রয়াস বৃথা। বার বার একটি বলিষ্ঠ পুরুষের স্পর্শের স্বাদ অনুভব করছিল। সে স্বাদ যেন রক্তকণিকায় গিয়ে মিশেছে।

নিরূপম আসতে সোমা চেয়ার ঘুরিয়ে বসেছিল।

সচরাচর নিরূপমের দৃষ্টি বিশেষ তীক্ষ্ণ নয়। সোমার শরীর এর আগেও খারাপ হয়েছে, নিরূপমের নজর পড়ে নি।

তার মানে আজ সোমার শরীর নিশ্চয় খুব খারাপ। এত খারাপ যে নিরূপমের মত লোকেরও ঠিক চোখে পড়েছে।

সোমা অস্বীকার করল না।

হ্যাঁ, আজ দুপুর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

কি কষ্ট হচ্ছে?

কোমরে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

নিরূপম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

তারপর বলল।

তোমার চোখ দুটো খুব ছলছল করছে, জ্বরটর হয় নি তো?

নিরূপম কাছে এসে সোমার কপালে, গালে হাত রাখল।

না, গা তো বেশ ঠাণ্ডা।

আর সেই মুহূর্তে সোমার শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল।

দুটি স্পর্শের পার্থক্য বুঝেই বোধহয়, নতুন করে বেদনা অনুভব করল।

টলতে টলতে সোমা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

চেয়ার টেনে নিয়ে নিরূপম বসল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল।

আমি বরং একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

সোমা হাত তুলে বারণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

শরীর খুব অবসন্ন ঠেকছে।

নিরুপম বোধহয় ঝিকে বলে গিয়েছিল।

নিরুপম চলে যেতেই ঝি এসে দাঁড়াল।

গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

হ্যাঁ বৌদি, পেটে ছেলেপুলে আসে নি তো? তাহলে কিন্তু প্রথম প্রথম এই রকম শরীর খারাপ হয়।

যদি সোমার শক্তি থাকত তাহলে সে বোধহয় ঝিকে সজোরে আঘাতই করে বসত।

কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে শুয়ে রইল।

চোখ বন্ধ করে।

নিরুপম পাড়ার ডাক্তার নিয়ে ফিরল।

প্রৌঢ় ডাক্তার।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল। অন্তরঙ্গ অনেকগুলো প্রশ্নও করল।

তারপর নিরুপমের দিকে ফিরে বলল।

মানসিক আঘাত পাবার মতন কিছু ঘটেছে?

নিরুপম বিস্মিত হ'ল। মৃদুকণ্ঠে বলল।

না, মানসিক আঘাত পাবার মতন কিছু ঘটেছে বলে তো জানি না।

ডাক্তার হাসল।

স্ত্রীলোকের মনের খবরের সন্ধান দেবতারাই জানেন না। আমরা তো তুচ্ছ। াক, আপনি কাউকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, আমি একটা ওষুধ আর কয়েকটা ড়ি দিচ্ছি।

নিরুপম এবার ডাক্তারের সঙ্গে ঝিকে পাঠিয়ে নিজে সোমার কাছে বসল।

তখনও সোমা চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

কিন্তু দেহ তেমন আড়ষ্ট নয়।

নিরুপম একদৃষ্টে সোমার দিকে দেখল।

মানসিক আঘাত! এক দুপুরের মধ্যে কি এমন মানসিক আঘাত আসতে পারে সোমা ভারসাম্য হারাবে।

কেউ কি এসেছিল দুপুরে?

বীরেন ছাড়া আর কে আসতে পারে!

ওষুধ খাবার পর সোমা ঘুমিয়ে পড়ল।

একটানা দশঘণ্টা ঘুমাল।

পরের দিন মুখচোখ ধুয়ে ঝিয়ের তৈরী চা-পান শেষ করে সোমা যখন বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসেছিল, তখন নিরুপম ঘরে ঢুকল।

সকালে সে বাজারে যায়। রান্নাঘরে বাজারের থলি নামিয়ে রেখে সোজা সোমার সামনে এসে দাঁড়াল।

কেমন আছ এখন?

ভাল।

কাল হঠাৎ শরীর খারাপ হল যে?

কি জানি বুঝতে পারছি না।

এরকম তো আগে কোনদিন হয় নি।

সোমা মাথা নাড়ল।

না।

কাল কেউ এসেছিল?

বোঝা গেল নিরুপমের মনে এই প্রশ্নটাই অবিরত খোঁচা দিচ্ছিল।

সোমা নিজেকে সামলে নিল।

কিছুটা অবাক কণ্ঠে বলল।

কে আবার আসবে?

না, ডাক্তার মানসিক আঘাত পাবার কথা বললেন কি না, তাই বলছি দুপুরে কেউ হয়তো এসেছিল, যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে!

খুব সাবধানে চোখের কোণ দিয়ে সোমা নিরুপমকে জরিপ করল। কি জানে নিরুপম? কতটুকু?

এভাবে সে কেন কথা বলছে?

সোমা জিজ্ঞাসা করল।

কে এমন আসবে, যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার উত্তেজিত হব সম্ভাবনা?

কি করে জানব। তোমার বান্ধবী সুধা দেবীও হতে পারেন।

একটা ভয় তার কালো ডানা মেলে এতক্ষণে সোমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে ভয় ক্রমে ক্রমে সরে গেল।

না, সুধা আর আসবে না। তুমি বারণ করে দিয়েছ, সে আসবে কেন?

নিরুপম এ নিয়ে আর কিছু বলল না।

অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল।

এখন তো ভালই আছ। আমি তাহলে কলেজে যাবার আয়োজন করি।

কপট শঙ্কায় সোমা দুটি ভ্রূ ওপরে তুলল।

ওমা, কলেজ কামাই করবে কি? তাহ'লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না? আমি মরে গেলেও তোমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিরুপম উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ?

একবার কলেজে টেলিফোন করে আসি। যাব না সেটা জানান দরকার।

নিরুপম বেরিয়ে গেল।

সোমা মনে মনে ঠিক করল।

এবার বীরেন এলে সে সাবধান হয়ে যাবে। যদি সে বাড়াবাড়ি করে তাহলে স্পষ্ট বলে দেবে, সব কিছু সে নিরুপমের গোচরে আনবে।

একটু পরেই নিরুপম ফিরে এল।

হাতে খবরের কাগজ।

হ্যাঁগো, তুমি যে শিলিগুড়ি যাবার কথা বলছিলে?

সোমার প্রশ্নে নিরুপম বিস্মিত হ'ল।

কি ব্যাপার, কলকাতা তোমার ভাল লাগছে না?

কলকাতা কখনো পুরানো হয়? নতুন জায়গা দেখতে ইচ্ছা করছে।

নিরুপম খবরের কাগজ খুলতে খুলতে বলল।

এখনও ঠিক হয় নি। মাইনেটা আমার খুব পছন্দ নয়।

কি হবে বেশী মাইনে? আমরা তো দুজনমাত্র লোক।

এ্যামবিশন না থাকলে মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। একজন হই, দুজন হই, বেশী মাইনে পাওয়া, উঁচুপদে বসার মর্যাদা স্বতন্ত্র, বুঝলে।

নিরুপম বাড়ীতে থাকল বটে, কিন্তু নিজের কাজে ব্যস্ত রইল।

একটা মোটা বই খুলে আর একটা খাতায় কি টুকতে লাগল।

আমি একটা কথা ভাবছি।

সোমা বলল।

নিরুপম মুখ না তুলেই বলল।

কি?

আমি যদি তোমার পরীক্ষার খাতা হতাম বেশ হত।

কেন?

তুমি সব সময় সামনে নিয়ে বসে থাকতে।

এবার নিরূপম মুখ তুলল।

সোজাসুজি সোমার দিকে চোখ ফেরাল না। দর্পণের মধ্যে তার প্রতিবিম্বের দিকে বলল।

পরীক্ষার খাতা হওয়া খুব সুখের নয়। কলমের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হ'ত।

সোমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

ক্ষতবিক্ষত করার কি আর বাকি রেখেছ?

ক্ষতবিক্ষত?

সোমার কন্ঠস্বরের কারুণ্যে নিরূপম বিস্মিত হ'ল।

তাছাড়া আর কি। আমার দিকে কখনো ফিরে দেখেছ?

সোমা একটু থামল, আবার বলল।

ক্ষতবিক্ষত কি আর লোক শুধু কলম দিয়েই করে? তুমি আমাকে কি সুখ দিয়েছ? কোনদিন বেরিয়েছ সঙ্গে নিয়ে? সিনেমায়, থিয়েটার কোথাও নিয়ে গেছ?

নিরূপম কোন কথা বলল না। দাঁত দিয়ে কলম কামড়াতে লাগল।

বজ্রপাত হ'ল দিনপাঁচেক পরে।

সোমা একটা সেলাই নিয়ে বসেছিল, নিরূপম ঘরে ঢুকল।

হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর সশব্দে রাখল।

মুখ আরক্ত।

মনে হ'ল রীতিমত রেগে আছে।

সোমা কিছু বলল না।

নিরূপম চেয়ার টেনে নিয়ে সোমার মুখোমুখি বসল।

তোমার সঙ্গে কথা আছে।

নিরূপমের এমন কণ্ঠস্বর সোমা এর আগে শোনেনি।

সোমার অন্তর একটু কেঁপে উঠল।

বোনাটা কোলের ওপর রেখে সোমা চুপ করে বসল।

ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছে তাতো একবারও বলনি?

কোন্ ব্যাপার?

তোমার সঙ্গে বীরেনের প্রেমের ব্যাপার।

সোমা চকিতে একবার সেদিনের কথা ভেবে নিল।

সোমা আর বীরেন ছাড়া আর কেউ তো ঘরে ছিল না।

এ দৃশ্য কোন পঞ্চম চক্ষু দেখেছে, তা অসম্ভব।

অথচ লোকটা এভাবে কথা বলছে কেন?

অবশ্য লোকটার কথাই এই ধরনের।

আর একবার তপনের ব্যাপারে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেছিল।

চেঁচামেচি করে, অস্থির কাণ্ড।

কিন্তু এবার বীরেন তো নিরুপমের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এমন তো নয় যে তাকে সোমা আহরণ করে এনেছে।

কি যা তা বকছ? এসব কথা বলতে তোমার একটু লজ্জাও হয় না।

সোমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

নিরুপম কোমরে দুটো হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

লজ্জা আমার হওয়া উচিত, তাই না? দোষ আমার? তবে আসল কথাটা শুনবে?

সোমা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বীরেন আজ আমার কলেজে গিয়েছিল। আমাকে বলেছে, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। সে চায় আমি যেন তোমাকে মুক্তি দিই।

সোমা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল।

ছি, ছি, ছি!

কিগো, একেবারে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলে যে? এখন কি উত্তর দেবে দাও।

সোমার উত্তর দেবার মতন কিছু নেই।

বীরেন এভাবে কথাটা নিরুপমকে বলবে, সেটা তার কল্পনারও অতীত।

সোমার সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য সে কি বদ্ধপরিকর!

সোমার সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তার তো ভালই হয়।

ধ্বংসাবশেষ থেকে সোমাকে সে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

আর বাড়ীর মানুষটাও তো আচ্ছা অপদার্থ।

এমন একটা কথা, অন্তরঙ্গ বন্ধু বললেও, নির্বিবাদে শুনে এল! দেহের রক্ত কি এতই হিম, যে এমন কথাতেও সে একটু উত্তেজিত হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সোমা যখন চোখ থেকে আঁচল সরাল, দেখল লোকটা সামনে নেই।

বুঝতে পারল সে বাড়ীতেই নেই। বেরিয়ে গেছে।

সেদিনের মতন সারারাত হয়তো বাইরে থাকবে।

কিন্তু সেদিন বীরেনের আস্তানায় গিয়ে উঠেছিল, আজ অন্য কোথাও উঠতে হবে।

বীরেনকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে সোমার মনে নিরুপমের সম্বন্ধেও দারুণ বিদ্বেষ জমে উঠল।

এই দুর্বল মানুষটা কি করে তাকে আশ্রয় দেবে? কি করে বাঁচাবে বাইরের আঘাত থেকে!

তপন, বীরেন যে কোন পুরুষ সম্বন্ধেই নিরুপমের অহেতুক একটা ভয়।

সংসার ভাঙার ভয়।

কিন্তু সে ভয় তার পৌরুষকে বলিষ্ঠ করে না, পেশীতে শক্তি যোগায় না।

হৃত গরল ভুজঙ্গ শুধু নিজের সর্বাঙ্গে ছোবল দেয়।

শুধু নিজের অঙ্গে নয়, সোমার দেহেও।

রাত দশটা পর্যন্ত সোমা অপেক্ষা করল।

বুঝতে পারল নিরুপম আজ ফিরবে না।

হয়তো আর ফিরবেই না।

ছোট সুটকেশে কিছু শাড়ী আর জামা ভরে নিল। হাতব্যাগে টাকা।

আলমারি খুলে যে কটা নোট পেল তুলে নিল।

অনিশ্চিত যাত্রায় পাথেয় প্রয়োজন।

এ ভাবে এই গ্লানিকর জীবন বহন অসম্ভব।

নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেই, অথচ সামান্য কারণে ফণা তোলার প্রবৃত্তি।

এই ভাবে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সংসার করা সম্ভব নয়।

সুটকেশ হাতে নিয়ে সোমা যখন নীচের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

কোনদিন কি ভাবতে পেরেছিল সোমা যে সাজানো সংসার, কৃতী স্বামী ছেড়ে এভাবে তাকে পথের ধুলোর ওপর এসে দাঁড়াতে হবে।

দরজা খুলে রাস্তায় পা দিয়ে সোমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ী খালি, অথচ দরজা খোলা থাকবে।

কথাটা মনে হবার পরমুহূর্তেই সোমার মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

এ সংসার যখন আর তার সংসার নয়, তখন সে সংসারের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কি আর মাথাব্যথা।

সোমা চলতে শুরু করল।

যখন চৌরাস্তায় এসে বাসস্টপে দাঁড়াল, তখনও সে কোথায় যাবে তার কোনই স্থিরতা নেই।

সামনে যে বাস এল, সোজা তাতেই উঠে পড়ল।

রাত হলেও অনেক ভীড় রয়েছে।

কণ্ডাক্টর সামনে এসে দাঁড়াতে সোমা প্রশ্ন করল।

বাস কোথায় যাবে?

শেয়ালদ হয়ে শ্যামবাজার।

সোমা শেয়ালদর একটা টিকেট কাটল, কিছু না ভেবেই।

শেয়ালদয় নেমে সোমা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একটা ট্রেন অপেক্ষা করছিল।

লোককে জিজ্ঞাসা করে সোমা জানতে পারল ট্রেন বনগাঁ যাবে।

টিকেট কেনা নেই। কেনবার হয়তো সময়ও নেই।

মনে হ'ল, ট্রেন ছাড়বার দেরী নেই।

গার্ডকে বলে সোমা কামরায় উঠে পড়ল।

ট্রেন যখন বনগাঁ পৌঁছল, তখন রাত অনেক।

সোমা ভাড়া মিটিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

দু একটা দোকান ছাড়া স্টেশনের কাছের সব দোকানই বন্ধ।

এত রাতে ঘুরে বেড়ানো নিরাপদ নয়।

সোমা আবার স্টেশনে ফিরে এল।

বিশ্রামাগার খোলা ছিল।

সেখানে একটা ইজিচেয়ারে নিজের দেহ ছেড়ে দিল।

আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে দিয়ে সারাটা রাত কাটল।

ভোরের দিকে বোধহয় একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছিল। হঠাৎ কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল।

একটি বৃদ্ধ, সঙ্গে একটি যুবতী বিধবা, গোটাদুয়েক ভৃত্য। প্ল্যাটফর্ম থেকে মাল নিয়ে এসে ভিতরে রাখছে, তারই শব্দ।

শাড়ী গুছিয়ে নিয়ে সোমা উঠে পড়ল। বাথরুম থেকে মুখচোখ ধুয়ে আবার এসে বসবার চেষ্টা করতেই বাধা পেল।

বিধবা বলল।

ভাই, যদি কিছু মনে না করেন। এই ইজিচেয়ারে বাবাকে বসাতে চাই।

অসুস্থ মানুষ, সোজা হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

বিনা দ্বিধায় সোমা সরে দাঁড়াল।

একজন ভৃত্য বৃদ্ধের হাত ধরে সাবধানে তাকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিল।

সোমা বসল বৃদ্ধের পরিত্যক্ত চেয়ারে।

এবার বিধবা জিজ্ঞাসা করল।

আপনি কোথায় যাবেন ভাই।

এদের দেখেই সোমা আন্দাজ করেছিল তার ওপর কিছু প্রশ্নবাণ বর্ষিত হবে। সে বাথরুমেই মনে মনে তৈরি হয়ে নিয়েছিল।

সখেদে সোমা উত্তর দিল।

তা আমি নিজেই জানি না।

ও মা, সেকি কথা। গিয়েছিলেন কোথায়?

বনগাঁয়ে ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম সে এখানে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সোমার সিঁথির দিকে দেখে বিধবা আবার প্রশ্ন করল।

তাহলে তো স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন।

স্বামী নেই।

নেই?

বিধবার কণ্ঠে কিছুটা অবিশ্বাসের সুর লক্ষ্য করে সোমা বলল।

আজ পাঁচবছর নিরুদ্দেশ।

এবার, এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

তোমার নামটি কি মা?

সোমা বাগচী।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ? আমরাও তাই। আমরা রায়। তা মা এতদিন ছিলে কোথায়?

একটু দম নিয়ে সোমা উত্তর দিল।

একটা ঘরভাড়া নিয়ে আমরা দুজন থাকতাম। আমি আর আমার বান্ধবী। বান্ধবী অফিসে কাজ করত, আমি গানের টিউশনি। হঠাৎ বান্ধবী বদলি হ'ল মাদ্রাজ। ব্যস, সর্বনাশ, আমার যা আয় তাতে একলা ওই ঘর নিয়ে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন হোটেলে জায়গা পেলাম না। ভাবলাম, দাদার কাছে চলে আসি। এখানে এসে দেখলাম দাদা নেই।

বৃদ্ধ ভ্রূ কোঁচকাল।

দাদার সঙ্গে চিঠিপত্রের চল ছিল না?

এবার সোমা হাঁপিয়ে উঠল। এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে কে জানত।

না, বিশেষ ছিল না। আপন ভাই নয়, খুড়তুতো ভাই।

বৃদ্ধ থামল। একটি ভৃত্য তামাক সেজে গড়গড়া এগিয়ে দিল।

বৃদ্ধ বসে বসে ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল।

তাহলে তো তোমার ভারি মুস্কিল, ভাই। আপনজন আর কেউ নেই?

না, সোমা মাথা নাড়ল, ছেলেবেলায় সব শেষ হয়ে গেছে।

এমনই সময় ট্রে করে বেয়ারা চা এনে হাজির করল।

বৃদ্ধকে এককাপ চা করে দিয়ে বিধবাটি সোমাকে এককাপ চা দিল। সঙ্গে পাঁউ-রুটি।

একি আমাকে কেন? সোমা বিব্রত হ'ল, আপনি নেবেন না?

না, আমি চা খাই না। আমার জন্য দুধ আসবে।

এবার সোমা প্রশ্ন করল।

আপনারা কতদূর যাবেন?

আমরা কলকাতা হয়ে রাঁচী যাব। এখানে বাবার কিছু জমিজমা ছিল, তার ব্যবস্থা করতেই এই শরীরে আসতে হ'ল।

কাঁচের গ্লাশে দুধ এল।

দুধ শেষ করে বিধবা বলল।

একটা কথা বলব?

বলুন।

কিছু মনে করবেন না তো?

না, না। মনে করার মতন কথা আপনি বলবেন না, তা জানি।

বিধবা সোমার দিকে নিজের চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল।

আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ। যেখানে আমাদের বাড়ী তার চারদিক ফাঁকা। ধারেকাছে লোকজন নেই।

আমি?

হ্যাঁ, ওখানে বাড়ীতে না হয় একটা গানের স্কুল করবেন। আমি আপনাকে ছাত্রী জুটিয়ে দেব।

সব ব্যাপারটা এত দ্রুত রূপ নিল, ভাবতেও সোমার বিস্ময় লাগল।

নিজের সম্বন্ধে সে যথেষ্ট চিন্তান্বিতই ছিল।

কলকাতায় থাকলে পথেঘাটে হয়তো বীরেন কিংবা নিরুপমের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারত।

একজন লালসাসিক্ত হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করত। অন্যজন উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে যেত।

দুইই তার পক্ষে সমান বেদনাদায়ক।

যদি রাঁচী চলে যেতে পারে, তাহলে এদিক দিয়ে অনেক নিশ্চিন্ত। তারপর জীবনদেবতা তাকে কোন পথে ঠেলে দেবে, মসৃণ অথবা উপল বিষম, তার বিচারের ভার সোমার ওপর নয়।

বিধবা উঠে গিয়ে বৃদ্ধের কানে কানে কি বলছে।

কি বলছে বুঝতে সোমার বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।

বৃদ্ধ সোমার দিকে ফিরে বলল।

মা, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? তাহলে সুলতা বেঁচে যায়। ওর একজন সঙ্গীর খুব দরকার। আর অবসর সময়ে আমাকে গান শোনাবে। পথের পরিচয়, তোমার ওপর আমার কোন জোর নেই মা। ভাল করে ভেবে আমাকে বল।

সোমা মাথা হেঁট করে রইল। এমন পরিবার এ যুগে আছে, সেটা তার ধারণাই ছিল না।

সিনেমার ছবির মত। চোখের সামনে একটার পর একটা ঘটনা প্রতিফলিত হতে লাগল।

অনেক সময় কল্পনার চেয়েও বাস্তব অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়, অনেক মর্মস্পর্শী।

রাঁচী নয়, রামগড়।

বাঙালীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিছু আছে।

আর একজনের কথা সুলতা বলে নি।

সে রাজীব।

এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার। বিলাত থেকে অনেকগুলো ডিগ্রি আহরণ করে এনেছে।

সুদর্শন, তীক্ষ্ণধী। বিবাহ করার নাকি অবকাশও পায় নি।

অবশ্য অবকাশ যে কম সেটা সত্যিকথা।

সকালে বেরিয়ে যায়। বেলা দুটো নাগাদ খেতে আসে। আবার তিনটের সময় দৌড়াতে হয়। ফেরে রাত দশটা সাড়ে দশটা।

মিলিটারি হাসপাতাল। হাসপাতাল ডিউটির পর রাজীব রিসার্চ করে।

ক্যান্সার সম্বন্ধে রিসার্চ।

কর্কট তার যে বিরাট দ্রংষ্টা দিয়ে মানুষকে আঁকড়ে ধরে, সেই দ্রংষ্টার শক্তি খর্ব করার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই রোগ সভ্যজগতের এক বিভীষিকা।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আলাপ হ'ল।

সোমা বিকালে বারান্দায় বসে বৃদ্ধকে আস্তে আস্তে গান শোনাচ্ছিল, সুলতাও ছিল সেখানে, রাজীব এসে দাঁড়াল।

দিদি।

সোমার দিকে চোখ পড়তেই রাজীব থেমে গেল।

সুলতা বলল, কিরে ফিরে এলি ?

একটা বই নিয়ে যেতে ভুলে গেছি।

তুই বস, কোথায় বইটা আছে বল, আমি এনে দিচ্ছি।

আমার সুটকেশের ওপর।

সুলতা বই আনতে ভিতরে চলে গেল।

বৃদ্ধ বলল।

থামলে কেন মা, গাও।

একটু চুপ করে থেকে সোমা নতুন গান ধরল।

সাড়া না পেয়ে গেল ফিরে ফাগুণ দিনে।

রাজীব একটু একটু করে সরে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

গান শেষ হ'ল। ততক্ষণে বই নিয়ে সুলতা ফিরে এসেছে।

সুলতারা ফেরার দিন রাজীব ছিল না। লক্ষ্ণৌ গিয়েছিল একটা মেডিকেল কনফারেন্সে।

তোর সঙ্গে তো আলাপ নেই।

রাজীব মাথা নাড়ল।

এ হচ্ছে সোমা। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বোন।

রাজীব গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

পরিচয়টা স্বচ্ছ হ'ল না।

বেচারীর কেউ কোথাও নেই। আমরা ধরে নিয়ে এসেছি।

সম্ভবত রাজীবের নজর সোমার সিঁদুরের রেখার উপর পড়ে থাকবে। তার দুটি চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল। কিছুটা বুঝি অবিশ্বাসও।

সেটা সুলতা বুঝল।

বুঝেই বলল।

স্বামী নিরুদ্দেশ।

নিরুদ্দেশ ? কারণ ?

রাজীবের কথার সুলতা উত্তর দিতে পারল না, কারণ উত্তরটা সোমার কাছ থেকে সে শোনে নি।

সোমা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল।

বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এসব দিকে খুব ঝোঁক ছিল।

রাজীব আর অপেক্ষা করল না। বই নিয়ে নেমে গেল।

একটু পরেই সোমা বারান্দা থেকে দেখল, একটা হালকা নীল রংয়ের মোটর তীরবেগে বেরিয়ে গেল। চালনচক্র ধরে রয়েছে রাজীব।

এরপর ঘনিষ্ঠ আলাপও হয়েছে।

সুলতা তার বাবাকে নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়ী গিয়েছিল। সোমা যায় নি। বাড়ীতেই ছিল।

বাগান থেকে মালী বিকালবেলা অনেকগুলো ফুল তুলে দিয়েছিল, সোমা সে-গুলো ফুলদানিতে সাজাচ্ছিল, হঠাৎ রাজীব এসে দাঁড়াল।

দিদি নেই?

না, তিনি আপনার বাবাকে নিয়ে মেহেরচাঁদের বাড়ী গিয়েছেন।

একটা চেয়ার টেনে রাজীব বসে পড়ল।

আপনার স্বামীর ভাল করে খোঁজ করা হয়েছে?

আচমকা স্বামীর উল্লেখে সোমা চমকে উঠল। তার হাত থেকে একটা গোলাপ মাটিতে পড়ে গেল।

সোমা তোলবার আগেই নীচু হয়ে রাজীব সেটি তুলে নিল।

যতটা সম্ভব, ততটা খোঁজ করেছি।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

সোমা ঘাড় নাড়ল। অম্লানবদনে বলল।

দুবার।

আপনার কি মনে হয়? কোথায় তিনি থাকতে পারেন?

কি করে বলব। জানলে তো সেখানে নিজেই খোঁজ করতে যেতাম।

তা বটে। তিনি কি করতেন?

কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

আশ্চর্য তো। আমার ধারণা ছিল অধ্যাপকরা ভক্তিমার্গে চট্ করে ধরা দেন না।

যাক চলি। আপনি দিদিকে বলবেন, আমি আজ রাত্রে ফিরব না। একটা জরুরি অপারেশন আছে। শেষ হ'তে খুব রাত হবে। অত রাতে আর ফিরব না।

রাজীব উঠে দাঁড়াল। হাতের গোলাপটা কোটের বাটনহোলে আটকে নিল, তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সোমা এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যি, নিরুপম কি তাকে খোঁজবার কোন চেষ্টা করছে না? এখানে বাসি খবরের কাগজ আসে। বাংলা কাগজ। সঙ্গোপনে সোমা সে কাগজ তন্নতন্ন করে পড়ে। সব বিজ্ঞাপন দেখে। কোথাও লেখা নেই।

সোমা ফিরে এস। অপেক্ষায় রয়েছি।—অনুতপ্ত নিরুপম।

কিছুদিন পর সোমা দুখানা চিঠিও লিখেছে। একটা কলেজে, একটা বাড়ীর ঠিকানায়।

কোন উত্তর নেই। বাড়ীর ঠিকানায় লেখা চিঠিটা ফেরত এসেছে, নিরুপম ও ঠিকানায় নেই।

কলেজে লেখা চিঠিটা নিরুপম নিশ্চয় পেয়েছে, কিন্তু উত্তর দেয় নি।

উত্তর দিতে চায় নি।

সোমার জীবনে তিনজন পুরুষ এসেছে। নিরুপম, বীরেন আর রাজীব।

তিনজনেই অভিশাপ এনেছে তার জীবনে।

নিরুপম স্বামী নয়, যেন স্বামীত্বের ছলনা। সোমাকে আপন করে নেবার শক্তি নেই, স্ত্রীকে রক্ষা করবার জোর নেই কলিজায়, ভালবাসার উত্তাপ নেই।

কেবল সন্দেহ আর সন্দেহ। সন্দেহের আগুনে নিজে পোড়ে, সোমাকেও পোড়ায়।

আর বীরেন।

সোমার জীবনে সে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি ঝড়। তার সাজানো গোছানো সংসার তচনচ করে দিল।

কেবল ভাঙ্গন আর ভাঙ্গন। গড়বার সাহস নেই।

সোমাকে যদি ভালই বেসেছিল, তবে কেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারল না নিজের কাছে।

স্পষ্ট করে সোমাকে না বলে, ইনিয়ে বিনিয়ে নিরুপমকে কেন বলতে গেল।

সব শেষে এল রাজীব।

রাজীব এখনও কিছু বলে নি, কিন্তু সোমা বোঝে, বুঝতে পারে।

রাজীবের দৃষ্টি দেখে বোঝে। মনে ঘোর লাগলে তবে চোখের অমন দৃষ্টি হয়।

কতদিন সোমা সুলতাকে বলেছে।

আচ্ছা, আপনার ভাইয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন দিদি? অত বড় ডাক্তার-

রোজগারপাতিও নিশ্চয় ভাল, দেখতেও চমৎকার।

সুলতা কপাল চাপড়েছে।

আর বল না ভাই। আমরা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি। রাজীব বলে কি জান?

কি?

বলে, বিয়ে করবার মত মেয়ে নাকি তার নজরে পড়ে না।

ঘটকালি করার কথা বলতে গিয়েই সোমা থেমে গেল।

বীরেনের বিয়ের ঘটকালি করার কথা সোমা বলেছিল, তারপর বীরেন তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

আর ঘটকালি করার প্রসঙ্গ তোলা নিরাপদ নয়।

কিন্তু তবুও সোমা নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

বিধি বাদী।

মাঝে মাঝে পেটে সামান্য একটা যন্ত্রণা, সোমা বিশেষ গ্রাহ্য করত না, কিন্তু হঠাৎ, একরাতে অসহ্য যন্ত্রণায় শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

শাড়ীর আঁচলটা দাঁতের মধ্যে চেপেও সোমা যন্ত্রণা চাপতে পারল না।

অব্যক্ত আর্তনাদের টুকরো দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গেল।

পাশাপাশি দুজন শোয়।

সোমা আর সুলতা।

দুটো তক্তপোষের মধ্যে ফাঁক খুবই সামান্য।

ঘুম ভেঙে সুলতা বিছানার ওপর উঠে বসল।

সোমা, ও সোমা, কি হয়েছে?

সোমার উত্তর দেবার শক্তি নেই।

সুলতা উঠে সোমার বিছানায় এল।

দু হাতে নিজের পেট চেপে ধরে সোমা ছটফট করছে।

তার দিকে ঝুঁকে পড়ে সুলতা আবার প্রশ্ন করল।

কি হয়েছে? কি কষ্ট হচ্ছে সোমা?

অনেক কষ্টে সোমা উচ্চারণ করল।

পেটে, পেটে বড্ড যন্ত্রণা।

সুলতা আর দেরী করল না। উঠে বাইরে চলে এল।

কিছুক্ষণ পরে রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে সুলতা যখন আবার এ-ঘরে এসে দাঁড়াল, তখন সোমা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

দুজনে কি কথা বলল, সোমার কানে যায় নি।

তার যখন চেতনা হ'ল, তখন রাজীব তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে।

সোমা বুঝতে পারল, আস্তে আস্তে তাকে নীচে নামিয়ে মোটরের পিছনের সীটে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

সুলতা সামনে রাজীবের পাশে বসল।

যে অন্ধকার ভেদ করে মোটর মসৃণ পথে নক্ষত্রবেগে ছুটল, সে অন্ধকার বুঝি সোমার ভবিষ্যত জীবনের চেয়েও গাঢ়।

অর্ধতন্দ্রার মধ্য দিয়ে সোমা বুঝতে পারল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। নার্সদের হেঁটাফেরা। অত্যুজ্জ্বল আলো। ওষুধের কড়া গন্ধ।

আর কিছু সোমার মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল দেখল চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

পাশে বসে রাজীব।

আমি কোথায় ?

সোমার ক্লান্ত প্রশ্নের উত্তরে রাজীব বলল।

আপনি রাঁচী হস্‌পিটালে রয়েছেন।

কেন ?

আপনার এ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছিল। অপারেশন করা হয়েছে।

সোমা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

দিদি ছিল কাল রাত্রে। আজ ভোরে গিয়েছে। আবার বিকালে আসবে।

কথা শেষ করে রাজীব সোমার কপালে, গালে হাত রাখল। চুলে হাত বুলিয়ে দিল।

দুটি চোখ বন্ধ করে সোমা স্পর্শ উপভোগ করল।

দিনপনেরো হাসপাতালে থাকার পর যখন সোমা বাড়ি ফিরে এল, তখন সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

কেবিনে সোমাকে রাখা হয়েছিল, সেখানে সময় নেই, অসময় নেই রাজীব এসে দাঁড়াত, পাশে বসত, কেমন আছে দেখবার অছিলায় গায়ে হাত দিত।

ঘরে ফেরার আগের দিন রাজীব সোজাসুজি বলল।

সোমা, একটা কথা আছে।

অন্তরঙ্গ সম্বোধনে সোমা কেঁপে উঠল। নতুন করে বুঝি আবার একটা সর্বনাশের শুরু।

সে কোন কথার উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে রইল।

রাজীব সোমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

একি করছেন আপনি ?

প্রতিবাদ করল বটে কিন্তু সোমা নিজেই বুঝতে পারল প্রতিবাদের ভঙ্গীটা খু জোরালো নয়।

আমি নিরুপমবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

আপনি ?

হ্যাঁ। মধ্যে তোমার অবস্থা একটু খারাপের দিকে গিয়েছিল। আমি আ দিদি দুজনেই বিশ্বাস করি নি তোমার স্বামীর সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা। আমর বুঝতে পেরেছিলাম দুজনের মধ্যে খুব বেশী রকম মনোমালিন্য হয়েছে। দি তোমার খাতা ঘেঁটে নিরুপমবাবুর কলেজের ঠিকানা বের করেছিল।

তারপর ?

তারপর আমি গিয়েছিলাম কলেজে। দেখা করে তোমার অবস্থার কথাও বলে ছিলাম। তোমাকে দেখতে আসার জন্য অনুরোধও করেছিলাম।

তিনি আসতে রাজী হন নি তো ?

রাজীব মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে বলল।

তোমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে একথা তিনি অস্বীকার করলেন তোমাকে বিয়ে করে জীবনে একবার ভুল করেছিলেন,তোমার সঙ্গে আবার যোগাযে রেখে দ্বিতীয়বার আর ভুল করবেন না।

রাজীব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সোমার মুখচোখের চেহারা দেখে থেমে গেল।

ডাক্তার হয়ে সে একি অন্যায় করে চলেছে।

এখনও সোমা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে নি, এই সময় এইধরনের আঘাত তা দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

রাজীব সোমার পাশে বসে একটা হাত তার পিঠের ওপর রাখল।

সান্ত্বনার সুরে বলল।

ছি, এখন এসব ভেবে মন খারাপ কর না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জা তুমি কোন অন্যায় করতে পার না। এতদিন তো তোমায় আমি দেখছি।

রাজীবের সঙ্গে সোমা বাড়ি ফিরে এল।

সোমা আশা করেছিল, এ বিষয়ে সুলতাও হয়তো তাকে কিছু বলবে। না, সুলতা কোন কথা বলল না।

সোমার জীবন এ বাড়িতে ঠিক আগের মতনই চলল।

শুধু রাজীব বদলাল।

সুযোগ পেলেই সে অন্য কথা বলে। অন্য সুরে।

যে কথা তপন, নিরুপম আর বীরেন বলেছে, রাজীবের কথা তার সগোত্র নয়।

তপন সোজাসুজি কিছু বলে নি, তার সুযোগও সে পায় নি। নিরুপম লেছে ক্লান্ত কণ্ঠে কাপুরুষের ভাষায় আর বীরেনের হাবভাবে ছিল দস্যুর াশবিকতা।

কিন্তু রাজীবের ভাষা প্রেমিকের মতন।

হৃদয় দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করার প্রয়াস।

রাজীব নতুন জীবনের লোভ দেখিয়েছে। সোমার মনের সামনে উন্মোচিত রেছে নতুন দিগন্ত।

কিন্তু বাধা। নিরুপমের সঙ্গে বাঁধন এখনও ছেদহীন।

তবে আইনগত এই বাধা সবাবার পক্ষে কোন অসুবিধাই নেই।

সোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। রাজীব সবকিছু করবে।

সোমা নিরুত্তর। বাব বার প্রতারিত হতে সে রাজী নয়।

একদিন সোমার সব বাধা অপসারিত হল।

দুপুরবেলা সোমা একটা বই নিয়ে শুয়েছিল, হঠাৎ তার নামধরে কে নীচ ক ডাকতে লাগল।

সোমা দেবী। সোমা দেবী।

সুলতা ঘুমে অচেতন। সুলতার বাপও তাই।

সোমা নেমে গেল।

পীতবর্ণের গোটাতিনেক কাগজ। কোর্টের ছাপ লাগানো।

সই করে কাগজগুলো নিয়ে সোমা টলতে টলতে ওপরে উঠে এল।

নিরুপম নালিশ রুজু করেছে। সোমা স্বেচ্ছায় স্বামীর আওতা থেকে সবে য় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে, সেই জন্য নিরুপম বিবাহের বন্ধন থেকে ক্ত চায়।

দুপুরবেলা রাজীব যখন খেতে এল, তখনও সোমা বিছানায় চুপচাপ বসে। কোলের ওপর কোর্টের কাগজ।

কি রাজীব কাগজগুলো তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ল।

তারপর সোমার দিকে ফিরে বলল।

নই আমি এই কাগজগুলো নিয়ে যাচ্ছি। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে াব।

সোমা একটি কথাও বলল না। প্রস্তর মূর্তির মতন চুপচাপ বসে রইল।

রাজীব সোমার সঙ্গে দেখা করল তারপরের দিন।

সুলতা ঠাকুরঘরে।

সোমা একলা বারান্দায় বসেছিল। রাজীব একটা চেয়ার টেনে সেখানে বসল সব ঠিক আছে। এ শাপে বর হ'ল সোমা। তোমার কোর্টে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। একতরফা ডিগ্রি হয়ে গেলেই তোমার নিষ্কৃতি।

সোমার ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল। কি বুঝি বলতে চেষ্টা করল।

কিছু বলবে ?

রাজীব ঝুঁকে পড়ল সোমার দিকে।

আমার কি হবে ?

এবার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সোমা উচ্চারণ করল।

কি হবে ? আমি তো রয়েছি। দু বছর তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তারপর তুমি আমার।

দরজার গোড়ায় সুলতাকে দেখা গেল।

ভ্রূকুটি নয় দুটি চোখে ভৎর্সনা।

রাজীব আর সোমার এই অন্তরঙ্গতা সে যেন ভাল চোখে দেখল না।

আমি চলি।

রাজীব দ্রুতপায়ে নেমে গেল।

সুলতা এগিয়ে এসে সোমার কাছে দাঁড়াল।

সোমা।

দিদি ?

তুমি কি এইভাবেই আমাদের উপকারের প্রত্যুত্তর দেবে ?

আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না দিদি।

পারছ না বুঝতে। তোমার সঙ্গে রাজীবের আজকাল কি এত গুজগুজ ফুস ফুস ? তুমি বিবাহিতা। নিজের দোষেই হয়তো স্বামী-পরিত্যক্তা। রাজীবের সর্বনাশ করে তোমার কি লাভ !

ছি, ছি, এসব কি বলছেন আপনি ?

তোমাকে স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি সোমা। তুমি অসহায় বলে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তাই বলে আমাদের সংসারে ছোবল মারবে, পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট করবে তা আমরা সহ্য করব না। তার চেয়ে তুমি বরং কোন আশ্রমে চলে যাও তোমার খরচ না হয় আমরা দেব।

সোমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কোন রকমে উদ্গত অশ্রু রোধ করল।

এখন উপায়। এই বিদেশ বিভুঁয়ে আশ্রয় হারিয়ে কোথায় সে যাবে? কার দরজায়!

নাটকীয়ভাবে রাজীব বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

দিদি!

রাজীবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সুলতা চমকে উঠল।

রাজীব আবার বলল।

তোমার ধারণাই সত্যি। আমি সোমাকে ভালবাসি। তাকেই আমি বিয়ে করব।

রাজীব!

ধমক দেবার চেষ্টা করো না দিদি। ভালমন্দ বোঝার বয়স আমার অনেকদিনই হয়েছে। তবে ভয় নেই, তোমাদের কাছে আমরা থাকব না। তোমাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। চল সোমা।

সোমা কিছু বলবার আগে, ভাববার আগে রাজীব এসে সোমার হাত ধরল।

এ আকর্ষণ প্রতিবোধ করার ক্ষমতা সোমার নেই।

যন্ত্রচালিতের মতন সে রাজীবের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

পেছন থেকে সুলতার চীৎকার কানে এল।

রাজীব। সোমা।

কিন্তু দুজনের কেউ ফিরল না। ফিরে দেখলও না।

তারপর।

সোমা নিজের মাথার চুলে হাত বোলাল।

তার জীবন কেবল কতকগুলো দ্রুত ঘটনার সমষ্টি।

এত দ্রুত যে তাল রাখতে সোমা হাঁপিয়ে উঠল।

রাজীব রামগড়ে থাকে নি। রাঁচীতেও নয়।

পার্বত্য অঞ্চলের এই ছোট শহরে চলে এসেছে।

হাসপাতালের ডিউটি আর নিজের রিসার্চ।

কিন্তু তার মধ্যে সোমাকে ভুলে থাকে নি।

প্রথম দুটি বছর আলাদা ব্যবস্থা।

সোমা আর রাজীব একসঙ্গে বেড়িয়েছে, সিনেমায় গেছে, কিন্তু শয্যা স্বতন্ত্র।

মাস মাস সুলতাদের অর্থও পাঠিয়েছে, কেবল চিঠিপত্র লেখে নি।

সুলতা চিঠি লিখেছে অনুনয় করে। সব কিছু মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

রাজীব ফেরে নি।

বরং সোমা আক্ষেপ করেছে।

তোমাকে তোমার পরিবারবর্গের কাছ থেকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে এলাম রাজীব, এ ক্ষোভ আমার যাবার নয়।

রাজীব হাসল।

সেটা পারলে তো বুঝতাম তোমার শক্তি আছে। তা আর পারলে কই। আমিই তো তোমায় টেনে নিয়ে এলাম।

একটু থেমে রাজীব বলেছিল।

আর ফিরে যাওয়া চলে না সোমা। মুখে ওরা যাই বলুক, আমি জানি অন্তর দিয়ে ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে পারবে না। ওদের সংস্কার বাধা দেবে।

সাহস করে সোমা এ প্রশ্নও করেছে।

আচ্ছা, আমার মতন সাধারণ মেয়ের মধ্যে কি এমন দেখলে তুমি?

রাজীব চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে হেসেছে।

জানি না। এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। কোন পুরুষ কোন নারীর মধ্যে কি দেখে মুগ্ধ হয়, সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা তো ডাক্তার, রোগীর ক্লান্ত, অবসন্ন মুখের চেহারা দেখতেই অভ্যস্ত। তোমার মুখে সেই ক্লান্তির ছাপ দেখেছিলাম। কোথায় একটা গোপন ব্যথা রয়েছে, যার জন্য তুমি স্বাভাবিক হতে পারছ না। সেটা তোমার স্বামীর জন্য ক্ষোভ শুধু নয়, নিজের জীবনের একটা অতৃপ্তি। বঞ্চনার হাহাকার।

ঠিক দু বছর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব এক পুরোহিত ডেকে এনেছিল। পুরোহিত তার রোগী। দেহাত থেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসেছিল, আরোগ্য লাভ করে গাঁয়ে ফিরে যাবে।

এ শহরের লোক নয়, কাজেই জানাজানির আশংকা কম।

ইদানিং সিঁথিতে সোমা ভাল করে সিঁদুর দিত না। অনুষ্ঠান শেষে মোটা করে সিঁদুরের রেখা টেনে দিল। কপালে টিপ পরল।

রাজীব তাকে আদরে আদরে উদ্ব্যস্ত করে তুলল।

পাঁচটা বছর। সে বছরগুলো সোমার জীবনে স্বর্ণচিহ্নিত।

তার অতীত মুছে গেল। সেই সঙ্গে গ্লানি, বেদনা, বঞ্চনার স্মৃতি।

সোমার জানতে ইচ্ছা করে কোন্ লগ্নে তার জন্ম।

ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তে কোন্ গ্রহের দৃষ্টি ছিল তার ওপর।

সুখ বার বার কেন তার কাছে সুখের ছলনা হয়ে দেখা দেয়।

তাকে নিয়ে নিয়তির একি মর্মন্তুদ খেলা।

যতবার সে ঘর বাঁধতে গেছে, ততবার দমকা বাতাসে তার ঘর ধূলিসাৎ হয়েছে।
দিনকয়েক রাজীবের গলাটা ভাঙা ভাঙা। কথা বলতে কণ্ট হয়।

পাহাড়ী ঠাণ্ডাটা হঠাৎ লেগে গিয়েছে।

সোমা বলেছে।

অত রাত করে ফের কেন? আরো তো ঠাণ্ডা লাগে।

ফিরি তো মোটরে। চারদিকের কাঁচ তুলে দিই। ঠাণ্ডা আসবে কোথা দিয়ে।

তোমার রিসার্চ দিনকতক বরং বন্ধ রাখ। হসপিটালের ডিউটির পর এত খাটুনি।

আমার রিসার্চ আমার সাধনা। তা কি বন্ধ রাখা চলে। যদি সাফল্যলাভ করি, পৃথিবীর কত লোকের উপকার হবে বল তো? কত পরিবারে হাসি ফুটবে।

সোমা আর কিছু বলল না।

সে বুঝতে পারল কথা বলতে রাজীবের কণ্ট হচ্ছে।

দিনপনেরোর মধ্যে সব কিছু অন্য রূপ নিল।

রাজীব হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল।

সোমা বাথরুমে ছিল।

ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল।

একি তুমি কখন এলে? শরীর ভাল তো?

সোমা কাছে এসে রাজীবের কপালে হাত রাখল।

রাজীব কথা বলল না। তার দু চোখভরা জল।

সোমা শাড়ী বদলে রাজীবের পাশে বসল। বিছানায়।

কি হয়েছে?

ডাক্তার বলছে গলায় ক্যান্সার। অবশ্য আমার নিজেরও তাই সন্দেহ হয়েছিল।

কি হবে?

সোমা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কি হবে!

রাজীব একটা হাত রাখল সোমার পিঠের ওপর।

প্রথমদিকেই যখন ধরা পড়েছে, তখন সেরে যাবে। আজ থেকেই চিকিৎসা শুরু করেছি।

তিনদিন পর রাজীবকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। চিকিৎসার সুবিধার জন্য।

অন্য ডাক্তাররা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল ক্যান্সার হাসপাতালে,

রাজীব রাজী হয় নি।

না, না, এখানেও তো আমার যন্ত্রপাতি সব রয়েছে। আমি নির্দেশ দেব। এখানেই চিকিৎসা হোক।

তাই হ'ল।

মাসচারেক।

তার মধ্যেই একটা জীবন, একটা প্রতিশ্রুতি নিঃশেষ হয়ে গেল।

সোমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। ছ মাস।

সোমা কাঁদতেও ভুলে গেল। অশ্রু জমে পাথর।

রাজীব এই বাংলোটা কিনেছিল। ব্যাঙ্কে টাকাও ছিল। তাছাড়া, তার যন্ত্রপাতিগুলো হাসপাতাল টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল।

বাঁচবার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু বাঁচবার জন্য কি কেবল অর্থেরই প্রয়োজন।

সুলতা খবর পেয়ে এসেছিল। তার বৃদ্ধ বাপকে সংবাদ জানানো হয় নি।

সোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সোমা রাজী হয় নি।

রাজীব মরে যাবার সময়ে সোমা কাঁদে নি, কাঁদল মিমি হবার সময়ে।

একটানা তিনদিন কাঁদল। চোখের জল শুকাল না।

একসময় নিজের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল। মিমিকে বুকে তুলে নিল। সোমা প্রতিজ্ঞা করল মিমিকে ডাক্তারী পড়াবে।

রাজীব যে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে নি, পারা সম্ভব হয় নি অকাল বিয়োগের জন্য, মিমি সেই কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

হয়তো সোমা দেখে যেতে পারবে না, কিন্তু যদি পরলোক থাকে, আত্মার অস্তিত্ব, তাহলে রাজীব সুখী হবে।

মাঝে মাঝে সোমার মনে হয়েছে।

গল্পে, উপন্যাসে বিষকন্যার কাহিনী পড়েছে।

সোমা কি বিষকন্যা।

যে পুরুষ তার সংস্পর্শে আসে, সেই অসুখী হয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নিরুপম তাকে পেয়ে সুখী হয় না।

কার দোষ, এতদিন পরে দাঁড়িপাল্লায় তার মাপ করতে যাওয়া অর্থহীন।

তবে এটুকু বোঝা যায়, যেমন মেয়ে নিরুপমের কাম্য ছিল, আদর্শ, সোমা তেমন হতে পারে নি।

এ যুগেও নিরুপম হয়তো অবগুণ্ঠনবতী, অসূর্যম্পশ্যা মেয়ে চেয়েছিল। যে

পরপুরুষের ছায়াও মাড়াবে না।

সোমা নিরুপমকে সুখী করতে পারে নি।

বীরেনের সম্বন্ধে সোমার বিশেষ কোন ধারণা নেই।

খুব অল্প আলাপে, অল্প সময়ের মধ্যে বীরেন অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল।

তার এই অন্তরঙ্গতা বা অন্তরঙ্গতার ভাণ, এর উৎস প্রেম না লালসা তা আজও সোমা বুঝতে পারে না।

বীরেনের সঙ্গে জীবন জড়ালে কি হ'ত বলা কঠিন।

তবে একথা ঠিক সোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যে মাশুল বীরেনকে দিতে হয়েছে তা খুব প্রীতিপ্রদ নয়।

এদের সঙ্গে রাজীবের তুলনা হয় না।

ধীর, শান্ত, অপূর্ব সংযমী।

তার প্রেমে কোথাও খাদ নেই।

একই বাড়ীতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়, নিজের সান্নিধ্যে পেয়েও দু বছর রাজীব সোমাকে বিরক্ত করে নি।

এটা ঠিক, রাজীব যদি কামনা করত, তাহলে তার ব্যগ্র আলিঙ্গনে ধরা দিতে সোমা ইতস্তত করত না, কুণ্ঠিত হ'ত না।

এই সংযম সোমার চোখেও রাজীবকে স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষ সম্বন্ধে এতদিন সে যে ধারণা পোষণ করত, তার অবসান হয়েছে।

রাজীবও রইল না।

যে ব্যাধি আমূল উৎপাটনের জন্য সে জীবন উৎসর্গীকৃত করেছিল, সেই ব্যাধিই তাকে গ্রাস করল।

ক্যান্সারের চেয়েও বুঝি সোমা আরো ভয়ঙ্কর।

পাঁচবছর পর্যন্ত সোমা মিমিকে নিজেই পড়াল।

সকাল, বিকাল।

মাঝে মাঝে মিমির অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরও সোমাকে দিতে হ'ত।

এ লোকটা কে মা?

টেবিলের ওপর ফটোস্ট্যাণ্ডে দুজনের ফটো।

সোমা আর রাজীব।

তাদের বিয়ের দিনদুয়েক পরেই ফটোটা তোলা হয়েছিল।

কোন স্টুডিয়োতে গিয়ে নয়। ফটোগ্রাফার বাড়ীতে এসেছিল।

বাগানে পাইনগাছের নীচে দুজনে। পাশাপাশি।

ছবি তোলার চরম মুহূর্তে রাজীব তার হাত দিয়ে সোমার হাতটা আঁকড়ে ধরে ছিল।

আরক্ত হয়ে উঠেছিল সোমার মুখ।

সেই রক্তিম আভা ছবিতে ফোটে নি। ফোটা সম্ভব নয়, কিন্তু সলজ্জ ভাবটুকু ধরা পড়েছে।

বল না, ইনি কে?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে গাঢ়কণ্ঠে সোমা উত্তর দিয়েছিল।

তোর বাবা।

আমার বাবা।

কয়েক মুহূর্ত মিমি ফটোর দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল।

তারপর বলেছিল।

বাবা আমাদের কাছে থাকেন না কেন মা? কখনও তো দেখি নি।

তোমার বাবা অনেকদূরে থাকেন মিমি।

অনেকদূরে? আমায় সেখানে নিয়ে যাবে মা?

সোমা শিউরে উঠেছিল।

এ পৃথিবীতে তার শেষ সম্বল। একটা অন্তরঙ্গ মানুষের অন্তিম স্মৃতি।

না মিমি, ছোটরা ওখানে যায় না।

আমি কাছে যাব না মা। দূর থেকে বাবাকে ডাকব।

তিনি একটা কাজ করছেন। খুব জরুরী কাজ। তাঁকে ডাকলে সে কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

সকলের বাবা তাদের সঙ্গেই থাকে, না মা? আমার বাবা কেমন আলাদা রকমের। কেন মা?

এ প্রশ্নের উত্তর সোমার জানা নেই।

বুকের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঞ্চিত হতে লাগল।

খুব বেশী কিছু তো সোমা চায় নি।

স্বামী, সংসার আর মিমির মতন একটি সন্তান।

এই তিনজনকে ঘিরে আনন্দের বৃত্ত।

বিধাতা এত কৃপণ যে এইটুকু দিতেও তার দ্বিধা।

নির্মম আঘাতে সব কিছু চুরমার হয়ে গেল।

একটা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সংসার থেকে সুখের আলো অপসারিত।

মিমি তখনও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রাজীবের ফটোর দিকে।

একসময়ে এ জায়গায় প্রচুর ইংরাজ থাকত।

আশপাশের চা-বাগানের ম্যানেজার। বড় গোছের একটা সেনা-নিবাসও ছিল।

সেই সময় মিশনারী স্কুল সেণ্ট ফেলোমেনার পত্তন হয়।

আগে ইংরাজ ছেলেমেয়েরাই পড়ত।

দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে ইংরাজরা চলে গেল। সেনা-নিবাসটা আছে বটে, কিন্তু সেখানে লালমুখ আর নেই।

তবে সেণ্ট ফেলোমেনা স্কুল আছে। সরকার নিয়েছেন।

পাদরি ফাদাররা আছে।

সোমার অনেকদিনের সাধ মিমি একটু বড় হলে এই স্কুলে পড়াবে।

আর একটা স্কুল অবশ্য আছে। আদিবাসীদের।

তাই মিমির পাঁচবছর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনটাও সোমার নজরে পড়ল।

স্কুলটা এমন কিছু দূরে নয়।

যে পাহাড়ী মেয়েটা বাড়ীতে কাজ করে, সেই দুবেলা মিমিকে নিয়ে যেতে, নিয়ে আসতে পারবে।

কিন্তু সোমা স্বপ্নেও ভাবে নি মেয়েকে ভর্তি করতে গিয়ে এমন এক বিপদের মুখোমুখি পড়বে।

নিরুপম কলেজের চাকরি ছেড়ে কবে যে শিক্ষা বিভাগের এ চাকরিতে ঢুকেছে, সোমা জানেও না।

অবশ্য তার জানবার কথাও নয়।

কলকাতা হ'লে অসুবিধা ছিল না। ভাল স্কুলের অভাব নেই। এক স্কুল না হয়, অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে।

কিন্তু এখানে এই একটিই অভিজাত স্কুল।

আর কারো সঙ্গে যে মিমিকে ভর্তি হতে পাঠাবে, তাও সম্ভব নয়, কারণ এই মিশনারি স্কুলের কড়া নিয়ম, জীবিত থাকলে মা কিংবা বাবাকে সঙ্গে যেতে হবে। অন্তত প্রথমদিন।

সারাটা রাত সোমা বিছানায় ছটফট করল।

মিমিকে আঁকড়ে কাঁদল কিছুক্ষণ।

কতক্ষণ সোমা দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই, কাশির শব্দে সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল।

নিরুপম মিমির হাতধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি এক কাজ করুন। এই স্লিপটা নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে টাকাটা জমা দিয়ে দিন। আর ইংরেজীর ওপর আর একটু জোর দেবেন। ওকে কে জি

ওয়ানেই ভর্তি করে নিলাম।

এতগুলো কথার কিছুই বুঝি সোমার কানে গেল না।

সে একদৃষ্টে নিরুপমের মুখের দিকে দেখল। পুরোনো স্মৃতির কোন আঁচড় সেখানে ফুটে ওঠে কিনা।

নিরুপম ফুলদানী থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে মিমির দিকে এগিয়ে দিল।

মিমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

তখন নিরুপম এক আশ্চর্য কাণ্ড করল।

টকটকে লাল ফুলটা সোমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল।

ফুলটা আপনিই নিন মিসেস রয়, একসময়ে মেয়েকে দিয়ে দেবেন।

মিসেস রয় বলবার সময় নিরুপমের ভারি গাল দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল, গলার স্বর একটু যেন বেদনার্দ্র।

অবশ্য সবটাই সোমার মনের ধারণা হতে পারে। নিরুপম হয়তো বদলায় নি।

সাবধানে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সোমা ফুলটা হাতে নিল।

আরো অনেক আগে যদি ফুলটা তার হাতে দিত নিরুপম, তাহলে জীবনে এত বিপর্যয় ঘটত না।

এভাবে ঘর বাঁধা ঘর ভাঙার পালা।

অনেকটা দূরে এসে পথের বাঁকে সোমা একবার পিছন ফিরে দেখল।

জানলায় নিরুপম দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে।

মিমি বলল।

ফাদার তোমাকে দেখছেন মা।

ফাদার।

সোমা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ, আণ্টি যে বললেন রেক্টরকে ফাদার বলতে হয়।

সোমা আর দাঁড়াল না। মিমির হাতধরে চলতে শুরু করল।

এখনও কিছুটা পথ বাকি। গোটাকয়েক চড়াই উৎরাই।

এগুলো পার হ'তেই হবে।

পান্থনিবাস

যতটা দেখায় বয়স কিন্তু ততটা নয়। কিশোরীবাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়। আজকাল ওষুধের কল্যাণে পঞ্চাশ একটা বয়সই নয় এই পাড়াতেই বহু সত্তর-বাহাত্তরের বুড়ো সকাল-বিকাল হাফহাতা শার্ট আর হাফপ্যাণ্ট পরে পার্কে পাক দিতে যায়। আসলে মানুষ বুড়ো হয় দেহে নয়, মনে। এই বয়সেই কিশোরী-বাবুর মাথার চুল বেশীর ভাগই পাকা। গাল আর গলার মাংস শিথিল। দু' চোখের কোণে পাখির পায়ের ছাপ। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই একেবারে ভেঙে পড়েছেন। পৃথিবীতে কিছু পুরুষ থাকে, যারা সব ব্যাপারে স্ত্রী-নির্ভর। মাসান্তে রোজগারের টাকাটা স্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ করে। কোন সমস্যা, সংসারের কোন ঝামেলায় নিজেদের জড়াতে চায় না। জড়ানো তো দূরের কথা, সংসারের কোন জটিলতার ব্যাপার শুনতেও রাজী নয়। কিশোরীবাবু ঠিক এই ধরণের পুরুষ। সব ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয়, নির্মোহ। যা কিছু করবে স্ত্রী মনোরমা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

একটা ভরসার কথা, কিশোরীবাবুর একটি মাত্র সন্তান। ছেলে অমিয়। তাকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে তার প্রাইভেট শিক্ষক ঠিক করা পর্যন্ত সবরকম ঝামেলা পোয়ানোর দায়িত্ব মনোরমার। বাড়িতে কিশোরীবাবু থাকেন প্রায় চোখ বুজে। শুধু চোখ নয়, কানও বন্ধ করে। যাতে সংসারের চাকার সামান্যতম শব্দও কানে না যায়।

যদি কোন দিন কোন কথার টুকরো তার কানে কোন রকমে [illegible]য়, তাহলে কিশোরীবাবু এত বিচলিত হয়ে পড়েন, যে তাঁকে সামলাতে মনোরমার প্রাণান্ত। সেইজন্য মনোরমা পারতপক্ষে কোন কথা কিশোরীবাবুর কানে তোলে না।

অফিসেও প্রায় একই ব্যাপার। আই. এ. পড়তে পড়তে কিশোরীবাবু পাড়ার এক মুরুব্বির দয়ায় রেল অফিসে ঢুকেছিলেন। সেই থেকে এক জায়গায় এক টেবিল চেয়ার আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে কিংবা তম্বির তদাবক করে চাকরিতে উন্নতি করে নিয়েছিল, কিন্তু কিশোরীবাবু শিবলিঙ্গের মতন স্থানু, নির্লিপ্ত। চাকরির চাকা মন্দাক্রান্তা ছন্দে এগিয়ে চলল, মামুলি ইনক্রিমেণ্ট সংগ্রহ করতে করতে।

এ বিষয়ে মনোরমা দু-একবার উপদেশ দিতে এসেছে।—হ্যাঁ গো, অফিসে পরীক্ষাগুলো দাও না। এই সামান্য টাকায় কি আর সংসার চালানো যায়?

উত্তরে চশমাটা খুলে কিশোরীবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চেয়ে থেকেছেন। ভাবটা যেন, সামনে দাঁড়ানো নারীটি যেমন অচেনা, তেমনি তার কথাগুলোও অত্যন্ত দুরূহ। মনোরমা নিজেই এক সময়ে সরে গেল।

এ হেন মনোরমা যখন হারিয়ে গেল, তখন স্বভাবতই কিশোরীবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন। শুধু চারপাশে সূচিভেদ্য অন্ধকারই নয়, কিশোরীবাবুর মনে হল, কে যেন তাঁকে আচমকা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিল। কিশোরীবাবুর একবার মনে হল অঙ্গে গেরুয়া জড়িয়ে যেদিকে দু' চোখ যায়, সেদিকে বেরিয়ে পড়বেন। থাক সংসার পিছনে পড়ে। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে বেবিয়ে পড়ারও ঝক্কি অনেক, সে ঝক্কিটুকু সামলানোর মতো দেহের শক্তি বা মনোবল কিছুই কিশোরীবাবুব ছিল না।

ভগবান সহায়। পাঁচদিনের মাথায় সরোজ এসে হাজির হল। সবোজ অর্থাৎ সরোজিনী, তাঁর গ্রাম সুবাদে বোন। বয়সে বছর পাঁচেকের বড়। তের বছরে বিয়ে হয়েছিল। পনেরো বছরে বিধবা হয়ে ভাইদের সংসাবে লাথি ঝাঁটার সঙ্গে সঙ্গে অপমানের অন্ন মুখে তুলছিল। গ্রামেরই একজন, যে কিশোরীবাবুব অফিসে কাজ করত, তার মুখে সংবাদ পেয়ে কাপড়ের পুঁটলি বগলে করে এসে হাজির হল। এর আগে বারদুয়েক এসেছিল। একবার কালীঘাট দর্শন করতে, আর একবার কি একটা যোগে গঙ্গাস্নানে।

সরোজকে পেয়ে কিশোরীবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সবোজও আধ-ঘণ্টাখানেক মনোরমার জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরল। অমিয়র বয়স তখন সাত।

সাত বছরের অমিয়র বয়স আজ ছাব্বিশ। মেধাবী ছেলে। বাইশ বছরে এম. এ. পাশ করে বেসরকারি এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।

একটা সমস্যা অমিয়র বিয়ে। কিশোরীবাবু নিজেও অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন চাকরিতে পাকা হবার সঙ্গে সঙ্গেই। তখন কিশোরীবাবুর মা বেঁচে। তিনিই খুঁজে পেতে মনোরমাকে যোগাড় করে এনেছিলেন। অমিয় যখন হয়, তখন কিশোরীবাবুর বয়স চব্বিশের বেশী নয়।

বিয়ে-থার ব্যাপারে সরোজ বিশেষ সাহায্য করতে পারবে, এমন ভরসা কম। কিশোরীবাবু চিন্তায় পড়লেন। সে চিন্তার অবসান করল অমিয় নিজেই। চব্বিশ বছরের অমিয় তেইশ বছরের মীনাকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল। একেবারে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে। কিশোরীবাবু দ্বিতীয়বারের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মনোরমা যাবার পর থেকেই কিশোরীবাবু একটু জবু-থবু হয়ে গিয়েছিলেন। মনোরমা যেমন ভাবে তাঁর যত্ন নিত, সরোজের পক্ষে ঠিক ততটা নেওয়া সম্ভব হত না। অমিয়র পক্ষে তো নয়ই। অধ্যাপনা ছাড়াও তার টিউশনি ছিল। সকাল ন'টায় বেরিয়ে তার ফিরতে রাত দশটা হয়ে যেত। ছুটির দিন মাঝে মাঝে মুখোমুখি হয়ে গেলে অনুযোগ করত।—বিকালের দিকে একটু পার্কে বেড়ালেও তো পারো। খোলা হাওয়ার উপকারিতা অনেক।

কিশোরীবাবু অসহায় দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে থাকতেন। কোন উত্তর দিতেন না। জীবনধারা একই রইল, শুধু পরিবর্তনের মধ্যে চশমার পাওয়ার বাড়ল আর দেহে বার্ধক্যের খোলস জড়ানো হল।

অমিয়র একটা কথা শুধু কিশোরীবাবু শুনলেন। অমিয় একদিন বলল, ট্রামে-বাসে এই শরীর নিয়ে তোমার নিশ্চয় যাওয়া-আসা করতে অসুবিধা হয়। কি দরকার আর চাকরি করার। পরের দিন অফিসে গিয়েই কিশোরীবাবু দরখাস্ত দিলেন অবসর নেবার। সতীর্থদের কথায় কান দিলেন না। শুধু বললেন, শরীর আর বইছে না ভাই। ছেলেও আর কাজ করতে দিতে চায় না। অতএব অফিস যাবার পরিশ্রমটুকুও ঘুচে গেল।

অমিয় কবিৎকর্মা ছেলে। কিশোরীবাবু এত বছর ধরে চাকরি করে যা পারেননি, সে ক'বছরে তাই করেছে। ভালো ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। মধ্যমগ্রামের কাছে নাকি জমিও কিনেছে।

সরোজও বিচক্ষণ মহিলা। অমিয় মীনাকে নিয়ে আসার মাস দুয়েকের মধ্যে সরোজ চোখ বুজল। ভারি অসুখ বিসুখ কিছু নয়, দু'দিনের সামান্য জ্বর, একটু মাথা ব্যথা। রাত নটার সময় চিৎকার করেই সব শেষ।

ক'দিন একটু অসুবিধা হল। মীনা চাকরি করত। সে আবার অমিয়র আগেই বের হয়ে যেত। ফিরত অবশ্য তার আগে। কিন্তু সে শ্বশুরের জন্য রান্নাবান্না করে যেত। কিশোরীবাবুকে নিজে নিয়ে খেতে হত। এ অসুবিধার সুরাহাও কিশোরীবাবু করে ফেললেন। মীনা নটায় খেতে বসত, সেই সঙ্গে কিশোরী-বাবুও বসতে আরম্ভ করলেন এক টেবিলে।

তারপর সারাটা দিন অখণ্ড অবসর। সময় আর কাটতেই চায় না। কিশোরীবাবু দিবানিদ্রার চেষ্টা করলেন। হল না। ছুটির দিনও দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লেন।

ভাবলেন বই পড়বেন। নিজের ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন বই পেলেন না। একটা গীতা, যেটা কিশোরীবাবু অফিস থেকে অবসর নেবার সময় পেয়েছিলেন,

সেটা ছাড়া আর একটা পাঁজী পেলেন। অনেক বছরের পুরানো। গীতা সংস্কৃতে, সঙ্গে বাংলা ভাষ্য নেই। কোন রকমে পড়লেন, রসগ্রহণ করতে পারলেন না। তাছাড়া ভালোও লাগল না। পাঁজীতে মন দিলেন। বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে মন্দ লাগল না। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে তাও শেষ।

আসল কথা কিশোরীবাবুর পড়ার অভ্যাস নেই। অফিসে ঢোকার পর আর গল্প উপন্যাসের বই পড়েননি। অফিসে একটা লাইব্রেরী ছিল। অনেকেই সেখান থেকে বই নিত। কিশোরীবাবু লাইব্রেরীর ধার মাড়াতেন না। আজগুবি সব কাহিনীতে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে সারাটা দিন কাটানোই দুষ্কর। মীনা আর অমিয় বেরিয়ে গেলে কিশোরীবাবু চেয়ার নিয়ে সামনের জানলার কাছে বসেন। সকালে অতিব্যস্ত মানুষদের চলাফেরা দেখেন। বেশীর ভাগই অফিস যাত্রী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকের সংখ্যা কমে আসে। স্কুল কলেজের কিছু ছেলেমেয়ে যায়। তারপর একেবারে ফাঁকা। কয়েকটা কুকুর, মাঝে মাঝে কিছু রিকশা, তারপর দুপুরের রোদে খালি রাস্তাটা বিশাল।

কিশোরীবাবু সরে আসেন। এপাশে দুটো জানলা আছে, কিন্তু সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই। পাশের বাড়ির ভিতরমহল পর্যন্ত দেখা যায়। কিশোরীবাবু বিছানার ওপর এসে বসেন।

অনেক বন্ধুকে দেখেছেন একলা তাস খেলতে। পেসেন্স খেলা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কিশোরীবাবু জীবনে কোন দিন তাস হাতে করেননি, খেলা তো দূরের কথা। কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর ক্লান্ত হয়ে আবার বসে পড়লেন বিছানায়। এই প্রথম তাঁর মনে হল, হুট করে চাকরিটা না ছাড়লেই হত। তবু কাজের মধ্যে সময়টা কেটে যেত।

দিন পনেরো পর কিশোরীবাবু চুপচাপ চেয়ারের ওপর বসে ছিলেন, অমিয় ঘরে ঢুকে ডাকল।—বাবা।

কিশোরীবাবু চমকে মুখ তুললেন। অমিয় কাছে এসে দাঁড়াল—তোমার শরীরটা যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে।

সেটা কিশোরীবাবুই কি আর লক্ষ্য করেননি। আয়নায় মুখ দেখার সময় চোখ এড়ায়নি। মাথার চুল আরও সাদা হয়েছে। মুখে বাড়তি কয়েকটা রেখা। রীতিমত বৃদ্ধের মুখ।

অমিয় আরও কাছে সরে এলো। বিছানায় বসে বলল, আমি বলি কি কিছু দিন

বাইরে কোথাও ঘুরে এসো না।

বাইরে! ক্লান্ত নিস্তেজ কণ্ঠস্বর কিশোরীবাবুর।

হ্যাঁ, দিনের পর দিন এক জায়গায় একভাবে কাটালে অসুস্থ হয়ে পড়বে যে।

বাইরে কোথায় যাব?

আমার কলেজের এক বন্ধু বলছিল ঘাটশীলার একটা ভালো হোটেল আছে। মানে হোটেল ঠিক নয়, এক মহিলা সব কিছুর দেখাশোনা করেন। একেবারে বাড়িব মতন। ঘাটশীলার জল-হাওয়াও ভালো। দিন পনেরো কি একটা মাস ঘুরে এসো না। ভালো লাগবে।

একলা যাব? তখনও কিশোরীবাবুর গলায় অসহায়তার ছাপ।

এই তো ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। আমি তোমায় ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসব। অমিয় কথাটা বলে একটু চুপ করল। কি ভাবল, তারপর আবার বলল, আচ্ছা দেখি, কমল প্রায়ই ঘাটশীলা যায়। শনিবার গিয়ে সোমবার ফিরে আসে। তার সঙ্গে যেতে পারো।

কমল কে?

কমল বসাক। আমাদের কলেজের ইতিহাসের লেকচারার। তাকে বোধ হয় তুমি দেখেওছ। খুব হৈ হৈ করে। অনেকবার এ বাড়িতে এসেছে। সে-ই বলছিল ঘাটশীলার কথা।

কিশোরীবাবু মনে করার চেষ্টা করলেন। অমিয়র কাছে দু-একজন আসে বটে। তারা অমিয়র ঘরেই বসে। মীনাও সেখানে থাকে। তাদের কারও সঙ্গে অমিয় কিশোরীবাবুর আলাপ করিয়ে দেয়নি। প্রয়োজন হয়নি। তাদের মধ্যেই কেউ কমল বসাক হবে। কিশোরীবাবু স্বীকার করলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

অমিয় বলল, আচ্ছা, আমি কমলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। সে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

অমিয় পরের দিনই কমলকে এনে হাজির করল। ভারি হাসিখুশি ছেলেটি। ছেলে ছাড়া আর কি। এমন আর কি বয়স। বোধ হয় অমিয়র চেয়ে কিছু ছোটই হবে। শ্যামবর্ণ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। অমিয় পরিচয় করে দিতেই, কমল কিশোরীবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, চলুন মেসোমশাই, পান্থনিবাস আপনার ভালোই লাগবে।

পান্থনিবাস?

হ্যাঁ, ঘাটশীলার ওই হোটেলটার নাম পান্থনিবাস। একেবারে সুবর্ণরেখার ওপর। বেশী ভিড় নেই। বেশী লোক থাকার জায়গা নেই। একেবারে বাড়ির

মতন বন্দোবস্ত। আপনি যে হোটেলে আছেন, তা মনেই হবে না। এক ভদ্রমহিলা দেখাশোনা করেন।

হ্যাঁ, অমিয় বলছিল।

অবশ্য এতবার গেছি, ভদ্রমহিলাকে কখনও চোখে দেখিনি। তিনি বাইরে আসেন না। আড়াল থেকে সব ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের মতন মধ্যবিত্তের পক্ষে চমৎকার আস্তানা। তাছাড়া জায়গাটার জল হাওয়াও ভালো। জলে আয়রণের পরিমাণ বেশী। হজমের পক্ষে উপকারী। পুজোর মুখে শীত নেই, কিন্তু শীত শীত ভাবটা আছে। চলুন মেসোমশাই, সামনের শনিবারই চলে যাই।

কমলের উচ্ছ্বাসের স্রোতে কিশোরীবাবু প্রায় ভেসে গেলেন। জড়ত্বের আবরণ যেন খসে গেল। বর্ণনাভঙ্গীর গুণে অদেখা ঘাটশীলা চোখের সামনে রূপে রঙে অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠল। কিশোরীবাবু বললেন, বেশ, তুমি অমিয়র সঙ্গে কথা বলে নাও।

অমিয় পাশেই ছিল। সে বলল, এ আর কথা বলাবলি কি! কমলকে টিকিট কেনার টাকা দিচ্ছি। মীনা এদিকে তোমার বাঁধাছাঁদাগুলো করে রাখবে। পুজো পর্যন্ত যদি চেপে থাকতে পারো, তাহলে আমি আর মীনাও গিয়ে কিছু দিন থেকে আসতে পারি।

বাঁধাছাঁদা আর কি, একটা সুটকেশ। বেডিং লাগবে না। কমল বলে গেছে পান্থনিবাস থেকেই বিছানার বন্দোবস্ত করে দেবে।

কিশোরীবাবু শুধু পোস্ট অফিস থেকে কিছু টাকা তুলে নিলেন। যাবার ভাড়া অমিয়ই দিচ্ছে। কিশোরীবাবুর কোন আপত্তি শোনেনি। কিন্তু থাকার খরচ তিনি ছেলের কাছ থেকে নেবেন কেন? যাবার সময় অমিয় সঙ্গে গেল। মীনা গেল না, কিন্তু উপদেশ দিল—সাবধানে থাকবেন বাবা। ঠাণ্ডা পড়ার আগে গলায় মাফলার জড়িয়ে নেবেন। একটু শরীর খারাপ বোধ হলেই আমাদের চিঠি লিখে দেবেন। নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করব।

ট্রেনে ওঠবার সময় কিশোরীবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, কিন্তু ট্রেন ছাড়বার পর কমল গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায় কিশোরীবাবুকে অন্যমনস্ক করে নিজের কথা ভাববার অবকাশই দিল না।

একটু পরেই রেল ভ্রমণ কিশোরীবাবুর বেশ ভালো লেগে গেল। ছেলেমানুষের মতন কাঁচে চোখ রেখে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। সবুজ মাঠ, পানা ছাওয়া পুকুর, মাটির বাড়ির সার, টেলিগ্রাফের তারে বসা পাখি, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ছবি।

ট্রেনের ঝাঁকানিতে কিশোরীবাবু বোধ হয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, কমলের ডাক শোনা গেল, মেসোমশাই, এবার আমাদের নামতে হবে।

এর মধ্যেই ?

আজকাল তো ঘণ্টা তিনেক লাগে। ঝাড়গ্রাম অনেকক্ষণ পার হয়ে এসেছি।

গুছাবার আর কি আছে। সুটকেশ তো খোলাই হয়নি। কিশোরীবাবু শুধু সোজা হয়ে বসলেন।

বাইরে মাটির রং বদলাচ্ছে। গাছপালা যেন আরও পত্রবহুল। কামরার অনেকেই মালপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। তারাও বোধ হয় নামবে।

গাড়ির গতি মন্দীভূত হতেই কিশোরীবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ট্রেনে নামা ওঠাটাই একটা বিশ্রী ব্যাপার। বিশেষ করে মাঝ স্টেশনে। যেটুকু সময় ট্রেন থামবে, তার মধ্যে নামা যাবে তো। মনের কথাটা কিশোরীবাবু কমলকে বলেই ফেললেন, ঘাটশীলায় ট্রেন কতক্ষণ থামবে ?

কমল কিশোরীবাবুর স্বরে ভয়ের ছোঁয়াটুকু লক্ষ্য করে হেসে বলল, কিছু ভাববেন না মেসোমশাই, আপনি নামবার যথেষ্ট সময় পাবেন।

কিশোরীবাবুর সুটকেশটাও কমল নিজের হাতে তুলে নিল। নামতে কোন অসুবিধাই হল না। কমল আগে নেমে কিশোরীবাবুর হাত ধরে নামিয়ে দিল।

স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশার সার। একটা রিকশায় কিশোরীবাবুকে উঠিয়ে কমল পাশে বসল। কিছু বলতে হল না। রিকশা চলতে শুরু করল।

কিশোরীবাবু বললেন, কোথায় যাবে ওকে কিছু বললে না ?

কমল হাসল।—আমার চেনা রিকশাওয়ালা। কোথায় যাব এটা ওর জানা।

রাস্তায় বেশ ভিড়। আশেপাশের লোকদের দেখে মনে হল বাজার কাছেই। অনেকেরই হাতে থলি। আনাজ-পাতি বোঝাই। ঠিকই তাই। রাস্তার ওপরই বাজার বসেছে।

কি কমলবাবু যে ? সাপ্তাহিক ট্যুরে নাকি ? রাস্তা থেকে একটি প্রৌঢ় প্রশ্ন করলেন।

রিকশা একটু এগিয়ে গেছে। কমল ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিল, হ্যাঁ পণ্ডিত-মশাই। কাল দেখা করব। তারপর কিশোরীবাবুর দিকে ফিরে বলল, এখানকার পাঠশালার সংস্কৃতের মাস্টার।

এখানে পাঠশালা আছে নাকি ?

হ্যাঁ, অপুর পাঠশালা। ফুলডুংরির দিকে। কাল আপনাকে নিয়ে যাব।

কিশোরীবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। অপুর পাঠশালা নামটা খুব চেনা চেনা

লাগছে। কোথায় দেখেছেন নামটা ঠিক মনে করতে পারলেন না। দেখেছেন না পড়েছেন কোন বইয়ে ?

কিছুটা যেতেই মনে পড়ে গেল। কোন বইয়ে পড়েননি, খবরের কাগজে পড়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তিম জীবন ঘাটশীলাতেই কাটিয়েছিলেন। এখানে তাঁর একটা বাড়িও ছিল। বোধ হয় গৌরীকুঞ্জ নাম। কলকাতা থেকে সাহিত্যিকরা এসে অপুর পাঠশালার পত্তন করেছিলেন। কিন্তু অপুটা কে ? বিভূতিভূষণের ছেলের নাম কি? কিশোরীবাবুর জানা নেই।

সাইকেল রিক্শা ডানদিকে ঘুরতেই কিশোরীবাবু অবাক হয়ে গেলেন। আকাশের গায়ে ধূসব মেঘের মতন পাহাড়ের সার। খুব উঁচু নয়, কিন্তু তরঙ্গায়িত। কিশোরীবাবু জীবনে এই প্রথম পাহাড় দেখলেন।

সাইকেল রিক্শা থামতে কিশোরীবাবুর খেয়াল হল। লাল রংয়েব দোতলা বাড়ি। চারধারে বেশ কিছুটা জমি। লম্বা টানা বারান্দা। গেটের ওপব একটা সাইনবোর্ডে লেখা—'পান্থনিবাস'। না হলে এটা যে একটা হোটেল বাইবে থেকে দেখে বোঝা যায় না।

সাইকেল রিক্শা থামতে একটা সিংভূমি ছোকরা ছুটে এলো। মুখে একমুখ হাসি। কমলও তার দিকে চেয়ে হাসল।—কি রে ধনুয়া, ভালো আছিস ?

হ্যাঁ বাবু। ধনুয়ার হাসি আরও বিস্তৃত হল।

কমল আর কিশোরীবাবুর সুটকেশ দুটো ধনুয়া কাঁধে নিল, তারপর ঝোলাটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। পিছন পিছন কিশোরীবাবু আর কমল।

সামনে ছোট একটা ঘর। টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার। এক প্রৌঢ় বসে। কমল ঢুকেই বলল, শরীর ভালো তো জানকীবাবু ?

জানকীবাবু উত্তর দিল, চলে যাচ্ছে আপনাদের আশীর্বাদে। বসুন।

চেয়ার টেনে নিয়ে কমল বসল। তার পাশে কিশোরীবাবু। কমল কিশোরী-বাবুকে দেখিয়ে বলল, মেসোমশাইকে নিয়ে এলাম, কিছু দিন থাকবেন এখানে।

আমাদের ভাগ্য। জানকীবাবু খাতাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

বিরাট খাতা। নাম, ধাম, আসার কারণ, থাকার সম্ভাব্য কাল, নিরামিষাশী কিনা, কোন রকম রোগগ্রস্ত কিনা ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্ন। কমলের নির্দেশে কিশোরীবাবু সব কিছু লিখলেন। সই করলেন। আগাম কিছু টাকা দেওয়ার রেওয়াজ, ব্যাগ খুলে টাকাটা দিলেন। কমলও তাই করল।

জানকীবাবু খাতাটা ভালো করে দেখে নিয়ে ধনুয়াকে বলল, সাত, আট। ধনুয়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। জানকীবাবু কমলের দিকে চোখ ফিরিয়ে

বলল, যান আপনারা। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কমল কিশোরীবাবুকে নিয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির দু'পাশে ফুলের গাছ। গাঁদার সার। এখনও ফুল ফোটেনি। শীতকালে ফুটবে। কিছু বেল আর জুঁই। একটা হলদে জবা। থাম জড়িয়ে বোগেনভিলিয়ার বাহার।

ধনুয়া দুটো ঘরের দরজা খুলে সুটকেশগুলো রেখে দিয়েছে। দুটো এক সাইজের ঘর। একভাবে সাজানো। একটা সিঙ্গল খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল, আলনা, গোল টেবিল, দুটো চেয়ার। দুটো বিরাট জানলা। দুটোই বন্ধ।

কমল জানলা খুলে দিতেই কিশোরী অবাক হয়ে গেলেন। রাস্তায় আসতে আসতে কিশোরীবাবু তরঙ্গায়িত পাহাড়ের যে সার দেখেছিলেন, সেই পাহাড়ের সার জানলার ওপারে। তার সামনে বিকালের ম্লান আলোয় নদীর জল চক চক করে উঠল। কমল আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই সুবর্ণরেখা।

কিশোরীবাবু কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য সম্ভার তাঁর এত কাছে জানলার ওপারে ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। ক্যালেণ্ডারে যে ধরণের ছবি দেখে এসেছেন, সে ধরণের দৃশ্য যে বাস্তবেও আছে এবং তিনি কোন [illegible] চর্মচোখে দেখতে পাবেন, এটা ধারণাই করেননি।

এটা আপনার বাথরুম—বলে কমল এদিকের দরজাটা খুলে দিতে কিশোরীবাবু উঁকি দিলেন। ঝকঝকে বেসিন। শাওয়ার। কমোড। একেবারে আধুনিক ব্যবস্থা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সব ঘরেই কি এ রকম অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ?

কমল মাথা নাড়ল, না, শুধু ওপরতলায় এই বন্দোবস্ত। নীচের তলায় দুটো ঘরের একটা করে বাথরুম।

কিশোরীবাবু কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন।

বাবু আপনাদের চা—ধনুয়া ট্রে-তে চা নিয়ে এসেছে।

কমল দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বলল, মেসোমশাই, মুখ হাত ধুয়ে নিন। আমিও ধুয়ে আসি।

কিশোরীবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন কমল চেয়ারে বসে আছে। টি পটে চা। দুটো প্লেটে দু' স্লাইস পাঁউরুটি। একটা ছোট বাটিতে মাখন। পাশে মরিচদান। কমলই চা ঢেলে দিল। কিশোরীবাবু রুটিতে মাখন মরিচ লাগিয়ে নিলেন। তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে কিশোরীবাবু বললেন, এদের ব্যবস্থাটা ভালো মনে হচ্ছে।

কমল সায় দিল, চমৎকার ব্যবস্থা। সব কিছু পরিস্কার। মধ্যবিত্তের পক্ষে

থাকার আদর্শ জায়গা। তারপর চা খাওয়া শেষ হতে কমল বলল, পোশাক বদলে নিন। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি। এখানে সকাল বিকাল কিন্তু আপনাকে বেড়াতে হবে, তবে খিদে হবে, শরীরে বল পাবেন।

কমল নিজের ঘরে চলে গেল। বোধ হয় পোশাক পাল্টাতে। সুটকেশ খুলে কিশোরীবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। কি পরবেন? ধুতি প্যাণ্ট দুই-ই এনেছেন। অফিস যেতেন শার্ট প্যাণ্ট পরে। অন্য কোন কারণে নয়,কলকাতার উপচে পড়া যান-বাহনে চলাফেরা করার পক্ষে প্যান্ট সুবিধাজনক। অফিস ছাড়ার পর প্যাণ্টগুলো প্রায় উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে। ভেবে চিন্তে প্যাণ্টই পরলেন। প্যাণ্ট আর হাফশার্ট। বাইরে কেতাদুরস্ত পোশাকে চলাফেরা করা উচিত।

বাঃ, এই তো চমৎকার! প্রথম দিনেই মনে হচ্ছে শরীরের একটু উন্নতি হয়েছে। কমলের এই উচ্ছ্বাসে কিশোরীবাবু একটু লজ্জিত হলেন। তবে কি পোশাকটা ছোকরাদের মতন হয়ে গেছে? হাফ শার্টের বদলে ফুল শার্ট পরলেই হত।

এ কি, চায়ের কাপ ডিস নিয়ে যায়নি এখনও। বলতে বলতে কমল সুইচ বোর্ডের ওপর একটা লাল বোতাম টিপল। একটু পরেই ধনুয়া এসে দাঁড়াল। কিশোরীবাবুর দিকে চেয়ে বলল, ডাকলেন বাবু?

কমল চায়ের সরঞ্জামের দিকে দেখাল—ওগুলো নিয়ে যাও।

ধনুয়া ট্রের ওপর সব তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কমলই কিশোরীবাবুর দরজায় তালা বন্ধ করে তালাটা একবার টেনে দেখে, চাবিটা কিশোরীবাবুকে দিয়ে বলল, এটা ভালো করে রাখুন।

কিশোরীবাবু চাবিটা শার্টের ভিতরের পকেটে রেখে দিলেন।

একটু যাবার পরই পীচের রাস্তা শেষ। সবু পায়ে চলা পথের শুরু। দু'পাশে কাশবন, কাঁটা ঝোপ। প্রথম প্রথম চলতে কিশোরীবাবুর একটু কষ্ট হল। হাঁটা চলার বিশেষ অভ্যাস নেই। অনেকবার থামতে লাগলেন।

কমল কাছে এসে দাঁড়াল—কি মেসোমশাই, চলতে কষ্ট হচ্ছে?

না না, শহরে তো চলার বিশেষ সুযোগ নেই। তাই। কিশোরীবাবু চলতে আরম্ভ করলেন।

পথ একেবারে সুবর্ণরেখার কোলে এসে শেষ হয়েছে। ধারে ধারে পাথর। কমল ছোট একটা পাথরের ওপর বসে বলল, আসুন, এখানে একটু বসা যাক।

কিশোরীবাবু ইতস্তত করলেন।—বসব? ইয়ে নেই তো?

কি?

সাপ-টাপ?

না না, এখান দিয়ে অনবরত লোক চলছে। ওই দেখুন না, কাঠুরেরা আসছে।

কিশোরীবাবু দেখলেন। একদল মেয়ে পুরুষ জঙ্গলের দিক থেকে আসছে। মাথায় কাঠের বোঝা। সুবর্ণরেখার ধার দিয়ে সবাই পথের বাঁকে মিশে গেল। কিশোরীবাবু এদের দেখে কতটা আশ্বস্ত হলেন বলা কঠিন, তবে রুমাল পেতে কমলের পাশে বসে পড়লেন।

দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত সূর্যের ঝিলিক। নীচে ঘন অন্ধকার। একরাশ বক আকাশে সাঁতার কেটে চলেছে। কিশোরীবাবু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন।

জানেন মেসোমশাই, ও পাহাড়গুলো অত্যন্ত দামী।

দামী? কমলের কথা কিশোরীবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না।

হ্যাঁ, ওগুলোতে ইউরেনিয়াম ঠাসা। আজকের দুনিয়ায় ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন কতটা জানেনই তো।

না, কিশোরীবাবু জানেন না, জানতেও চান না। দূরের ওই পাহাড়গুলো ইউরেনিয়ামের আকর না হলেও ক্ষতি ছিল না তাঁর। ওগুলো অনাবিল সৌন্দর্যের আকর এটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট।

এই মুহূর্তে ফেলে আসা পুরানো কলকাতাকে তাঁর ভালো লাগল না। গলি ঘুঁজি অধ্যুষিত ক্লেদাক্ত এক নগরী, মানুষকে ধাক্কা না দিয়ে এক পা চলবার উপায় নেই, ধোঁয়া ধুলায় আকীর্ণ, সামান্য সবুজের প্রলেপও কোথাও নেই।

জায়গাটা বেশ ভালো, বুঝলে কমল—কিশোরীবাবু বলেই ফেললেন।

ভালো লাগছে আপনার? এখানকার জলহাওয়া খুব চমৎকার। পনেরো দিনে আপনার চেহারা পাল্টে দেবে। কমল উৎসাহ দিল।

একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভাস। আকাশে তারা ফুটছে। কমল উঠে দাঁড়াল।—চলুন মেসোমশাই, অন্ধকারে আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।

কিশোরীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে পথ দেখার উপায় নেই। কিশোরীবাবু মুশকিলে পড়লেন। আরও আগে উঠে পড়লেই হত।

দাঁড়ান, টর্চটা জ্বালি। কমল টর্চ জ্বালাল। জোরালো আলো। অনেকটা পথ আলোকিত হয়ে উঠল।

কিশোরীবাবু ঠিক করলেন, তাঁকে একটা টর্চ কিনতে হবে। কালই। নইলে কমল চলে গেলে কে তাঁকে পথ দেখাবে।

রাত্রে খাওয়ার সময় কমল কিশোরীবাবুর কামরায় খেতে বসেছিল। পাশাপাশি। কিশোরীবাবু রুটি। কমল ভাত। চিরকালই কিশোরীবাবু রাত্রে রুটি খান।

প্রশ্নটা অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর মনকে আলোড়িত করছিল। এবার বলেই ফেললেন, আচ্ছা কমল, তুমি বলেছিলে এ হোটেলটা একজন মহিলা চালান। কই, এসে অবধি তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

কিশোরীবাবুর মনে হল, তাঁর প্রশ্ন শুনে কমলযেন একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল। বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে কিশোরীবাবুকে জরিপ করল। কিন্তু না, ওটা বোধ হয় কিশোরীবাবুর দেখারই ভুল। এ বয়সে, এত বয়সে কোন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সন্দেহজনক হতে পারে না।

কমল গ্লাস ধুয়ে জল খেল, তারপর বলল, ওঁকে দেখা যায় না। আমি এতদিন ধরে আসছি, আমিই কোন দিন দেখিনি। উনি পর্দার আড়াল থেকে সব কিছু করেন।

কিশোরীবাবু আর কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে খেতে লাগলেন।

কমলের যাবার দিন কিশোরীবাবু বললেন, চল, আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

কমল আপত্তি করল, না না, আপনার যাবার দরকার নেই। আপনি বরং একটু বেড়াতে যান।

ফেরবার সময় হেঁটে আসব, তাহলেই বেড়ানো হবে।

যাবার সময় রিকশা। ট্রেনটা ছাড়ার মুখে কিশোরীবাবু আনমনা হয়ে গেলেন। বেশ একটু অসহায় বোধ করলেন। একবার মনে হল কমলের সঙ্গে চলে গেলেই পারতেন। এই বিদেশ বিভূঁয়ে এ বয়সে একলা থাকা। অসুখ-বিসুখ হলে দেখবার কেউ নেই। শরীর ঠিক করতে এসে উল্টে বে-কায়দায় না পড়ে যান।

কিন্তু এখন এ কথা কমলকে বলাও সম্ভব নয়।

কমল বারবার বলল, প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দেবেন মেসোমশাই, না হলে আমরা ভাববে। শরীর একটু খারাপ বোধ করলেই জানাবেন, আমি এসে নিয়ে যাব।

ট্রেন এখন চলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে কমল দূরে সরে যাচ্ছে। কিশোরীবাবু অদ্ভুত এক কাজ করলেন। এ কাজ তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। একটা হাত তুলে নাড়তে লাগলেন। গোটা ট্রেন দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে কিশোরীবাবুর খেয়াল হল। তিনি হাত নামালেন।

ধীর পায়ে হেঁটে স্টেশনের বেঞ্চে এসে বসলেন তিনি। নতুন করে মনে পড়ল এই মুহূর্ত থেকে ঘাটশীলায় তিনি একা। আত্মীয়-স্বজনহীন। নির্বান্ধব। স্টেশন

জনশূন্য হয়ে গেল। কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন। খুব ম্লান রোদ। তেজ নেই, দাহ তো নয়ই। এ সময়ে হাঁটতে কোন কষ্ট হয় না।

বাইরে আসতেই সাইকেল-রিকশা ছেঁকে ধরল তাঁকে। কিশোরীবাবু তাদের এড়িয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। এটুকু পথ যেতে কোন অসুবিধা হবে না।

কিন্তু অসুবিধা হল। বাজারের কাছ বরাবর আসতেই বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। বাঁদিকে। দম বন্ধ হবার দাখিল। কিশোরীবাবু রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। এ বয়সে :বুকের ব্যথা ভালো লক্ষণ নয়। দাঁড়িয়ে পড়ে সাইকেল-রিকশার সন্ধানে এদিক ওদিক দেখলেন। কোথাও রিকশা দেখতে পেলেন না। বুকে হাত বোলালেন। একটু পরে মনে হল ব্যথা অনেকটা কম। এবার চলতে পারবেন।

কিশোরীবাবু রাস্তার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। হোটেল যতটা কাছে ভেবেছিলেন ততটা কাছে নয়। বাজার ছাড়িয়ে অনেকখানি। ভাবলেন, স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিলেই হত।

কিশোরীবাবু যখন পান্থনিবাসে গিয়ে পেঁছিলেন, তখন রীতিমত পরিশ্রান্ত। বাগানের মধ্যে পাথরের বেদী, তার ওপর বসে পড়লেন। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ায় অল্প শীতের মিশেল।

একটু পরেই শরীর স্বাভাবিক হয়ে এলো। ব্যথাটা একেবারে নেই। উঠতে গিয়েই আবার বসে পড়লেন। ওপর দিকে চোখ পড়েছিল। মনে হল যেন চকিতে জানলার পাশ থেকে একটা মুখ সরে গেল। মহিলার মুখ বলেই মনে হল। বোধ হয় পান্থনিবাসে নতুন কোন লোক এসেছে। মহিলাটি নিছক কৌতূহল বশে উঁকি দিয়ে দেখছিল। চোখাচোখি হতে সরে গেছে।

কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন। দোতলায় উঠে আড়চোখে দেখলেন। কমলের দরজায় তালা দেওয়া। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মনে পড়ল, কলকাতা থেকে এত দূরে, অচেনা এক জায়গায় কিশোরীবাবু একা। নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করলেন। এ বয়সে এ রকম বাহাদুরি দেখাতে যাওয়া অর্থহীন। হঠাৎ শরীর খারাপ হলে কে পরিচর্যা করবে। কমলের সঙ্গে আজ চলে গেলেই হত।

পোশাক খুলে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে কিশোরীবাবু টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। ঘুমপাড়ানী হাওয়া। কিশোরীবাবুর চোখ বুজে এলো।

বাবু, বাবু—। দূরাগত মূর্চ্ছনার মতন অস্পষ্ট কণ্ঠ। কিশোরীবাবু চোখ খুললেন না।

বাবু—। এবার শব্দ আরও কাছে।

কিশোরীবাবু ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। —কে?

আমি বাবু। ধনুয়া।

কি হয়েছে?

হয়নি কিছু। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনি স্নান করতে যান।

কিশোরীবাবু জানলার ধারে রাখা ঘড়িটা দেখলেন। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি ঘুমিয়েছেন। ঘুমিয়ে কিন্তু শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগছে। ধনুয়া বেরিয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। স্নান সেরে পোশাক বদলে খাবার টেবিলে এসে বসতেই দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। কিশোরীবাবু দরজা খুলে দিতে ট্রে হাতে ধনুয়া ঢুকল। ভাত, তরকারি, জলের গ্লাস নিয়ে। টেবিলের উপর সেগুলো সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, কিছু দরকার হলে বেল টিপে ডাকবেন বাবু।

খেতে গিয়েই কিশোরীবাবু চমকে উঠলেন। পাতের একপাশে দুটি পোস্তর বড়া। পোস্তর বড়া কিশোরীবাবুর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। স্ত্রী থাকতে রোজ তাঁকে এই বড়ার জন্য অনুরোধ করতেন। অবশ্য স্ত্রী রোজ পোস্তর বড়া করতেন না। মাঝে মাঝে বাদ দিতেন। যেদিন পোস্তর বড়া থাকত না, সেদিন কিশোরীবাবু খুব বিরস বদনে কোন রকমে খাওয়া সারতেন। মনে হত যেন পেটটা সম্পূর্ণ ভরেনি।

ছেলের সংসারে অবশ্য এ ধরণের আবদার করতেন না। সরোজ থাকতে পোস্তর বড়া মাঝে মাঝে খেয়েছেন। সরোজের পর রান্নার ভার পড়ল মীনার ওপর। মীনা চাকুরে মেয়ে। রান্নাঘরে বাড়তি সময় কাটাবার মতন অবসর তার ছিল না। কোন রকমে ঝোল ডাল আর একটা ভাজা সেরে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। কিশোরীবাবুর কোন আবদার রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিশোরীবাবুও কোন আবদার করেননি।

পোস্তর বড়া দুটো তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে কিশোরীবাবু স্মরণ করার চেষ্টা করলেন, শেষ কবে পোস্তর বড়া খেয়েছেন। মনে করতে পারলেন না। খাওয়া শেষ করে জল খেতে গিয়ে কিশোরীবাবু দ্বিতীয়বার চমকালেন। জলের গ্লাসের পিছনে খুব ছোট একটা রেকাবিতে একটা লেবুর টুকরো। কিশোরীবাবু ভাতের সঙ্গে লেবু মাখেন না। খাওয়ার শেষে জলে লেবু নিংড়ে পান করেন। কবে এক ডাক্তার বলেছিল, সেই থেকে কিশোরীবাবু অভ্যাসটা চালিয়ে আসছেন। কাল কিন্তু লেবুর কোন ব্যবস্থা ছিল না।

আর ডাকলেন না বাবু ? ধনুয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন। —না না, আর কিছু দরকার হবে না। পেট একদম ভরে গেছে।

ধনুয়া থালা বাটি তোলবার সময় কিশোরীবাবু সামান্য দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, আচ্ছা, তোমাদের এখানে রান্না-বান্না কে করে ?

ধনুয়া মুখ তুলে কিশোরীবাবুর দিকে একবার দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, কেন বাবু ?

না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি। সব রান্নাই চমৎকার হয়েছে।

রান্না মা-ই সব করেন। বলে ধনুয়া বের হয়ে গেল।

কিশোরীবাবু একটু আশ্চর্য বোধ করলেন। এত বড় হোটেলের মালিক, এভাবে বোর্ডারদের জন্য নিজে রান্না করে, বিশ্বাস করাই দুরূহ। তারপর আবার ভাবলেন পান্থনিবাস আর এমন কি বড হোটেল! বড় জোর জনা দশ-বারো বাসিন্দা। এদের জন্য রান্না করা আর এমন কি শক্ত কাজ। তাছাড়া নিজে হাতে কি রান্না করে, হয়তো রান্নার তদারকি করে।

দিন তিনেক পরে কমলের চিঠি এলো। পোস্টকার্ডে ছোট চিঠি। কমল প্রথমেই কিশোরীবাবুর শারীরিক অবস্থা জানতে চেয়েছে। শরীরের যত্ন নেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে। লিখেছে এইবার ঘাটশীলায় ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করবে। গরম কাপড়-চোপড় সব সময়ে পরে থাকা উচিত। কিশোরীবাবুর ঠাণ্ডার ধাত। কোন রকম অসুবিধা হলে যেন কিশোরীবাবু পত্রপাঠ কমলকে জানান। তারপর শেষ দু'লাইনে লিখেছে, অমিয়রা এখানে নেই। একটা সেমিনারে যোগ দিতে অমিয় দিল্লী গেছে। মীনাও গেছে তার সঙ্গে। দিন সাতেক পরে ফেরার কথা।

পোস্টকার্ডটা কোলের ওপর রেখে কিশোরীবাবুর এই প্রথম মনে হল, এখানে পৌঁছেই তাঁর উচিত ছিল অমিয়কে কিংবা বৌমাকে একটা চিঠি দেওয়া। কমল সঙ্গে আছে বলে তিনি আর আলাদা ভাবে অমিয়দের চিঠি দেননি। ভেবেছিলেন, যা কিছু খবর দেবার কমলই গিয়ে দেবে।

দুপুরে ঘুমানো অভ্যাস নেই কিন্তু সে দুপুরে কিশোরীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশ নীল নয়, মেঘ ঘোরা-ফেরা করছে। দু-এক পশলা বৃষ্টি হলেই ঠাণ্ডা পড়বে। কতটা ঠাণ্ডা পড়বে কিশোরীবাবুর জানা নেই। সে ঠাণ্ডা তিনি সহ্য করতে পারবেন তো! শীতকাতুরে মানুষ। কলকাতায় তেমন শীত আর পড়ে কোথায়।

কিশোরীবাবু ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। চারদিকে ফ্যাকাসে রোদ। পোশাক পরে নিয়ে কিশোরীবাবু বের হয়ে পড়লেন।

ঘাটশীলার অন্য দিক তাঁর জানা নেই। কমলের সঙ্গে যে পথ ধরে সুবর্ণরেখার ধার পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরলেন। কাল যে কালো পাথরের ওপর বসে-ছিলেন সেদিকে যেতে গিয়েই থেমে গেলেন। একটি দম্পতি বসে আছে। ফিনফিনে পাঞ্জাবী আর ধুতি, হাতে বাহারি লাঠি, সাদা রেশমের মতন একমাথা পাকা চুল একটি বৃদ্ধ, তার পাশে কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী একটি প্রৌঢ়া। লালপাড় দামী শাড়ি। মহিলার চোখে চশমা।

কিশোরীবাবুর পায়ের শব্দে দুজনেই মুখ ফেরালেন। কাঁচা সোনার মতো বর্ণ। বয়স রঙকে একটুও ম্লান করতে পারেনি। কিশোরীবাবুকে ফিরে যেতে দেখে বৃদ্ধ বললেন, আমরা বোধ হয় মশাইয়ের জায়গাটা দখল করেছি, তাই না?

কিশোরীবাবু বিব্রত হলেন। —না না, আমার আর জায়গা কি। আমি ওদিকটায় বরং বসি।

বৃদ্ধ হাসলেন। —আরে আসুন আসুন, এখানে বসুন। ঢের জায়গা আছে।

একটু ইতস্তত করে কিশোরীবাবু বসলেন। দম্পতির কাছ থেকে বেশ একটু ব্যবধান রেখে।

আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে কিশোরীবাবু বললেন, দিন চারেক।

আছেন কোথায়?

পান্থনিবাসে।

পান্থনিবাস? বৃদ্ধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে দেখলেন। মহিলা মৃদু কন্ঠে উত্তর দিলেন, ওই যে আনন্দময়ী দেবী যেটা চালান।

ও—বৃদ্ধ ঘাড় নাড়লেন, হোটেলটার বেশ নাম আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভালো। আপনি একলা এসেছেন?

হ্যাঁ। কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন।

কেন, আপনার স্ত্রী সঙ্গে আসবার বায়না ধরেননি?

তিনি নেই। অনেক বছর হল আমাকে ছেড়ে গেছেন। কিশোরীবাবুর আর্দ্র কণ্ঠস্বরে সবই বোঝা গেল।

মহিলা সমবেদনার স্বরে বললেন, আহা।

কিছুক্ষণের জন্য কেউ কোন কথা বলল না। আবহাওয়া বেশ থমথমে। সে ভাবটা কাটাবার জন্য কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথায় উঠেছেন?

আমার এখানে ছোট একটা বাড়ি আছে। বাড়ির নাম সুবর্ণরেখা। বাজারের উল্টোদিকে।

তারপর আরও পারিবারিক কথা হল। কিশোরীবাবু জানলেন, বৃদ্ধের নাম রসময় হাজরা। এক সময়ে পুলিশ কোর্টের দুঁদে উকিল ছিলেন। ইদানীং অবসর নিয়েছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। অনেক বলা সত্ত্বেও ছেলে ওকালতি লাইনে আসেনি। পেট্রো-কেমিক্যাল নিয়ে পড়াশোনা করেছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই পশ্চিমজার্মানীতে ইঞ্জিনীয়র।

কিশোরীবাবুও নিজের সংসারের বিবরণ দিলেন। শুনে রসময়বাবু হেসে উঠলেন, বাঃ, দুজনেরই সীমিত সন্তান আর ইহলোকের কাজ শেষ, মানে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে। তবে আপনি অল্পবয়সে একটা শোক পেয়েছেন। মৃত্যু সব সময়ই বেদনাদায়ক, স্ত্রীকে হারানোর মতন দুঃখ তো আর নেই। একাধারে মা এবং বাবা হয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়।

কিশোরীবাবু কোন উত্তর দিলেন না। করুণ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর নানা প্রসঙ্গ। রসময়বাবুর স্ত্রীও মাঝে যোগ দিলেন।

ক'দিন থাকবেন এখানে? রসময় বাবু প্রশ্ন করলেন।

কিশোরীবাবু বললেন। যে ক'টা দিন ভালো লাগে থাকব।

ভালো লাগবে মশাই, খুব ভাল লাগবে। এই আবহাওয়া ভালো হওয়া শুরু হল। পূজো পর্যন্ত চমৎকার। তারপর বড্ড শীত পড়ে যায়। শীতটা আবার আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না।

রসময়বাবুর কথা শেষ হবার আগেই তাঁর স্ত্রী সশব্দে হেসে উঠলেন।—কলকাতার শীতেই তোমার যা অবস্থা হয়। ফ্ল্যানেলের শার্টের ওপর সোয়েটার, তার ওপর অলেস্টার, মাথায় মাংকি ক্যাপ। একেবারে ভাল্লুকের চেহারা।

রসময়বাবুও হাসলেন।—দেখলেন আমার স্ত্রীর পতিভক্তির নমুনা।

কিশোরীবাবু হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না। বুকের মাঝখানে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলেন। আজ যদি স্ত্রী তাঁর পাশে থাকত। দুটি দম্পতি পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গ আলাপ করে যেতে পারতেন। সুখ দুঃখের হাজার কথা। কিন্তু যা হবার নয় তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ কি!

একদিন বেড়াতে বেড়াতে চলে আসুন গরিবের বাড়ি। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে রসময়বাবু বললেন।

উঠছেন? কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ উঠি। লক্ষ্য করেছেন, বাতাসে একটু ঠাণ্ডা ভাব—

রসময়বাবুর স্ত্রী আবার হেসে উঠলেন।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি। বেলা রয়েছে। অস্ত সূর্যের আভায় সুবর্ণরেখার জল রক্তের মতো লাল। দূরের পাহাড়ের রং ঘন কালো। বাতাস খুব স্নিগ্ধ। কিশোরীবাবুর উঠতে ইচ্ছা করল না। হোটেলে ফিরেই বা কি করবেন। কমল চলে গেছে। কথা বলার একটা লোকও নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু আকাশ-পাতাল চিন্তা। কিন্তু একলা বসে থাকতেও কিশোরীবাবুর ভরসা হল না। তিনি উঠে পড়লেন।

চলতে চলতে রসময়বাবু উপদেশ দিলেন. সব সময়ে একটা লাঠি সঙ্গে রাখবেন কিশোরীবাবু। পাহাড়ে দেশ, সাপখোপের ভয় আছে।

কিশোরীবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।—খুব সাপ-টাপ আছে বুঝি এখানে ?

এই প্রথম রসময়বাবুর স্ত্রী সরাসরি কিশোরীবাবুর সঙ্গে কথা বললেন, না না, ওঁর কথা শোনেন কেন ? তবে জঙ্গলে সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয়। তবে এদিকটা এত লোক চলাচল করে। এখানে ওরা থাকবে না। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রসময়বাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতের লাঠি দিয়ে পাশের একটা ঝোপ দেখিয়ে বললেন, মনে আছে এই ঝোপে !

কিশোরীবাবু ত্বরিত পায়ে ঝোপের পাশ থেকে সরে এসে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ঝোপে কি ?

রসময়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, কিছুই নয়। বছর চার পাঁচ আগে ওই ঝোপের একটা ডালে ভাল্লুকের কিছু লোম আটকে ছিল।

ভাল্লুকের আনাগোনা আছে বুঝি এদিকটা ? কিশোরীবাবুর কণ্ঠে ভয়ের বেশ। বছর চার পাঁচ আগে এদিকটার চেহারাই অন্য রকম ছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে মহুয়া বন। মধু খেতে ভাল্লুকের পাল আসত। এখন চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে। কত বাড়ি হয়েছে। জন্তু জানোয়ারের ভয় আর নেই।

রসময়বাবুর স্ত্রীর কথায় কিশোরীবাবু বিশেষ আশান্বিত হতে পারলেন না। জন্তু জানোয়ারের কথা কি বলা যায়। ভুল করে এসে পড়লেই হল। কমল তাঁকে আচ্ছা জায়গায় রেখে গেল। কিশোরীবাবু মনে মনে একটু বিরক্তই হলেন।

রসময়বাবু হাত নেড়ে অভয় দিলেন,এখন অবশ্য এ সব উপদ্রব আর নেই। লোক প্রচুর বেড়ে গেছে। বহু জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলেছে।

পাকা রাস্তায় এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। রসময়বাবুরা বাঁদিকে যাবেন। কিশোরীবাবু ডানদিকে। যাবার সময় রসময়বাবু মনে করিয়ে দিলেন, বেড়াতে

বেড়াতে চলে যাবেন একদিন। বাড়ির নাম সুবর্ণরেখা, মনে থাকবে তো?

কিশোরীবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, থাকবে।

বেড়িয়ে ফিরে কমলের চিঠির উত্তর দিচ্ছিলেন কিশোরীবাবু, পোস্টকার্ডে লিখছিলেন, তাও পুরোটা ভরাতে পারছিলেন না। কিশোরীবাবুর শরীর ভালো আছে। তাঁর জন্য কারও চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। বিকালে ঠিক বেড়াচ্ছেন। একটি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।

কিশোরীবাবু একটু ভাবলেন। ভেবে বন্ধুত্ব কথাটা কেটে পরিচয় লিখলেন। এ বয়সে কি বন্ধুত্ব হয়। ও সব অল্প বয়সের ব্যাপার।

আর কি লেখা যায় ভাবছেন, এমন সময় দরজার কাছে ধনুয়ার গলার স্বর।— বাবু, রাতের খাবারটা নিয়ে আসব?

কিশোরীবাবু বালিশের নীচ থেকে ঘড়িটা বের করে সময় দেখলেন। নটা বাজে। সামান্য একটা পোস্টকার্ড লিখতে এতটা সময় লেগেছে ভাবতেই পারেননি। তার মানে লেখার কিছু নেই। তাছাড়া চিঠিপত্র কখনও বিশেষ লেখেননি। লেখার প্রয়োজন হয়নি। সবাই চিরকাল ধারে কাছেই ছিল। হাত বাড়ালেই সকলকে ছোঁয়া যেত।

বিয়ের পর গোটা দুয়েক চিঠি লিখেছিলেন। স্ত্রী তখন শান্তিপুরে। তারপর মনোরমা কিশোরীবাবুর কাছে এসেছিল। এসেছিল, কিন্তু থাকেনি।

বাবু! ধনুয়া আবার মনে করিয়ে দিল।

হ্যাঁ, দিয়ে দাও।

আশীর্বাদ দিয়ে কিশোরীবাবু চিঠি শেষ করলেন। তারপর বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুম থেকে বের হয়ে কিশোরীবাবু দেখলেন টেবিলের ওপর খাবার রাখা। ধনুয়া কাছে দাঁড়িয়ে। কিশোরীবাবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই ধনুয়া বের হয়ে গেল।

থালার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েই কিশোরীবাবু চমকে উঠলেন। রাত্রে তিনি রুটি খান। রুটিই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। রুটি ত্রিভুজের গড়নে ভাঁজ করা। মনোরমা যখন সংসারে ছিল, তখন ঠিক এই ভাবে রুটি সাজিয়ে দিত। আশ্চর্য ব্যাপার! কাল রাতে কিন্তু রুটি এভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়নি। কিশোরীবাবু অন্যমনস্ক ভাবে খাওয়া শেষ করলেন। ধনুয়া এক সময়ে বাসন নিয়ে গেল।

কিশোরীবাবু চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলেন। কাছ থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। রেডিওর গান। সম্ভবত এই পান্থনিবাস-এর কোন বোর্ডারের কামরা

থেকে আসছে। খুব চড়া স্বরের গান। জোরালো বাজনা। ইংরাজী বাদ্যের পটভূমিকায় বাংলা গান। আজকালকার ছেলেছোকরাদের পছন্দ।

রাস্তা জনমানবহীন। এখানে আটটার পরই চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। কেউ বিশেষ রাস্তায় বের হয় না। বারান্দা থেকে উঠে আসতে গিয়েই কিশোরীবাবু থেমে গেলেন। পাহাড়ের পিছনের আকাশে আলোর জ্যোতি। কিশোরীবাবু প্রথমে ভাবলেন, জঙ্গলে কেউ আগুন লাগিয়েছে। এভাবে যে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় সেটা কিশোরীবাবুর জানা ছিল।

একটু দাঁড়াবার পরই কিশোরীবাবু দেখতে পেলেন। পাহাড়ের পিছন দিয়ে চাঁদ উঠেছে। রুপোলী থালার মতন।

অনেক রাত পর্যন্ত কিশোরীবাবু এপাশ ওপাশ করলেন। কিছুতেই ঘুম এলো না। পুরান সব কথা মনের মধ্যে ভিড় করে এলো। নিজের মনকে বোঝালেন, সামান্য একটা কাকতালিয় ব্যাপারকে ভিত্তি করে এ ধরণের চিন্তা অর্থহীন।

ভোরের দিকে কিশোরীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কার শব্দে। বিছানা ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ বিভ্রম ঘটল। কিশোরীবাবুর মনে হল তিনি যেন কলকাতার বাড়িতেই শুয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর ঘরের দরজাটা তো এদিকে নয়। একটু পরেই ঘোর কাটল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন। দরজার ওপারে ধনুয়া। তার হাতে ট্রের ওপর ধূমায়মান চা আর টোস্ট।

দরজা খুলতে ধনুয়া হাসল। —আপনার দরজা খুলতে দেরী হওয়ায় আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বাবু।

একটু পিছিয়ে এসে কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ভয়। কিসের ভয়?

টেবিলের ওপর চায়ের কাপ আর টোস্টের প্লেট নামিয়ে রাখতে রাখতে ধনুয়া উত্তর দিল, দু'বছর আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল বাবু—

কি ব্যাপার?

দু' নম্বরে এক বুড়োবাবু এসেছিলেন শরীর সারাতে। বলতে নেই শরীর একটু ভালোই হয়েছিল। সকাল বিকাল খুব হাঁটতেন। এই রকম এক সকালে চা নিয়ে এসে দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দিচ্ছি—দরজা আর খোলে না। আমি ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলাম। দরজা ভাঙা হল। বাবু বিছানায় মরে পড়ে আছেন।

সাত সকালে মৃত্যুর খবর শুনতে কিশোরীবাবুর ভালো লাগল না। তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললেন, যাক গে ও সব কথা।

ধনুয়া চলে যেতে কিশোরীবাবু দরজা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুম

থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে বসতে গিয়েই টেবিলের ওপর কমলকে লেখা পোস্ট-কার্ডটা নজরে পড়ে গেল। ওটাকে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাতরাশ শেষ করে কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরে পোস্ট-কার্ডটা পকেটে রাখলেন। চিঠিপত্র সঙ্গে সঙ্গে ডাকে না দিলেই পড়ে থাকে। কিশোরীবাবু আবার যা অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক। নীচে নেমেই জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে।

আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি ডাকবাক্সটা কোথায় ?

জানকীবাবু বলল, চিঠি ফেলবেন ? দিন না আমার কাছে। আমাব লোক তো বাজারে যাবেই, তার হাতে দিয়ে দেব।

আমি তো বেড়াতে বের হচ্ছি, আমিই ফেলে দেব।

জানকীবাবু আব কিছু বলল না। একটু এগিযে কিশোরীবাবুব সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে রাস্তার দিকে দেখিয়ে বলল, এই দিকে বাজার। স্টেশন থেকে আসবাব সময় নিশ্চয় বাজাব দেখেছেন। সেখানেই ডাকবাক্স আছে।

ধন্যবাদ জানিযে কিশোবীবাবু বাস্তাব দিকে এগিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেশ ভিড। সাব সার সাইকেল রিকশা চলেছে। পদাতিকেবও কমতি নেই। মোট মাথায অনেকে চলেছে। বোধ হয বাজাবে বসবে।

সকাল থেকে মনটা খিঁচডে বয়েছে। ধনুয়া যে মৃত্যুব খবব পরিবেশন কবেছে তাতেই কিশোরীবাবুব মেজাজটা খাবাপ হযে আছে। মৃত্যুর চেয়ে বড সত্য পৃথিবীতে আব কিছু নেই। মৃত্যু সদাসর্বদা সমস্ত প্রাণীকে ছায়াব মতন অনুসরণ করে। যে কোন মুহূর্তে গ্রাস করে নিতে পাবে। কে বলতে পারে কিশোবীবাবুর অদৃষ্টে কি ধরণেব মৃত্যু আছে। মৃত্যু শাশ্বত, চিরন্তন তা জেনেও মানুষ ভয পায়। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলাব হাস্যকব প্রয়াস করে।

কিশোরীবাবু ও কিশোরীবাবু—

কিশোবীবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। এদিকে ওদিকে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ে গেল। একটা একতলা বাড়ির সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে রসময়বাবু ডাকছেন কোথায় চলেছেন ? বেড়াতে ?

না, বেড়াতে ঠিক নয়। একটা চিঠি ডাকে দোব।

ততক্ষণে রসময়বাবু এগিযে এসেছেন কিশোরীবাবুর মুখোমুখি।—তাই বলুন। না হলে বেড়াবার পক্ষে সকালবেলায় এ রাস্তা মোটেই ভালো নয় সারা ঘাটশীলার লোক বাজাব কবতে আসে এ রাস্তায়। আসুন, একটু বসে যাবেন। রসময়বাবু আমন্ত্রণ জানালেন।

চিঠিটা ফেলে আসি, নয়তো পকেটেই থেকে যাবে।

রসময়বাবু কিশোরীবাবুর কথায় হেসে ফেললেন।—আমারও মশাই ওই বদভ্যাস। এজন্য গিন্নির কাছে কম কথা শুনতে হয়। যান, চিঠিটা ফেলে আসুন, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ডাকবাক্স খুঁজতে হল না। দূর থেকেই দেখা গেল। চিঠি ফেলে কিশোরীবাবু ফিরে এলেন। সুবর্ণরেখার সামনে রসময়বাবু নেই। বোধ হয় বাড়ির ভিতরে গিয়েছিলেন। কিশোরীবাবু একটু ইতস্তত করলেন। ভাবলেন ডাকবেন কিনা। তার আগেই জানলায় রসময়বাবুকে দেখা গেল।—কি হল, সোজা চলে আসুন।

লোহার গেট খুলে কিশোরীবাবু ভিতরে ঢুকলেন। নুড়ি ফেলা পথ। দু'পাশে বাগানের ইশারা। মনে হয় বাগান করার চেষ্টা হয়েছিল, দেখাশোনার অভাবে ইদানীং হতশ্রী। শুধু একটা মাধবীলতা থাম জড়িয়ে ছাদের কার্নিশে উঠেছে। রাঙা ফুলের ভারে পাতা দেখা যাচ্ছে না।

সামনে এক ফালি বারান্দা। পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার। রসময়বাবু কিশোরীবাবুকে একটা চেয়ারে বসে অন্যটায় নিজে বসলেন।

কি খাবেন বলুন? একটু চা দিতে বলি?

না না, কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন, চা আমি দিনে দু' কাপ খাই।

আরে মশাই চা তো আর মদ নয়, যে অত হিসাব করে খেতে হবে। চা না খান তো একটু কফি-টফি করে দিতে বলি। প্রথম দিন এলেন আমার বাড়ি। ঠাণ্ডা, অ-ঠাণ্ডা—

ঠাণ্ডা এসে দাঁড়াল। এ দেশের আদিবাসী তরুণী। পরনে বাসন্তী রং শাড়ি। লাল ব্লাউজ। খোঁপায় লাল চিরুনি, এ পাশের চুলে একটা ফুল গোঁজা। মাধবী। বোধ হয় এ বাড়ির গাছ থেকেই তোলা।

মাকে বল কিশোরীবাবু এসেছেন। দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে।

ঠাণ্ডা ভিতরে চলে গেল। কিশোরীবাবু থাকতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, এর নাম ঠাণ্ডা?

রসময়বাবু হেসে বললেন, ওর এদেশী কি একটা নাম আছে। মেয়েটি খুব শান্ত প্রকৃতির বলে এই নামে আমি ডাকি। যখনই আমরা এখানে আসি, মেয়েটি আমাদের কাজ করতে চলে আসে। সামনের বছর কি হবে জানি না।

কেন?

আর মাস দুয়েক বাদে ঠাণ্ডার বিয়ে। বর টাটায় কাজ করে। ওকে সেখানেই

নিয়ে যাবে।

কিশোরীবাবু আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। কলকাতা হলে বাড়ির কি সম্বন্ধে হয়তো কোন কৌতূহলই থাকত না। বিদেশে বলবার মতন কথা নেই বলেই এ সব প্রসঙ্গ চলে আসে। নেহাৎ কালক্ষেপের জন্য।

একটু পরেই আবার ঠান্ডা এলো। ট্রেতে দু'কাপ কফি। শুধু কফি নয়, সঙ্গে প্লেটে দুখানা করে গরম নিমকি।

কিশোরীবাবু আপত্তি করলেন, আবার এ সব কেন ?

না বলবেন না মশাই। গিন্নি সকালে উঠে নিজের হাতে ভাজছেন।

কিশোরীবাবু আর কিছু বললেন না। গরম নিমকি বেশ মুখরোচক লাগল।

জানেন, ঠান্ডার একটা ইতিহাস আছে। আপনি গল্প উপন্যাস পড়েন ?

খুব কম।

একেবারে উপন্যাসের ব্যাপার মশাই। ছোকরা সাহিত্যিক কেউ জানলে এক লাগসই উপন্যাস লিখে ফেলবে। বছর দুয়েক আগের ঘটনা।

কিশোরীবাবু কফিতে চুমুক দিলেন।

মেয়েটার মা বাপ নেই। বোন ভগ্নিপতির কাছে থাকে। একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে হাট থেকে ফিরছিল, মাঝপথে মেয়েটাব মুখ বেঁধে কারা নিয়ে পালাল। বোন ভগ্নিপতি খুঁজে খুঁজে অস্থির। সেই সময় আমরা এখানে এসেছি। ঠান্ডাকে ডাকতে গিয়ে ব্যাপারটা শুনলাম। ভগ্নিপতিকে বললাম, পুলিশে খবর দিতে। এরা সহজে পুলিশের কাছে যায় না। পুলিশকে এদের ভারি ভয়। সকলেরই গোলমাল আছে। চোলাই মদের ব্যাপারে।

রসময়বাবু থামলেন। ঠান্ডা আবার এসে দাঁড়িয়েছে। কাপ ডিশ নিয়ে যাবার জন্য। ঠান্ডা কাপ ডিশ নিয়ে যেতে রসময়বাবু আবার শুরু করলেন, আমি উকিল মানুষ। থানা পুলিশ নিয়েই আমার কারবার। জোর করে ভগ্নিপতিকে নিয়ে থানায় গেলাম। মিস্টার সিং থানার ও-সি। সব শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় রঙ্গিনী দেবীর মন্দিরে নিয়ে গেছে।

কিশোরীবাবু কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, রঙ্গিনী দেবীর মন্দিরে ?

হ্যাঁ, এখানকার রঙ্গিনী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। দেবীর দুটো মন্দির আছে। একটা এদিকে আর একটা যাদুগোড়া পার হয়ে। এখানকার সেবাইতদের বদনাম আছে। তারা মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে চুরি করে দেবীর সামনে বলি দেয়।

সর্বনাশ! কিশোরীবাবু রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। এ আবার কি জায়গা!

মধ্যযুগের রীতিনীতি এখনও চালু আছে। যখন সারা দেশ থেকে পশুবলিই উঠে যাচ্ছে, তখন নরবলির প্রথা রয়েছে এখানে! এ সব লোকের মতিগতির কথা কিছু বলা যায় না। ছোট ছেলেমেয়ে না পেলে হয়তো বুড়োদের ওপরই নজর দেবে। দেবী তো আর উপবাসী থাকতে পারেন না।

ঠান্ডাকে পাওয়া গেল। রসময়বাবু আবার শুরু করলেন, রঙ্গিনী দেবীর মন্দিরে নয়, পাওয়া গেল এক সন্ন্যাসীর গুহায়। এই সন্ন্যাসী রঙ্গিনী দেবীর পূজারী। ঠান্ডার হাত পা বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার কবা হল। ঠান্ডাকে উদ্ধাব করে ফেরত দেওয়া হল তার বোন ভগ্নিপতিব কাছে। কিন্তু ঠান্ডা তো চটে লাল।

সে কি!

হ্যাঁ, সে বলতে লাগল কেন তাকে উদ্ধার করা হল? রঙ্গিনী দেবীর কাছে তাকে বলি দিলে সে উদ্ধার হয়ে যেত। তার জন্ম সার্থক হত।

বলেন কি!

সবাই বলে সন্ন্যাসী ঠান্ডাকে হিপনোটাইজ করে রেখেছিল, তার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি ছিল না। কিছুদিন পরে ঠান্ডা ঠিক হয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর কি শাস্তি হল?

সে আর এক কান্ড। হাজত থেকে সন্ন্যাসী উধাও হল। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিশোরীবাবুর কেমন সন্দেহ হল। রসময়বাবু রসিক লোক। মজা করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছেন না তো? তা না হলে বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের অলৌকিক ঘটনা সম্ভব!

কিশোরীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।—চলি রসময়বাবু, বেলা হয়ে গেল।

রসময়বাবু বিচক্ষণ লোক। বোধ হয় বুঝতে পারলেন তাঁর বলা কাহিনী কিশোরীবাবু হজম করতে পারছেন না। না পারাই স্বাভাবিক। প্রথমটা তিনিও বিশ্বাস কবতে পারেননি কিন্তু ও-সি মিস্টার সিংয়ের কাছ থেকে শুনে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন ঘটনাও তো পৃথিবীতে ঘটে! তাছাড়া ঠান্ডাও একই কথা বলেছে।

রসময়বাবু কিশোরীবাবুর পাশাপাশি রাস্তায় নামলেন। বললেন, দাঁড়ান, আপনাকে রঙ্গিনী দেবীর মন্দিরে একদিন নিয়ে যাব।

কিশোরীবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।—কেন, বলি দিতে নাকি?

আরে না না, রসময়বাবু হাসলেন, বুড়ো লোককে বলি হিসাবে মা নেন না।

এমনিই দেখতে যাবেন।

কিশোরীবাবু কোন উত্তর দিলেন না। গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

গেট খুলে রসময়বাবু বললেন, বিকালে আসছেন তো সুবর্ণরেখার ধারে?

হ্যাঁ, আসব। কিশোরীবাবু চলতে চলতে বললেন।

পান্থনিবাসের কাছাকাছি এসে কিশোরীবাবুর মনে হল, সকালে বেড়ানোই হল না। রসময়বাবুর বাড়ি আটকে গেলেন। খোস গল্পে সময় নষ্ট হল। অথচ ঠিক করেছিলেন, সকাল বিকালে হাঁটবেন। কমলও তাই বলে গেছে। দু'বেলা না হাঁটলে শরীর ঠিক থাকবে না। পয়সা খরচ করে চেঞ্জে আসা অর্থহীন হবে।

বিকালে বের হবার সময় কিশোরীবাবু ঠিক করলেন, আজ আর সুবর্ণরেখার ধারে নয়, রাস্তা ধরে সোজা কিছুটা হাঁটবেন। পরে রসময়বাবুর সঙ্গে দেখা হলে কিছু একটা কৈফিয়ত দিয়ে দেবেন।

কিন্তু তা হল না। রাস্তায় নেমে সুবর্ণরেখার দিকেই ঘুরলেন। ভাবলেন, বিদেশ বিভূঁয়ে রসময়বাবুর সঙ্গেই একমাত্র চেনা হয়েছে। আপদে বিপদে হয়তো তিনিই এগিয়ে আসবেন। তাঁর সঙ্গ ছাড়াটা উচিত হবে না। তাছাড়া এখানকার যা বর্ণনা রসময়বাবুর কাছে শুনেছেন, তাতে অচেনা রাস্তায় একলা একলা হাঁটাও নিরাপদ নয়। আদিবাসীরা ঝোপের আড়াল থেকে বিষ মাখানো তীরও ছুড়তে পারে, কিছুই বিচিত্র নয়।

দূর থেকেই দেখতে পেলেন, একটা কালো পাথরের পাশে রসময়বাবু আর তার স্ত্রী বসে আছেন। বাতাসে স্ত্রীর মাথার ঘোমটা খুলে গেছে। বিরাট খোঁপা। এ বয়সেও চুলের প্রাচুর্য দেখে কিশোরীবাবু অবাক হলেন। রসময়বাবুর কি একটা কথায় তাঁর স্ত্রী খুব হাসছেন।

কিশোরীবাবু একটু ইতস্তত করলেন। এই সময় গিয়ে পড়াটা অনুচিত হবে। একটু পরে হাসি থামাতে কিশোরীবাবু এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কতক্ষণ এসেছেন? সাধারণত এতটা চড়া গলায় কিশোরীবাবু কথা বলেন না। গলার স্বর তুললেন শুধু তাঁর উপস্থিত জানাবার জন্য।

রসময়বাবু ফিরে দেখলেন। বললেন, আরে এত দেরী কেন? আমরা তো ভাবলাম আপনি বুঝি এলেনই না।

কিশোরীবাবু ব্যবধান রেখে বসে পড়লেন—আপনি সকালে যা ভয় দেখালেন মশাই, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

সে কি! শুনুন সব জায়গায় বিশ্বাস অবিশ্বাস পাশাপাশি বাস করে। সেই

জন্যই পাহাড়ী শহরের এত রহস্য। কলকাতায় তো শুধু নগ্ন অবিশ্বাস, নিষ্ঠুর বস্তুতান্ত্রিকতা। প্রখর সূর্যালোকের মতন সব কিছু স্পষ্ট।

কাব্য কোন দিনই কিশোরীবাবু বোঝেন না। আজও বুঝলেন না। সোজা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এখানকার আদিবাসীরা কেমন লোক? আড়াল থেকে তীর-টীর ছোঁড়ে?

রসময়বাবু অবাক চোখে কিশোরীবাবুকে দেখলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, কোন্ যুগে আছেন মশাই! খুব অ্যাডভেঞ্চারাস কাহিনী পড়েন বুঝি? বিষ মাখানো তীর ঝোপের পিছন থেকে? শুনে রাখুন, এখানকার আদিবাসীরা অত্যন্ত নিরীহ। আপনি সারারাত বাড়ির দরজা খুলে রাখলেও চুরি-চামারির ভয় নেই।

অপ্রতিভ কিশোরীবাবু চোখ খুলেই আরও বিব্রত হলেন। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে রসময়বাবুর স্ত্রী তাঁকে দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অকৃত্রিম কৌতূহল। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন জীব দেখছেন। আমতা আমতা করে কিশোরীবাবু বললেন, তবে যে সকালে আপনি মেয়ে চুরি করে বলি দেবার কথা বললেন?

রসময়বাবু হেসে উঠলেন—আরে সে তো তান্ত্রিকদের কাণ্ড। ও রকম ঘটনা কলকাতায় কিংবা অন্য বড় বড় শহরেও শোনা যায়। খবরের কাগজে পড়েন না। আর সন্ন্যাসীর হাজত থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপার? ওটা বাজে কথাই হবে, কিংবা পয়সা কড়ি নিয়ে পুলিশই হয়তো তাকে বের করে দিয়েছে। না মশাই, আপনি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ কিশোরীবাবু লজ্জায় কোন কথা বললেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। পাথরে আছাড় খেয়ে সুবর্ণরেখা ছুটে চলেছে। তার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। কোথায় বিদঘুটে গলায় একটা পাখি ডেকে চলেছে। হঠাৎ রসময়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এই প্রথম কলকাতার বাইরে এলেন?

প্রায়।

প্রায় মানে?

আর একবার শান্তিপুর গিয়েছিলাম।

শান্তিপুর তো বাড়ির দরজায়। তাহলে এত দূরে এই প্রথম। ঠিক আছে, এখানে আমার বন্ধু নকুলবাবু রয়েছেন। মস্ত বড় ফরেস্ট কনট্রাক্টর। ভদ্র-লোকের অনেকগুলো প্রাইভেট কার, লরি আছে। তাঁকে একটা মোটর পাঠিয়ে দিতে বলব। তাতে আমরা ফুলডুংরি, মোভান্ডার, যাদুগোড়া বেড়িয়ে আসব। জায়গাটা ভালো ভাবে দেখলে আপনার ভয় ভেঙে যাবে।

[illegible] কিশোরীবাবু প্রশ্ন করলেন, আপনারা অনেক জায়গা ঘুরেছেন বুঝি ?

রসময়বাবু ইঙ্গিতে স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, এঁর কল্যাণে হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সবই ভ্রমণ করা হয়ে গেছে।

রসময়বাবু আর তাঁর স্ত্রীর এত বয়সেও প্রেম দেখে কিশোরীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর মনে পড়ল নিজের প্রথম জীবনের প্রেমের কথা। মনোরমার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই তাঁর আলাপ ছিল। মনোরমার জন্মদিনে তিনি ফুলের তোড়া উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন।

মনোরমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু ফুলের দিকে তাকিয়ে তার চোখ ট্যারা হয়ে গেল। জন্মদিনে প্রেমিকের কাছ থেকে এমন উপহার আশা করেনি। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, কাগজের ফুল কেন ?

কিশোরীবাবু বলতে পারলেন না যে সত্যিকারের ফুল থেকে কাগজের ফুলের দাম অনেক কম বলেই তিনি কাগজের ফুল কিনেছেন, তিনি বললেন, সত্যিকারের ফুল তো দুদিনে শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়। কাগজের ফুলই বেটার। অনেককাল থাকবে। আমাকে ভুলতে পারবে না।

তা বলে, ভুল করেও তোমাকে ভোলা যাবে না। এমন উপহার আগে আমাকে কেউ কোনদিন দেয় নি।

তা তো দেবেই না। আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে দিতেই পারবে না।

তা সত্যি, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আমি জীবনে বেঁচে থাকার নতুন স্বাদ পেয়েছি।

নতুন স্বাদ। তার মানে আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেও তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ। তুমি কি আগে কাউকে ভালবাসতে ?'

হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে ক'জনকে ভালবেসেছ ?

তিনজনকে।

অ্যাঁ, সে তিনজন কারা কারা ?

নদী, আকাশ, পর্বত।

তার মানে ?

আমাদের দেশের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। সেই নদীকে আমি খুব ভালবাসতাম। নদীর কাছেই ছিল পাহাড়। সেই পাহাড় আমার খুব প্রিয়

ছিল। নদীর বুকে আকাশের ছায়া পড়ত। সেই আকাশের দিকে তাকালে আমার মন ভালবাসায় আকুল হয়ে উঠত।

দূত্তোর। আমি সে ভালবাসার কথা বলছি না।

'তবে?'

তুমি কিছু বোঝ না—বলে কিশোরীবাবু ঘরের একটি চেয়ারের উপর ধপাস্ করে বসে পড়লেন।

আমি তোমার জন্য চা করে আনছি। চলে যেওনা কিন্তু। এই বলে মনোরমা রান্নাঘরের দিকে গেল।

কিশোরীবাবু একলা একটি ঘরে ভাড়া থাকেন। পড়াশুনা করতে করতে হঠাৎ চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন কিশোরীবাবু।

কিশোরীবাবু যে অফিসে কাজ করেন সে অফিসেই কাজ পায় মনোরমা।

আগে কিশোরীবাবু দু'ঘরের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। একা মানুষ, দুটো ঘরের প্রয়োজন ছিল না। ভাড়া বসবার সময় মন খারাপ হয়ে যেত। অকারণে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে ভাবতেন অথচ এক ঘরের ফ্ল্যাট হন্যে হয়ে খুঁজে তিনি পাননি। এমনিতেই ব্যাচেলারকে কেউ ঘর ভাড়া দিতে চায় না। এমন সময় অফিসেই সে শুনতে পেল মনোরমা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছাত্রী-হস্টেলে কোনো চাকুরিয়া মহিলাকে রাখা হবে না। দুপুরবেলা কলেজ ও চাকরি এক সঙ্গে করা যায় না। মনোরমা মুশকিলে পড়েছিল। সেই মুশকিল থেকে তাকে উদ্ধার করল কিশোরী। নিজের দু'ঘরের ফ্ল্যাটের একটি ঘর মনোরমাকে ভাড়া দিয়ে দিল। সেই থেকে মনোরমা পাশের ঘরেই রয়ে গেল। দুজন দুজনের ঘরেই থাকত। কিন্তু পাশাপাশি থাকার ফলে কিশোরীবাবুর কি যে হলো! পরিচয় পরিণত হলো ঘনিষ্ঠতায়। ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকলে যা হয়।

'কি ভাবছো কি? চা এনেছি। মনোরমার কণ্ঠস্বরে কিশোরীবাবু সচকিত হলেন। ফিরে দেখলেন চায়ের ট্রের উপর শুধু ধূমায়িত চা নয়, এক প্লেট মিষ্টি আর সিঙারাও আছে।

বললেন শুধু চা-ইতো যথেষ্ট ছিল। এত মিষ্টিটিষ্টি কেন?

মনোরমা হাসি হাসি মুখ করে বলল, আমার জন্মদিনে তোমাকে মিষ্টি খাওয়াতে ইচ্ছে করল তাই।

কিশোরীবাবু মনে মনে হিসেব করলেন—কাগজের ফুলকিনতে যা খরচ হয়েছে, মিষ্টিগুলোর দাম তার বেশি ছাড়া কম নয়।

চল আজ জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুজনে বাইরে ঘুরব, তারপর হোটেলে খেয়ে নেব।

কিন্তু হোটেলে খেতে গেলে তো অনেক খরচ, মনোরমা বলল। তার চেয়ে চল বাড়ীতে নিজের হাতে তোমায় রান্না করে খাওয়াব।

মনোরমার হাতের রান্না খেয়ে সত্যিই সেদিন তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

তারপর মনোরমাকে একদিন রেজেস্ট্রি করে বিয়েও করে ফেললেন।

দুজনের জমানো টাকায় অফিসের লোকদের খাওয়ালেন।

এইভাবে তাদের দিনগুলো আনন্দের মধ্যে বেশ কেটে যাচ্ছিল। তারপর তাদের জীবনে এসেছিল'খোকা'। তারা তার ভাল নাম রেখেছিল অমিয়। মনোরমাকে অফিস ছাড়তে হয়েছিল খোকা পেটে আসার পর থেকে। সংসার আর অফিস একসঙ্গে করা সম্ভব ছিল না তখন। কিশোরীবাবুর একলার পক্ষে সংসার চালান শক্ত হয়ে উঠে-ছিল। মনোরমার বেতন তাঁর চেয়ে বেশী ছিল। তখন সংসার বেড়েছে। খোকার পড়াশুনা, বাড়ীভাড়া। কিশোরীবাবুর অফিসে অনেকেরই প্রমোশন হয়ে গিয়ে-ছিল। মনোরমা স্বামীকে বলত দু একটা পরীক্ষা দিলেও তো পারতে। এত কষ্ট হবে জানলে বিয়ে করতাম না। দিনের পর দিন মনোরমার বক্তৃতায় কিশোরীবাবু অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। সত্যি, যে করেই হোক তাঁকে একটা প্রমোশনের ব্যবস্থা করতেই হবে।

মিস্টার কাপুর তাঁর অফিসের ওপরওয়ালা। তাঁকে খুশি করা দরকার। মিস্টার কাপুরকে একদিন বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন কিশোরীবাবু। আগামীকাল রবিবার, তিনি আসবেন। মাত্র তিন মাস কলকাতায় থেকে আবার দিল্লীতে ফিরে যাবেন।

কাপুর সাহেব এলেন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। মনোরমা সেদিন অনেকরকম রান্না করে কাপুর সাহেবকে খাওয়ালো। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কাপুর সাহেব মনোরমাকে খুবই সপ্রশংস দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। খাওয়ার শেষে কিশোরীবাবুকে বললেন একি ঘরের অবস্থা। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সেদিন ভদ্রলোক কিশোরীবাবু ও মনোরমার সঙ্গে অনেকক্ষন গল্প করলেন। মনেই হল না, তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছেন।

এত গরমে থাকেন কি করে ঘরে? একটা শিলিং ফ্যান লাগিয়ে নিলেই তো পারেন।

শিলিং ফ্যান, সে তো অনেক দাম স্যার। গরিব কর্মচারী অত টাকা কোথায় পাব?

ঠিক আছে আমিই না হয় ফ্যান কিনে দেব। মনোরমাদেবীর নিশ্চয় গরমে খুব কষ্ট হয়।

মনোরমা বলল, না, না আমার একটুও কষ্ট হয় না। আমার গরমে থাকার অভ্যাস আছে। আপনি আমাদের জন্য ফ্যান কিনতে যাবেন কেন?

কাপুর বললেন, তাতে কি হয়েছে? কিশোরীবাবুর জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করছি। প্রমোশন হলে বেশ ভালভাবে থাকতে পারবেন।

মনোরমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে কিশোরীবাবু আগেই বললেন, আপনি কিছু দিতে চাইলে তা না নিলে আপনাকেই অপমান করা হয়। আপনার ইচ্ছেই আমাদের ইচ্ছে স্যার। কিন্তু তখন কিশোরীবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি এর জন্য তাঁর পুরো পরিবারে আঁধার নেমে আসবে।

দুদিন পরের ঘটনা। কাপুর সাহেব দুপুরবেলা কিশোরীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। কিশোরীবাবু ছিলেন না। মনোরমা আপ্যায়ন করে বসালেন, সাধ্যমত অতিথি সেবা করলেন। কিন্তু কাপুর সেদিন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল। কাপুর এগিয়ে গেলেন মনোরমার দিকে—কাপুরের লোলুপ ঠোঁট নেমে এসেছিল তার ঠোঁটের ওপর। মনোরমা বার বার বাধা দিয়েছিল, মিনতি জানিয়েছিল, কিন্তু কোন নিষেধই তিনি মানেননি। মনোরমা হয়ত চেঁচামেচি করে নিজেকে বাঁচাতে পারত, কিন্তু, তাতে কি কিশোরীবাবুর চাকরিটা আর থাকত? পথে বসতে হত না সমস্ত সংসারটাকে? সবশেষ হয়ে গেলে মনোরমা নিজের চেহারা দেখে যেন নিজেই লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যেতে লাগল।

পরের দিনই শিলিং ফ্যান, প্রমোশন সবই পেয়ে গিয়েছিলেন কিশোরীবাবু।

মনোরমা স্বামীর কাছে কথাটা গোপন রাখেনি। কয়েক দিন পর কিশোরীবাবু একখানা চিঠি পেলেন মনোরমার। তাতে লেখা এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে তখন আমি তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছি। আমি তোমার উন্নতি চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করে নয়। পরীক্ষা দিয়ে উন্নতি চেয়েছিলাম। আমার খোকা-সংসার সবই ছাড়তে হল। কাল তুমি কাপুর সাহেবকে পাঠিয়েছিলে আমার কাছে। জানোয়ারটা আমার দেহের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এর জন্য দায়ী তুমি। চিঠিটা পড়ে কিশোরীবাবু অনেকক্ষণ হতভম্বের মত বসে রইলেন। প্রমোশনের কথা তিনি বলেছিলেন কাপুর সাহেবের কাছে কিন্তু নিজের স্ত্রীকে বিকিয়ে দিতে চাননি কাপুর সাহেবের কাছে। মনোরমা তাঁকে ভুল বুঝেছে, সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। এখন কি করবেন তিনি? খোকাকে কে দেখবে?

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনোরমাকে পাননি কিশোরীবাবু। তাঁর স্থির বিশ্বাস হল মনোরমা আর নেই।

আজ এত বছর পরে পান্থনিবাসে মনোরমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারেন নি।

কি ভাবছেন কিশোরীবাবু, রসময়বাবু হাসতে হাসতে বললেন।

না, তেমন কিছু নয়, খোকাকে একটি চিঠি দেব ভাবছি।

রসময়বাবুও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন অনেক দূরে এগিয়েছেন তখন বিকেল ছাড়িয়ে গেছে। বেশ শীত শীত করছে। আসবার সময় একটা সোয়েটার চাপিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটা সোয়েটারের কাজ নয়। সমুদ্র থেকে অনেকটা উঁচুতে এই জায়গাটা। শীত তো করবেই।

চোখের সামনে দেখতে লাগলেন এক অকল্পনীয় জগতকে। চারদিকে গাছ গাছালির মধ্যে কিশোরীবাবুদের হোটেল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে এক ফালি চাঁদ। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। দু চারজন মানুষ এদিকে ওদিকে।

আচ্ছা, মনোরমা তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না? যদিও আমি জানি সেই বয়সে তোমার দেহের পবিত্রতা নিয়ে আমার মনে অনেক সংশয় ছিল, তবু তোমাকে আমি খুঁজেছি। আর বিশ্বাস কর কাপুর সাহেবকে সেদিন বাড়ীতে পাঠানোর আমার আমার কোন হাত ছিল না।

উত্তরে মনোরমা বলল, ওসব পুরোনো কথা ভেবে কী লাভ বল? বেশ, আমি যদি বলি তোমাকে ক্ষমা করলাম তাহলে তুমি কি শান্তি পাবে? তাই যদি নয়, তাহলে বলছি এখানে ক্ষমার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি যেমন আমার কথা ভেবে সবকিছু করেছ, আমিও তেমন নিজের জেদ বজায় রেখে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনি।

তুমি বললেই তো আমি শুনব না। আমার ভুলের জন্য তোমার জীবনটাই আমি নষ্ট করে দিয়েছি। প্লিজ মনোরমা, মুখে তুমি একবার অন্তত বলো আমাকে ক্ষমা করেছ।

এবার মনোরমার গলা ভারি হয়েছে। বলেছে, ক্ষমা করলাম। বলে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঝাপসা চোখজোড়া মুছে নিয়েছে।

আজ কয়েকদিন থেকে মনোরমাকে দেখাব পর থেকে কিশোরীবাবুর মনটা খুব মুষড়ে পড়েছে। মনোরমা ওখান থেকে চলে আসার পর থেকেই ওঁর এই অবস্থা। তাঁর আপনজন বলতে কেউই নেই। মনোরমা তো ওঁর একান্ত আপনজনই ছিল একদিন। সম্পত্তির দিক দিয়ে এখনও তাই আছে। কোর্ট থেকে তো বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। শুধু দুজন দুজনকে ছেড়ে আছেন বহু বছর ধরে। কিন্তু স্ত্রীর ওপর সমস্ত অধিকার নিজের দোষেই হারিয়েছেন কিশোরীবাবু। তবু মনোরমা যে তখনও ওঁর সঙ্গে কথা বলছে, এইতো কিশোরীবাবুর কাছে অনেকখানি।

মনোরমা বলেছিল আর তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

সারা রাত আমি সেদিন ঘুমোই নি। এই অপবিত্র দেহ নিয়ে আর বাঁচা সম্ভব নয়। ভোর হবার আগেই আমি পা টিপে টিপে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। পাশে ঘুমন্ত খোকাকে আসবার সময় আদর করলাম।

তখন ভোরের আকাশ ভাল করে পরিষ্কার হয় নি। আমি সিঁড়ি ভেঙে জলের দিকে এগোলাম কিন্তু হঠাৎকেন জানি না খোকার মুখটাচোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

খোকার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বলেই মরতে পারিনি।

কিশোরীবাবুর গলার কাছে কান্নার একটা পিণ্ড ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। শরীরের কোষে কোষে তীব্র একটা যন্ত্রণা। জ্বালা করে উঠল দুটি চোখ। কিশোরী-বাবুর ইচ্ছা হল মনোরমাকে থামিয়ে দেবেন। এ সব কথা শুনতে তাঁর ভালো লাগছে না। কিন্তু পারলেন না। সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেছে।

মনোরমা বলে গেল, কখন পাড়ে উঠে একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। গোলমালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চোখ খুলে দেখি, ভোর হয়েছে। মাঝি মাল্লাদের চিৎকারে, স্নানার্থীদের কলরবে জায়গাটা সরগরম।

হঠাৎ, 'তুমি কে গা বাছা?' শুনে চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি গবদ পরা সদ্যস্নান করা এক মহিলা। টকটকে গৌরবর্ণ বঙ। মমতা মাখানো দুটি চোখ। পিছনে ঝিয়ের হাতে শাড়ি আর গামছা।

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি বড় দুঃখী মা। আমার কেউ কোথাও নেই।

সিঁথের সিঁদুর, হাতে শাখা দেখছি, তবে কেউ নেই বলছ কেন?

স্বামী থেকেও নেই মা। তিনি আমায় ঘরে নেন না।

সতীন আছে বুঝি? তা আজকাল তো শুনেছি একটার বেশী বিয়ে হয় না। আইনে আটকায়।

পৃথিবীর সব কিছু আইনমাফিক কি হচ্ছে মা? দুর্জনের পক্ষে সবই সম্ভব।

অ্যাঁ, তুমি আমাকে দুর্জন বললে?

মনোরমা হেসে ফেলল, তারপরই সামলে নিয়ে বলল, তখন তোমার ওপর আমার ভারি রাগ হয়েছিল। ভাবলাম, এত বছর ধরে প্রাণ দিয়ে যে সংসার করলাম তার সব মিথ্যে হয়ে গেল, আর কবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে আমার সর্বনাশ করেছে, সেটাই সত্যি হয়ে রইল?

কিশোরীবাবু মুখ তুললেন না। পারলেন না মুখ তুলতে।

তুমি যাবে আমার সঙ্গে? প্রৌঢ়া প্রশ্ন করলেন।

প্রৌঢ়ার প্রশ্নে কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা জাগল। একবার আকস্মিক ভাবে নিজের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বস্ব হারিয়েছি। যার জের টেনে আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছি। এ শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ। এই প্রৌঢ়া মহিলার হাতছানিতে ভুলে শেষ পর্যন্ত আবার কোন নরকে নামব না তো।

যদি যাও তো এসো—

কোথাও একটা যেতে হবে। না হলে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে সর্বনাশের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রৌঢ়ার পিছন পিছন মোটরে গিয়ে উঠেছিলাম। এভাবেই রায়বাহাদুর বিরজা মিত্রের সংসারে ঢুকেছিলাম। আমার কাজ ছিল শুধু গিন্নীমার পরিচর্যা করা। তাঁকে বই পড়ে শোনানো। বিকালে তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া।

তা নামটা বদলালে কেন?

রায়বাহাদুর আমাকে 'অ মেয়ে' বলে ডাকতেন। গিন্নিমা জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার নাম কি বাছা? কি বলে ডাকব?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমার কোন নাম নেই মা। পুরোনো নাম আমার অপয়া। আপনারা নতুন জীবন দিয়েছেন, নতুন নামও দিন।

গিন্নীমা হেসে বলেছিলেন, ঠিক আছে, তোমার নাম আনন্দময়ী। সকলকে আনন্দ দাও, নিজে আনন্দ পাও। এই আশীর্বাদ করি।

কি ব্যাপার কিশোরীবাবু, আমাদের সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করলেন যে? রসময়বাবু কখন উঠে এসেছেন দুজনের কেউ খেয়াল করেনি। মনোরমা ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীর পায়ে সরে গেল।

ইনি কে? যেন চেনা চেনা লাগছে? মনোরমার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে রসময়বাবু প্রশ্ন করলেন।

এমন একটা প্রশ্নের জন্য কিশোরীবাবু তৈরিই ছিলেন। বললেন, উনিই তো আনন্দময়ী দেবী। ওঁরই তো হোটেল। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে লতায় পাতায় ওঁর একটা আত্মীয়তা আছে। আমার স্ত্রীকে খুব চিনতেন। তার কথাই বলছিলেন।

ও, ওঁকে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছি, তাই খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। যাক, আপনার দেখা নেই—বেড়ানো বন্ধ করে দিলেন কেন? শরীর খারাপ?

না না, কিশোরীবাবু মাথা নাড়লেন, আমি ভালো আছি

তাহলে চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক—আমার গিন্নীই বললে, ভদ্রলোকের কি হল একবার দেখে এসো।

বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই। বলে কিশোরীবাবু নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে

পড়লেন। প্যান্ট পরতে পরতে ভাবলেন রসময়বাবু রসভঙ্গ করলেন। কত বছর পরে মনোরমার মুখোমুখি বসে তিনি কথা বলছিলেন। শুনছিলেন মনোরমার আনন্দময়ীতে রূপান্তরিত হবার কাহিনী। রসময়বাবু বাদ সাধলেন। কিন্তু উপায় নেই। পৃথিবীতে সব সময় সব কিছু নিজের ইচ্ছামত হয় না।

দরজা বন্ধ করে কিশোরীবাবু বাইরে বের হয়ে দেখলেন রসময়বাবু নেই। বোধ হয় নেমে গিয়েছেন। কিশোরীবাবু নেমে এলেন।

জানকীবাবু বিরাট খাতায় কি লিখছিল। কিশোরীবাবুকে দেখে বলল, আপনার বন্ধু এগিয়ে গিয়েছেন। রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

কিশোরীবাবু গেট বরাবর গিয়ে দেখলেন রসময়বাবু আর তাঁর স্ত্রী রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। কিশোরীবাবু কাছে যেতে রসময়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, অনেকক্ষণ স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি মনে হতেই নেমে এলাম মশাই। স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস নেই। কোন জাঁদরেল চেঞ্জারের হাত ধরে কেটে পড়লেই সর্বনাশ। রসময়বাবু নিজের রসিকতায় হেসে উঠলেন।

কিশোরীবাবুর হাসি এলো না। স্পষ্ট দেখলেন রসময়বাবুর স্ত্রী রসময়বাবুকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, দিন দিন কমছে বয়স!

এবার আর সুবর্ণরেখার ধারে নয়, তিনজনে সোজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। বেশ কিছুটা যাবার পর লেভেল ক্রশিং পার হয়ে চললেন। এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিলেন। কেউ কোন কথা বলেননি। কিছুটা এগিয়ে রসময়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, জায়গাটা কেমন লাগছে? শরীরের কিছু উপকার পেলেন?

কিশোরীবাবু উত্তর দিলেন, ভালোই তো আছি। কলকাতায় এতটা হাঁটবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। এখানে তো বেশ হাঁটছি।

রসময়বাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, এই দেখুন ঘাটশীলা কলেজ।

ফুলডুংরি যাবার পথে কিশোরীবাবু এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন। রসময়বাবুদের সঙ্গেই। মোটরে যাবার জন্য ভালো করে সব কিছু লক্ষ্য করতে পারেননি।

আর এটা তো দেখেছেন—রসময়বাবু বাঁদিকে আঙুল দেখালেন, বিভূতিবাবুর স্মৃতিসদন।

রসময়বাবুর কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এলো। এতক্ষণ তিনজনের কেউ দেখেননি। কখন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ জমেছে। জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক।

সর্বনাশ! রসময়বাবুর স্ত্রী চেঁচিয়েই বলে ফেললেন।

কিশোরীবাবু পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথায় বাঁধলেন। একটু ঠাণ্ডা

হাওয়াতেই তাঁর শরীর খারাপ হয়, আর এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলে কি হবে ভেবেই শঙ্কিত হলেন। তিনজনে একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বিশেষ সুরাহা হল না। পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ধারা বেশ ভিজিয়ে দিল।

রসময়বাবু বললেন, চলুন, ওই স্মৃতিসদনে গিয়ে দাঁড়াই।

কিশোরীবাবু মৃদু আপত্তি তুললেন, কিন্তু যেতে যেতেই যে ভিজে যাব।

এখানেই কি আর শুকনো আছি।

অগত্যা রসময়বাবু আর তাঁর স্ত্রীর পিছন পিছন কিশোরীবাবুও পা চালালেন। এ বয়সে ছোটা সম্ভব নয়। তবুও যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করলেন। ওটুকু যেতেই ভিজে একেবারে ঢোল।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই, বরং বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব। রসময়বাবুর পরণে ধুতি। তিনি কোঁচাটা খুলে গা মাথা মুছে নিলেন। কিশোরী-বাবুর সে সুবিধা নেই। তিনি রুমাল দিয়েই যতটা সম্ভব মাথা আর গা মুছে নিলেন। রসময়বাবুর স্ত্রী ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিশোরীবাবু মনে মনে প্রকৃতির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই ঝড় বৃষ্টিটা একটু আগে এলে কত ভালো হত। রসময়বাবু পান্থনিবাস আসতে পারতেন না। তাঁকেও বের হতে হত না। বসে বসে তিনি মনোরমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। এত বছর ধরে কত কথা জমে আছে।

এক সময় বৃষ্টি থামল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর। পাহাড়ী জায়গায় যতই বৃষ্টি হোক, জল দাঁড়ায় না। বৃষ্টি থামার একটু পরেই সব শুকনো খটখট। রসময়-বাবু বললেন, চলুন, এবার হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোই।

উত্তরে কিশোরীবাবু গোটা দুই হাঁচলেন। প্রচণ্ড জোরে।

বরাত ভালো বলতে হবে। কিছুটা এগোতেই দুটো সাইকেল-রিক্শা দেখা গেল। একটাতে সস্ত্রীক রসময়বাবু, আর একটায় কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন।

যেতে যেতে কিশোরীবাবু আরও গোটা দুয়েক হাঁচলেন। লক্ষণ খারাপ। তার মানে সর্দি হয়েছে। সর্দি থেকে জ্বর হতে কিশোরীবাবুর একটুও দেরী হয় না। কিশোরীবাবু কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। ঠিক বুঝতে পারলেন না। শরীর ভিজে। এর মধ্যে উত্তাপ টের পাওয়া সম্ভব নয়।

পান্থনিবাসে ঢুকে রিক্শার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কিশোরীবাবু জানকীবাবুকে বললেন, রাতে আমি কিছু খাব না। একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিতে পারেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করে কিশোরীবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বাথরুমে ঢুকে ভিজে পোশাক ছেড়ে তোয়ালে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গা ঘষলেন।

এবার হাঁচি নয়, কাশি। রীতিমত ঘং ঘং শব্দ। তার মানে ঠাণ্ডাটা বোধ হয় বুকে বসেছে। ভোগাবে। পোশাক বদলে পাতলা একটা কম্বলে গলা পর্যন্ত ঢেকে কিশোরীবাবু শুয়ে পড়লেন। কপালের দু'পাশে টিপ টিপ যন্ত্রণা।

বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে চোখ খুললেন। বাতিটা কিশোরীবাবুই শোবার সময় নিভিয়ে দিয়েছিলেন। চোখে আলো সহ্য হচ্ছিল না বলে। কপালে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন ঠুন আওয়াজ।

কে—মনোরমা ?

না, আনন্দময়ী। এই বয়সে তুমি ভিজে এলে কি বলে ? জানো তো তোমার সর্দির ধাত।

কিশোরীবাবু কোন উত্তর দিলেন না। এত বছর পরে কপালের ওপর নরম হাতের স্পর্শ খুব ভালো লাগছে।

শোন, আমি ধনুয়াকে দিয়ে এক গামলা গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাতে পা ডুবিয়ে বসে থাক। আর শুধু গরম দুধ খেয়ে সারাটা রাত কাটাবে ? কয়েকটা গরম লুচি ভেজে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আলু ভাজা দিয়ে খেয়ে নিও।

কিশোরীবাবু এক অদ্ভুত কাজ করলেন। বয়স, পরিবেশ সব ভুলে কপালের ওপর রাখা মনোরমার হাতটা নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরে বললেন, না, তুমি থাক। তুমি চলে যেও না।

মনোরমার হাতটা কেঁপে উঠল। ঠিক কিশোরীবাবুর গালের ওপর গরম জলের একটা ফোটা পড়ল।

তুমি কাঁদছ মনোরমা ?

ছাড়, আসছি। হাতটা তুলে নিয়ে মনোরমা দ্রুত বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ধনুয়া গামলায় গরম জল নিয়ে ডাকল, বাবু।

কিশোরীবাবু জেগেই ছিলেন। বললেন, উঁ !

ধনুয়া গামলাটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল তারপর গামলাটা খাটের কাছে রেখে বলল, গরম জল।

কিশোরীবাবু উঠে এদিক ওদিক দেখলেন। না, ধনুয়া একলাই। ধারে কাছে আর কেউ নেই। ধনুয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না ভেবে কিশোরীবাবু আস্তে আস্তে পা দুটো গামলায় নামিয়ে দিলেন। জল খুব গরম নয়, পা ডোবাতে কোন অসুবিধা হল না।

কিশোরীবাবুর মনে পড়ে গেল। অনেক বছর আগে কলকাতায় তুমুল বৃষ্টি।

সব রকমের যানবাহন বন্ধ। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে কিশোরীবাবু অফিসের আরও কয়েকজনের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলেন। রাস্তায় কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও আরও বেশী। প্যান্ট গুটিয়ে, ছাতা থাকা সত্ত্বেও কিশোরীবাবু যখন বাড়ি পৌঁছেছিলেন, তখন আপাদমস্তক ভেজা।

তখন অমিয় বেশ ছোট। তাকে কোলে নিয়ে মনোরমা বারান্দায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিশোরীবাবু ফিরতে তাঁর গা-মাথা মুছিয়ে দিয়ে এই রকম গরম জলে পা ডোবাবার ব্যবস্থা করেছিল। জলে নুনও ছিল। কিশোরীবাবু আশ্চর্য উপকার পেয়েছিলেন। একটু সর্দি-কাশি নয়, জ্বর-জারি না, পরের দিন একেবারে ঝরঝরে শরীর।

গরম জলে উপকার হয়তো হবে। সেকথা নয়, গরম জলটা মনোরমা নিজে আনলেই তো পারত। কিংবা ধনুয়া জল আনত, সঙ্গে মনোরমা এসে দাঁড়াত।

সে-ই পা ডোবাবার নির্দেশ দিত।

হয়ে যেতে ধনুয়া গামলাটা নিয়ে বাইরে চলে গেল। কিশোরীবাবু কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়লেন। মনোরমা বোধ হয় আর আসবে না। কিশোরীবাবুর কাছে আসা ছাড়াও এখন তার অনেক কাজ আছে। আজকের আনন্দময়ীর মধ্যে পুরোনো দিনের মনোরমাকে খুঁজতে যাওয়াই ভুল হয়েছে।

···নাও, ওঠ। কিশোরীবাবুর মনে হল স্বপ্নে কেউ কথা বলছে।

কি হল?

কিশোরীবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। না, স্বপ্ন নয়। খাটের একটু দূরে মনোরমা দাঁড়িয়ে।

খেতে দিয়েছি। এখনও গা গরম আছে নাকি?

কি আশ্চর্য, গা গরম কি না সেটা কিশোরীবাবু বলবেন? রোগী কখনও গায়ের তাপ নিজে বুঝতে পারে? তখনকার মতন তাঁর গায়ে হাত দিয়ে কি মনোরমা দেখতে পারে না? নাকি, মনোরমা সাবধান হয়ে গেছে। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আর নয়। একটু চুপ করে থেকে কিশোরীবাবু বললেন, আজ আর কিছু খাব না ভাবছি। তাঁর কণ্ঠে পুঞ্জিত অভিমান।

মনোরমা মুচকি হাসল, তুমি ঠিক আগের মতনই ভীতু আছ। কি হয়েছে কি যে খাবে না। ওঠ।

ভীতু শব্দটা কিশোরীবাবুর বুকের তারে সজোরে আঘাত করল। এ কথাটার কি মনোরমা গূঢ়তর কোন অর্থের ইঙ্গিত করছে। অনেক আগে ভয়ে স্ত্রীকে বাড়ি ছাড়ার আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কিসের ভয়? লোকের ভয়? সমাজের? কিন্তু

লোক বা সমাজের ঘটনাটা জানবার কোন অবকাশ ছিল না। তাহলে কি ঠুনকো বিবেকের ভয় ? তাছাড়া আর কি!

নিজের মনকে বোধ হয় কিশোরীবাবু সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলেন। এমন অপবিত্র নারীকে নিয়ে ঘর করলে কিশোরীবাবুর পরকাল নষ্ট হবে। অলীক এক চিন্তায় বর্তমানের সুখ সুবিধা তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এসো, এসো। এবার মনোরমার কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর।

কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন। হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসলেন। থালায় গোটা কয়েক ফুলকো লুচি। আলুভাজা। বাটিতে ডিমের তরকারি। কিশোরী-বাবুর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য

রাঁধুনিকে হাত দিতে দিইনি। আমি নিজে করেছি। আমার ছোঁয়া তুমি এখন খাবে কিনা জানি না।

ছিঃ! মুখ তুলেই কিশোরীবাবু আর মুখ নামাতে পারলেন না।

সলজ্জ কণ্ঠে মনোরমা প্রশ্ন করল, কি দেখছ ?

তুমি চশমা নিয়েছ ?

মনোরমা হেসে চশমাটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, হিসাব দেখার সময় চশমা ব্যবহার করতে হয়। তারপর একটু থেমে বলল, কেন, বয়স কি শুধু তোমারই হয়েছে, আমার হয়নি ?

কিশোরীবাবু আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খেতে শুরু করলেন। খাওয়ার পর তাঁর খেয়াল হল লুচি নিঃশেষ, আলুভাজা একটাও অবশিষ্ট নেই, ডিমের বাটি পরিষ্কার। কিশোরীবাবু লজ্জিত হলেন। কৈফিয়তের সুরে বললেন, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে।

রেকাবিতে হরিতকির কুচো এগিয়ে দিয়ে মনোরমা বলল, নাও।

হরিতকির টুকরো হাতে তুলে নিয়ে কিশোরীবাবুর ভয় হল। এবার মনোরমা হয়তো চলে যাবে। তাই কিশোরীবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, একটু বসবে না ?

আমার কখনও বসলে চলে ? ঠাকুর-চাকররা খায়নি এখনও। তারপর জানকী-বাবু আলমারির চাবি দিয়ে যাবেন। তুমি দরজাটা দিয়ে দাও। আমি চলি। মনোরমা যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, দরজাটা একটু পরে দিও। ধনুয়া বাসন-গুলো নিয়ে যাবে। বলে মনোরমা আর দাঁড়াল না।

কিশোরীবাবু কি ভুল শুনলেন ? মনোরমার কণ্ঠে যেন আর্দ্রতার সুর। যতই সে ব্যস্ততার ভান করুক, তার অন্তরের নিঃস্বতাই যেন ঝরে পড়ল।

কিশোরীবাবুর নিজের ওপরই রাগ হল। চিরদিনই তিনি কাপুরুষ। পৃথিবীর

আর সকলে যখন বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে চলেছে নিজেদের পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে, তখন তিনি সন্ত্রস্ত পায়ে রাজপথের একেবারে পাশ দিয়ে দুরু দুরু বুকে হেঁটে চলেছেন। ভাবটা যেন সকলে লক্ষ্যে পেঁছে যাক, তারপর এক সময়ে তিনি শম্বুক গতিতে পথের শেষে হাজির হবেন।

কেন জোর গলায় দাবী করতে পারেন না, মনোরমা, তুমি আবার আমার সংসারে ফিরে চল। আজ তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। অমিয় আর মীনাকে বোঝাবার ভার আমার ওপর। তারা যদি ইতস্তত করে তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি অন্য কোথাও বাসা বাঁধব। যৌবনে যে ভুল করেছি, বার্ধক্যে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু মনোরমা কি পারবে যেতে? তার পায়ে দায়িত্বের হাজার নিগড়। আনন্দময়ীর পোশাক খুলে ফেলা তার পক্ষে সহজ নয়।

অনেক রাত অবধি কিশোরীবাবু পায়চারি করলেন। দেহে তাপ নেই, কিন্তু সব দাহ মাথায় এসে জমেছে। জানলায় এসে দাঁড়ালেন। নীচে থেকে বাসন মাজার শব্দ আসছে। ঝি-চাকরের চাপা গলায় কথাবার্তা। বোর্ডারদের কামরা অন্ধকার। বাইরের লনে আলোর রেখাও নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল কিশোরীবাবুর চোখে ঘুম নেই।

মনে হল এখানে এই ঘাটশীলায় না এলেই যেন ভালো ছিল। তাহলে আর মনোরমার সঙ্গে দেখা হত না। মনোরমার অধ্যায়টা চাপাই পড়ে গিয়েছিল। অমিয় আর মীনা জানত মনোরমা এ সংসারে নেই। মীনা তো জানতই না, কেবল শুনেছে এ সংসারে একদিন যে বাড়ির কর্ত্রী ছিল, তার নাম মনোরমা।

অমিয়র বয়স যখন সাত, তখন শান্তিপুরে নিজের বাপের সেবা করতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে চিরদিনের জন্য চোখ বুজেছিল।

মনোরমার কথা অমিয়রও নিশ্চয় ভালো করে মনে নেই। একটা সাত বছরের ছেলের আর কতটুকু মনে থাকতে পারে। দুজনেরই সম্বল দেয়ালে টাঙানো মনোরমার যৌবনের একটা ফটো। অমিয়র অন্নপ্রাশনের দিন কিশোরীবাবুর অফিসের এক বন্ধুর তোলা। মনোরমা চলে যাবার পর সমস্ত ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য কিশোরীবাবুই ফটোটা এনলার্জ করে টাঙিয়ে রেখেছিলেন।

অমিয়র বিয়ের বেশ ক'দিন পর অফিস থেকে বাড়িতে পা দিয়েই কিশোরীবাবু চমকে উঠেছিলেন। মনোরমার ফটোতে একটা বেলফুলের মালা ঝোলানো। কিশোরীবাবুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। হয়তো মনোরমা আর নেই, কিন্তু জোর করে কিছু বলা যায় না। যদি মনোরমা বেঁচে থাকে তাহলে এভাবে ফটোতে মালা ঝোলানো ঠিক নয়।

তখনই কিছু করতে পারেননি। ফটোটা তাঁর শোবার ঘরেই ছিল। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মালাটা ফটো থেকে খুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এখন নতুন করে কি ভাবে তিনি অমিয় আর মীনাকে জানাবেন তোমাদের মা মরেনি। আমিই তাকে ত্যাগ করেছিলাম। এই তোমাদের মা। পান্থনিবাসের আনন্দময়ী দেবী।

কি জানি ওরা বিশ্বাস করবে কিনা। বিশ্বাস করলেও কিশোরীবাবুকে হয়তো অবিশ্বাস করবে। ভাববে এত বড় সত্যটা যে চেপে রাখতে পারে, তার অসাধ্য কিছু নেই।

মনোরমার সঙ্গে দেখা হল পরের দিন দুপুরে। খাওয়া-দাওয়ার পর কিশোরী-বাবুর মনে পড়েছিল দু'দিন হল অমিয়র চিঠি এসে পড়ে আছে, শরীর খারাপের জন্য উত্তর দেওয়া হয়নি। একটা পোস্টকার্ড নিয়ে কিশোরীবাবু উত্তর লিখলেন। চিঠি লেখার অভ্যাস তাঁর নেই। চিঠি লেখার প্রয়োজনই হয়নি। এখন এই ঘাটশীলায় এসে চিঠি লিখতে হচ্ছে।

পোস্টকার্ডে কিশোরীবাবু জানিয়ে দিলেন শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, সেই-জন্য সময়মত উত্তর দিতে পারেন নি। লেখা শেষ হলে কিশোরীবাবু উঠে দরজার পাশের বোতাম টিপলেন। ধনুয়াকে পোস্টকার্ডটা ডাকে দিতে বলবেন। কিশোরী-বাবু বেড়াতে যাবার সময় ডাকে দিলে চিঠি আজ যাবে না।

পোস্টকার্ডটা কিশোরীবাবু আর একবার পড়তে লাগলেন। তাঁর প্রচুর বানান ভুল হয়। বাংলা ভাষাটাই গোলমেলে। দরজার শব্দ হতে কিশোরীবাবু পোস্ট-কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ধনুয়া, এটা ডাকে ফেলে এসো তো।

দিন বাবু। গলার স্বরে আর হাসির শব্দে মুখ তুলেই কিশোরীবাবু বিব্রত হলেন—এ কি তুমি! আমি ভেবেছিলাম ধনুয়া।

ঠিক আছে, তুমি দাও না আমাকে। আমি ফেলার ব্যবস্থা করব।

কিশোরীবাবু পোস্টকার্ডটা মনোরমার হাতে তুলে দিলেন।

কাকে লিখলে? খোকাকে?

হ্যাঁ, পড়ে দেখ না।

পড়বার আমার দরকার নেই। খোকা বৌমা সব ভালো আছে তো?

কিশোরীবাবু উত্তর দেবার আগেই মনোরমা প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল, খোকাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।

আর বৌমাকে?

বৌমাকে তো কোন দিন দেখিনি। তার ওপর মমতা ততটা হয়নি, কিন্তু নিজের

জিনিস তো। কৌতূহল একটা হয় বৈকি।

কিশোরীবাবু কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে মনোরমাকে দেখলেন। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হল। আজ তাঁর জন্যই সংসার এ রকম দুভাগ হয়ে গেছে।

মনোরমা এক দিকে আর সংসার এক দিকে। সবচেয়ে কষ্ট তো কিশোরীবাবুর। অমির মাকে ভুলে গেছে। জীবনে নতুন সঙ্গিনী পেয়ে অনেক বছর আগে হারানো মায়ের কথা আর মনেই পড়ে না। তাছাড়া সে তো জানেই মা-র পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। নির্মম সত্যটা একমাত্র কিশোরীবাবুর জানা।

শরীর এখন কেমন ?

ভালো। তোমার কথা পুরো তো শোনা হল না।

ও আর কি শুনবে। বলবার মতন কি আর আছে।

তবু এ হোটেলের মালিক হলে কি করে ? এ তো অনেক টাকার ব্যাপার।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মনোরমা বসল। দুটো হাত রাখল টেবিলের ওপর।— সবই সম্ভব হয়েছে গিন্নীমার কৃপায়। শেষ জীবনে তিনি বাতে একেবারে শয্যা-শায়ী। সব কিছুর দেখা-শোনা আমাকেই করতে হত। মারাও যান এ বাড়িতে। মরবার আগে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তোমার উপকার ভোলবার নয়। তুমি যা করেছ, তা আমার নিজের বোন থাকলেও বোধ হয় করত না। আমি না থাকলে তোমার কি হবে ভাবছি। আবার কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াবে। এই সব ভেবে আমি আমাদের এটর্নীকে দিয়ে এই বাড়িটা তোমার নামে দানপত্র করে দিয়েছি। একটা ঘর হলেই তোমার চলে যাবে। বাকি ঘরগুলো ভাড়া দিলে একটা পেট খুব চলে যাবে। সেই থেকে আমি এ বাড়ির মালিক।

মনোরমা হাসতে গিয়েও পারল না। দুটো চোখ চিক চিক করে উঠল। তার অন্তরের বেদনা বুঝতে কিশোরীবাবুর অসুবিধা হল না। মনোরমার চির-দিনই সংসার-সর্বস্ব। স্বামী পুত্র জড়িয়ে সংসার করাতেই তার সুখ।

নাও, তুমি শোও। আমি উঠি। মনোরমা উঠে দাঁড়াল।

এই নির্জন ঘরে বসে বসে মনোরমার সঙ্গে কথা বলতে কিশোরীবাবুর ভারি ভাল লাগছিল। মনোরমা উঠে দাঁড়াতেই কিশোরীবাবু বললেন, এখনই যাবে কেন ? তুমি তো জানো দুপুরবেলা আমি ঘুমুই না। বস না আর একটু।

মনোরমা মুখ ফিরিয়ে নিল। বোধ হয় উদ্গত অশ্রু ঢাকবার জন্যই। তারপর কিশোরীবাবুর দিকে ফিরে সহজ কণ্ঠে বলল, বা রে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করলেই আমার পেট ভরবে ? খাওয়া-দাওয়া করব না—

কিশোরীবাবু অপ্রস্তুত হলেন।—তোমার এখনও খাওয়া হয়নি। বেশ বেলা হয়েছে।

এইবার খাব। খাবার সময় মনোরমা পোস্টকার্ডটা তুলে নিয়ে গেল।

মনোরমা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কিশোরীবাবু একভাবে বসে রইলেন। অজস্র চিন্তার জাল তাঁকে আচ্ছন্ন করে রইল। ঘাটশীলায় চিরদিন তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। একদিন তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। শীত কিশোরীবাবুর সহ্য হয় না। শীত পড়তে শুরু করলেই তাঁকে পালাতে হবে।

এতদিন এক রকম ছিল। ইদানিং কিশোরীবাবুর নিজেরই মনে হয়েছিল মনোরমা আর বেঁচে নেই। রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা গেছে, কিংবা তার চেয়েও যা স্বাভাবিক, অভিমানিনী মনোরমা আত্মহত্যাই করেছে। কিন্তু মনোরমা রয়েছে। শুধু তাঁর স্মৃতিতেই নয়, রক্ত-মাংসের দেহে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে কি কিশোরীবাবু শান্তি পাবেন? কলকাতার বাড়িতে তিনি ভীষণ রকম একলা। সারাটা দিন আর কাটতেই চায় না। এবার তো সে নিঃসঙ্গতা আরও দুঃসহ হয়ে উঠবে।

কিশোরীবাবু আস্তে আস্তে উঠে বিছানার ওপর বসলেন। বাইরে রোদ নেই। মৃদু হাওয়া বইছে। কিশোরীবাবুর একবার ইচ্ছা হল পোশাক পাল্টে বের হয়ে পড়বেন। সুবর্ণরেখার ধার দিয়ে এই আবহাওয়ায় হাঁটতে ভালোই লাগবে। কিন্তু এভাবে দুপুরবেলা বেড়াতে বেড় হলে লোকে কি বলবে! তাছাড়া কতক্ষণই বা বেড়াবেন।

কিশোরীবাবু শুয়ে পড়লেন। চোখ দুটো খোলাই রাখলেন। কি জানি, খাওয়া-দাওয়া সেরে মনোরমা যদি উঁকি দেয়। চোখ বন্ধ দেখে ঘুমন্ত মনে করে ফিরে যায়। কিশোরীবাবু উঠে বসলেন। আচ্ছা অস্বস্তিকর অবস্থা!

বেলা পড়ে এলো। মনোরমা এলো না। ধনুয়া বিকেলের চা-বিস্কুট নিয়ে এসে যখন টেবিলের ওপর রাখল, তখন কিশোরীবাবুর পোশাক পরা হয়ে গেছে।

ধনুয়া—

বলুন বাবু।

একটু ইতস্তত করে কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, মাইজী কোথায়?

মাইজী ভাঁড়ারে। ডেকে দেব?

ধনুয়াও জেনে গেছে মাইজীর সঙ্গে কিশোরীবাবুর একটা সম্পর্ক আছে। নয়তো মাইজী সাধারণত কোন বোর্ডারের কামরায় যান না। ইচ্ছা হলে ঝাড়ামোছার সময় কিংবা কোন মেয়েছেলের অসুখ-বিসুখ হলে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এ বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই চেয়ারে বসে গল্প করেন।

কিশোরীবাবু হাত বাড়ালেন।—না না, ডাকতে হবে না। কাল সকালে দেখা করব—বলে কিশোরীবাবু চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

*   *   *

বিকালে বেড়াতে বেড়িয়ে কিশোরীবাবু প্রথমে রসময়বাবুর বাড়ি গেলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভিজেছিলেন। একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। বাড়ির সামনে এসে বাইরে কাউকে দেখা গেল না। একটু এগিয়ে কিশোরীবাবু ডাকলেন, রসময়বাবু।

পাশের দরজা দিয়ে রসময়বাবু বের হয়ে এলেন।—আরে আসুন।

আপনারা সব ভালো আছেন তো?

আমি ভালো আছি, কিন্তু গিন্নী কাত।

সে কি!

হ্যাঁ, বুকে সর্দি জমেছে। সারা রাত ঘুম নেই, কাশছে। ভাবছি কলকাতায় চলে যাব। ও কবিরাজী চিকিৎসায় ভালো থাকে। আমাদের গলিতেই হারাণ কবিরাজ থাকেন। তাঁর কয়েক পুরিয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আপনারা চলে যাবেন?

কি করি বলুন, গিন্নী আর থাকতে চাইছে না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে কিশোরীবাবু চলতে আরম্ভ করলেন। রসময়বাবু বসতে বললেন না। বোঝা গেল স্ত্রীকে নিয়ে তিনি খুবই বিব্রত।

কিশোরীবাবু একলাই সুবর্ণরেখার পাশে গিয়ে বসলেন। রসময়বাবুরা চলে যাবেন শুনে তাঁদের বাড়ি থেকে বের হয়েই কিশোরীবাবুর মন একটু খারাপ হয়েছিল। তবু বিদেশে একজন সঙ্গী ছিল। রসময় দম্পতিকে তাঁর ভালোও লেগেছিল। এবার থেকে তাঁকে একলা একলা বেড়াতে হবে।

সুবর্ণরেখার পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কিশোরীবাবুর মন অনেকটা হালকা হয়ে গেল। এ এক রকম ভালোই হল। মনোরমার সঙ্গে সুযোগ সুবিধা পেলে নির্ঝঞ্ঝাটে কথা বলা যাবে। রসময়বাবুর এসে পড়ার ভয় থাকবে না। চিন্তাটা হয়তো একটু স্বার্থপরের মতন হল। কিন্তু এত বছর পরে মনোরমাকে কাছে পেয়ে কিশোরীবাবু একটু বুঝি লোভীই হয়ে উঠেছেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ওপরে বারান্দায় পা দিয়ে কিশোরীবাবু দেখলেন, তাঁর কামরার সামনে চেয়ারে মনোরমা। কিশোরীবাবু কাছে যেতেই মনোরমা বলল, এত রাত কর কেন? এই সময়টা এখানে সন্ধ্যার দিকে ঠাণ্ডা পড়ে।

কিশোরীবাবু কব্জি ঘড়িটা দেখে বললেন, রাত আর কোথায়? সাতটা বাজে।

সাতটাই বা হবে কেন? চারটেয় বেরিয়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসবে।

কিশোরীবাবু কোন উত্তর দিলেন না। বকুনি খাওয়া ছাত্রের মতন মাথা নীচু

করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনোরমা বলেই চলল, তোমার ধাত তো আমার অজানা নয়। একটু অনিয়ম সহ্য করতে পারো না। একটু পরেই গলার স্বর বদলে মনোরমা জিজ্ঞাসা করল, কি—ডেকেছ কেন ?

ডেকেছি ?

হ্যাঁ, ধনুয়া যে গিয়ে বলল তুমি খোঁজ করছিলে।

কিশোরীবাবুর মনে হল কথার শেষে মনোরমার দু' ঠোঁটের প্রান্তে যেন হাসির ঝিলিক। সে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে হাসি চাপল। কিশোরীবাবু চাবি দিয়ে দরজা খুলে বললেন, এসো, ঘরের মধ্যে এসো।

মনোরমা মাথা নাড়ল, না না, ঘরের মধ্যে যাব না। এখানেই বস। ওই কোণের ঘরে একটি বৌ দুপুর থেকে বমি করছে। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তারেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

কিশোরীবাবু বারান্দায় চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, দেখা করে যাই না শাসন করে যাই ?

মনোরমা এবার আর হাসল না। বরং গম্ভীর গলায় বলল, শাসন করব এমন জোর তো আমার নেই।

কেন—কোন সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে ? কিশোরীবাবুর আর্তকণ্ঠ বাতাসে কাঁপন তুলল।

হয়তো একদিন ছিল, আজ নেই। এ এমন একটা সম্পর্ক যে একবার ছিঁড়ে গেলে আর জোড়া যায় না। অথচ তুমি তো জানো আমার কোন দোষ ছিল না।

কিশোরীবাবু তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। মনোরমার অভিযোগ এত সত্যি যে দেবার মতন কোন উত্তর নেই। অনেকক্ষণ পরে কিশোরীবাবু স্তিমিত কণ্ঠে বললেন, আমি ভুল করেছিলাম মনো। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বারান্দা এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। বাতি জ্বালানো হয়নি। মনোরমা উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। বাতি জ্বালিয়ে আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলল, যাও তুমি বিশ্রাম কর। আমার এখনও পুজো সারা হয়নি।

কিশোরীবাবু ঘরে ঢুকলেন। বাতি জ্বালালেন না। অন্ধকারই তাঁর আশ্রয় বলে মনে হল। জুতো খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বোঝা গেল মনোরমার মনে অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। সাধের সংসার থেকে তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এমন একটা অপরাধের জন্য, যার জন্য মনোরমাকে মোটেই দোষী করা যায় না। এমন অনেক পুরুষ আছে, যারা বিয়ের আগে নিয়মিত পতিতালয়ে গেছে, বিয়ের পর জানাজানি

হয়ে গেলেও নির্বিবাদে তারা সংসার করছে। স্ত্রীদের দিক থেকে কোন আপত্তি ওঠেনি। মুখে আমরা যতই স্ত্রী স্বাধীনতার বড়াই করি এদেশের বেশির ভাগ স্ত্রীরা এখনও ক্রীতদাসীর যুগ পার হয়নি।

কিশোরীবাবু মন ঠিক করে ফেললেন, এবার মনোরমাকে তিনি স্পষ্ট বলবেন, তুমি আবার আমার সংসারে ফিরে এসো। আমাকে আমার কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমার ছেলে, ছেলের বউ যদি গররাজী হয়, তাহলে আমরা দুজন কোন তীর্থস্থানে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

পরের দিন সকালে ধনুয়া যখন চা দিতে এলো কিশোরীবাবু মরীয়া হয়ে বলেই ফেললেন, তোমার মাইজী এখন খুব ব্যস্ত, না?

ধনুয়া উত্তর দিল, মাইজী তো সব সময়েই ব্যস্ত। একটা না একটা কাজ নিয়েই আছেন। কেন বলুন তো?

মাইজীর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। দুপুরের দিকে যদি একবার আসেন—

ধনুয়া চলে যেতে চা-পান শেষ করে কিশোরীবাবু বেরিয়ে পড়লেন। সাবান টুথপেস্ট, টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনার আছে।

বাজারের দিকে যাবার সময় কিশোরীবাবু রসময়বাবুর বাড়ির দিকে দেখলেন। বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। তার মানে রসময়বাবুরা চলে গেছেন। হয়তো আজ সকালের ট্রেন ধরেছেন। কিশোরীবাবুর মনে হল, তিনি একবার স্টেশনে গেলে পারতেন। রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে রসময়বাবু হয়তো মুস্কিলে পড়েছেন। তার-পর ভাবলেন, রসময়বাবু এখানে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁকে সাহায্য করার লোকের অভাব হবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিশোরীবাবু বিছানায় শুলেন, কিন্তু ঘুমালেন না। বাজার থেকে ফেরার সময় একটা খবরের কাগজ কিনে এনেছিলেন, সেটাই চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরেই খেয়াল হল কাগজের একটি লাইনও মাথায় ঢোকেনি, মন বাইরে একজনের পায়ের শব্দের অপেক্ষায় উন্মুখ।

কিন্তু মনোরমা এলো না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। রোদের তেজ ম্লান হয়ে এলো। গাছের ছায়া দীর্ঘতর। কিশোরীবাবু একবার ভাবলেন, ধনুয়া কি কথাটা বলতে ভুলে গেল? তা সম্ভব নয়। তাহলে হয়তো মনোরমা ইচ্ছা করেই আসেনি। কিশোরীবাবুকে সে মন থেকে ক্ষমা করতে পারেনি।

ঠিক আছে, কিশোরীবাবুও আর এখানে থাকবেন না। থাকতেও তিনি আসেননি। চলে যাওয়াটা তো মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।

মনে পড়ে গেল মনোরমা বলেছিল, সকাল সকাল বেড়িয়ে ফেরা উচিত। না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবার সম্ভাবনা। কিশোরীবাবু উঠে ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা বেজে গেছে। এখন সেজেগুজে বের হতে পাঁচটা পনেরো হয়ে যাবে। তা হোক। মনোরমা যখন তাঁর কথা রাখেনি তখন তিনিই বা কেন মনোরমার কথা শুনতে যাবেন। কিশোরীবাবু পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে বারন্দুরেক ফিরে দেখলেন। না, কোন জানলায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

সুবর্ণরেখার ধারে কিশোরীবাবু উল্টোদিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন রেললাইন পার হয়ে মেঠো পথ ধরে। এদেশী লোকদের কুঁড়ে। ছিমছাম পরিষ্কার। দাওয়ায় আলপনা আঁকা। উঠানে খাটিয়া পাতা। মুরগীর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। কোন পরব কিনা কে জানে।

কিশোরীবাবু যখন ফিরলেন তখন সাতটা। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। রুমালটা কিশোরীবাবু গলায় বেঁধে নিয়েছিলেন। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। ঠিক যখন কিশোরী-বাবু ওপরে ওঠবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, দোতলার একটা জানলা বন্ধ হবার আওয়াজ হল। মনোরমা বোধ হয় তাঁর ফেরা লক্ষ্য করল। কিশোরীবাবুর তাই যেন মনে হল।

ধনুয়া রাতের খাবার নিয়ে এলো রোজকার মতন। বলবেন না ভেবেও কিশোরী-বাবু বলে ফেললেন, মাইজীকে আমার কথাটা বলেছিলে ?

থালা রেখে ধনুয়া চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, বলেছি বাবু, তখনই গিয়ে বলেছি।

মনোরমা যে আসেনি সেটাও বোধ হয় ধনুয়ার জানা। তাই সে বলল, দু' নম্বরে বোর্ডার আসার কথা। প্রত্যেক বছরই আসে। কলকাতা থেকে টানা মোটরে। ঘরদোর ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হয়। বাড়তি টেবিল চেয়ার, খাট দিতে হয় ঘরে। সেই সবের জন্য মাইজী ব্যস্ত ছিলেন।

আর একটি কথাও না। কিশোরীবাবু মাথা নীচু করে খেতে লাগলেন। রুটি-গুলো শক্ত মনে হল। তরকারি, ভাজা বিস্বাদ। বাড়তি যত্ন আগ্রহ সব বোধ হয় বর্ষিত হয়েছে দু' নম্বর বোর্ডারদের ওপর। খাওয়া ছেড়ে কিশোরীবাবু উঠে পড়লেন। খেতে ভালো লাগল না। জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে কিশোরীবাবু বুঝতে পারলেন ধনুয়া বাসন নিয়ে গেল।

এক সময় উঠে কিশোরীবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজা দেবার সময় উচ্চকণ্ঠের গান ভেসে এলো। বোধ হয় দু' নম্বর বোর্ডাররা পুরো দমে রেডিয়ো খুলে দিয়েছে। হিন্দী গান। মনে মনে ঠিক করলেন, আর নয়, কালই অমিয়কে

চিঠি লিখে দেবেন। সে কিংবা কমল এসে তাঁকে নিয়ে যাক। ঘাটশীলা আর তাঁর ভালো লাগছে না।

পরের দিন দুপুরে কিশোরীবাবু যখন খেতে বসেছেন মনোরমা এসে দাঁড়াল। চুড়ির শব্দ কিশোরীবাবুর কানে এসেছিল, কিশোরীবাবু মুখ তুললেন না।

নাঃ, বয়স হলে কি হবে, তুমি এখনও ছেলেমানুষই আছ। এখন কি আমি তোমার ঘরের বউ আছি, যে যখন ডাকবে হুট করে এসে দাঁড়াব?

এবারেও কোন কথা নয়, কিশোরীবাবু একবার মুখ তুলে মনোরমাকে দেখেই মুখ নামিয়ে নিলেন।

মনোরমা চেয়ার টেনে সামনে বসল।—নতুন বোর্ডার এসেছে, আমার হাঙ্গামা কি কম? এরা আমার বহুকালের খদ্দের। এদের ব্যবস্থা করতেই আটকে পড়েছিলাম। তারপর একটু থেমে মনোরমা বলল, আমি আসতে পারিনি বলেই কাল বুঝি রাত করে ফেরা হল? ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বারি হলে ভুগবে কে—তুমি না আমি? যাক, এই তো এসেছি কি বলবে বল।

কিশোরীবাবুর খাওয়া প্রায় শেষ। জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে বললেন, একটু বস, আমি আসছি।

মুখ হাত ধুয়ে কিশোরীবাবু ফিরে এলেন। মনোরমার এগিয়ে দেওয়া রেকাবি থেকে হরিতকির কুচি মুখে দিয়ে সরাসরি বললেন, তুমি আমার সংসারে ফিরে চল মনো।

প্রস্তাবের আকস্মিকতায় মনোরমা চমকে উঠে বলল, আমি!

হ্যাঁ, আমি বড় একলা।

কিন্তু গেলে তো এই দেহটাকেই নিয়ে যেতে হবে। অপবিত্র দেহটা।

তুমি ওভাবে আর আমাকে কষ্ট দিও না মনো।

খোকা, খোকার বউকে কি বলবে?

যা সত্যি তাই বলব। ওরা আধুনিক ছেলে-মেয়ে, এ সব ব্যাপারে অনেক উদার। যদি ওরা আপত্তিও করে তাহলে তোমাকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। কলকাতা থেকে অনেক দূরে।

মনোরমা কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর আঁকিবুঁকি কাটল, তারপর এক সময়ে বলল আবেগভরা কণ্ঠে, তোমার কথা শুনে খুব লোভ হচ্ছে। সংসার করার সাধ আমার চিরদিনের। কিন্তু তুমি বড্ড দেরী করে ফেলেছ, আরও আগে যদি ডাকতে। তোমার সংসারে সম্মানের আমন্ত্রণ হয়তো

পেতাম না, কিন্তু তোমাকে তো পেতাম।

বাবা!

কিশোরীবাবু চমকে উঠলেন। কিছুটা মনোরমাও। দরজার সামনে অমিয় এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে ছোট সুটকেশ। পিছনে মীনা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ।

দুজনেই মনোরমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কিশোরীবাবু আবাহন করার ভঙ্গীতে বললেন, আয় খোকা। মীনা এসো।

দুজনেই ভিতরে এলো। মীনা কিশোরীবাবুর কাছে এসে বলল, চিঠিতে আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল শুনে যা ভাবনা হয়েছিল। আমিই আপনার ছেলেকে বললাম, চল, আমরা গিয়ে বাবাকে নিয়ে আসি। এখন কেমন আছেন বাবা?

ভালো বলতে গিয়েই কিশোরীবাবু থেমে গেলেন। অমিয় একদৃষ্টে মনোরমার দিকে দেখছে।

কি দেখছিস খোকা?

অমিয় বলল, কি আশ্চর্য বাবা! তোমার ঘরে মা'র যে ফটো আছে তার সঙ্গে এঁর চেহারার কি অদ্ভুত মিল। মা বেঁচে থাকলে বোধ হয় এই রকমই দেখতে হত।

এবার কিশোরীবাবু এগিয়ে এলেন। একটু হেসে বললেন, এসো, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন—

কিশোরীবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনোরমা বলল, আমার নাম আনন্দময়ী দেবী। এই পান্থনিবাস আমারই। আপনাদের মায়ের সঙ্গে চেহারার মিলের কথা প্রথম দিনই আপনার বাবা বলেছিলেন। এই রকম মাঝে মাঝে দেখা যায়। এক রকম চেহারার দুজন মানুষ। আচ্ছা, আমি চলি। একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে আমার। আঁচলটা খসে পড়েছিল। চাবির গোছা বাঁধা আঁচলটা সশব্দে পিঠের ওপর ফেলে মনোরমা দ্রুত পায়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

———

পদ্মের ব্যথা

ঠিক বুকের মাঝখানে তীব্র একটা যন্ত্রণা। মনে হল মর্মমূলে কে যেন তীক্ষ্ণ-মুখ কোন অস্ত্র সবলে গেঁথে দিয়েছে। রক্তক্ষরণে সর্বদেহ অনড়, অবশ। দৃষ্টি-শক্তি ঝাপসা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুরভি অনুভব করল তার একদা সাজানো-গোছানো সংসার, জানলায় দরজায় দামী পর্দা, পালিশ-চকচকে ড্রেসিং টেবিল, স্টীলের আল-মারি, ডবলবেড খাট, হালকা-নীল ডিসটেম্পার করা দেওয়াল—সব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

অথচ কাল পর্যন্ত এই সংসার ঘিরে তার অপরিসীম মোহ ছিল। সংসার আর সংসারের মানুষ সুদেব।

একটা রাতের ব্যবধানে সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

হাতের মুঠোর মধ্যে তখনও চিঠিটা দলা পাকানো অবস্থায় ছিল। ফিকে লাল রংয়ের কাগজ। ঘামে এখন আরও যেন ফিকে মনে হচ্ছে।

বালিশে ভর দিয়ে সুরভি আস্তে আস্তে উঠে বসল। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।

হাতের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল।

না, একটি অক্ষরও বদলায় নি।

কিরীচের মতন প্রতিটি অক্ষর তীক্ষ্ণাগ্র।

সম্বোধনের বালাই নেই।

উদ্যত শলাকার লক্ষ্যস্থল সরাসরি সুরভির মর্মমূলে।

তুমি এভাবে আমাকে প্রতারিত করবে কল্পনাও করি নি। তুমি কুলটার মেয়ে। তোমার সঙ্গে দীর্ঘ দু বছর একসঙ্গে বাস করেছি ভাবত ে ঘৃণা বোধ করছি।

তিন দিন সময় দিলাম এর মধ্যে তুমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে। তুমি না যাওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না।

ছলাকলা দেখিয়ে যেভাবে আমাকে বন্দী করেছিলে, মোহগ্রস্ত আমি আগে তা বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পারছি তা তোমার জীবিকারই সম্পূর্ণ উপযোগী। ছি, এই ধিক্কারবাণী ছাড়া আর কিছু আমার বলবার নেই। সুদেব।

চোখের জলে অক্ষরগুলো ঝাপসা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সুরভি চিঠিটা পড়ল।

কুলটার মেয়ে। সুরভির মা কুলটা। এমন একটা তীব্র অসম্মানের কথা সুদেব কি করে লিখতে পারল! কোন সাহসে!

কাল সন্ধ্যায় অফিসের দরোয়ান চিঠিটা দিয়ে গেল।

সুরভি তখন প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল। কথা ছিল সুদেবের সঙ্গে বাইরে কোন হোটেলে ডিনার সেরে নাইট শো দেখে বাড়ি ফিরবে।

বাড়ির চাকর চিঠিটা নিয়ে দরজার ওপারে দাঁড়িয়েছিল।

মা, সায়েবের চিঠি।

সুরভি ঠিক বুঝতে পেরেছিল, না বের হবার একটা পঙ্গু কৈফিয়ৎ সুদেব পাঠিয়েছে। অফিসে খুব ব্যস্ত। এই রকম একটা অজুহাত।

এসেন্সের স্প্রেটা রেখে দিয়ে সুরভি হাত বাড়িয়েছিল।

কই, দেখি।

চাকর চিঠিটা হাতের ওপর রেখে চলে গিয়েছিল।

নিতান্ত অবহেলায়, কিছুটা আশাভঙ্গের মেজাজে সুরভি চিঠি পড়তে শুরু করেছিল।

প্রথম লাইনটা পড়েই মাথাটা ঘুরে উঠেছিল।

রসিকতা করছে সুদেব ; কিন্তু এমন মর্মান্তিক রসিকতা কেউ করে। এমন ইতর ইঙ্গিত।

আস্তে আস্তে সুরভি বিছানার ওপর উঠে বসেছিল।

মাথার ওপর পাখাটা পুরোদমে ঘুরছে। গরমও এমন কিছু বেশী নয়, তবুও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল সুরভির কপালে।

কেন এমন চিঠি লিখল সুদেব।

রাত আটটায় সুরভির খেয়াল হল। তখনও সে একভাবে বিছানার ওপর বসে আছে। শুধু হাতের চিঠিটা কোন এক সময়ে মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ধরেছে।

সুরভি উঠে দাঁড়াল।

শুধু পায়ের তলার মাটিটুকুই নয়। সর্বশরীর কাঁপছে।

সুরভি প্রায় টলতে টলতে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফোনটা তুলে নিল।

অফিসের নম্বর ডায়াল করল।

কিছুক্ষণ বেজে যাবার পর বুড়ো দরোয়ানের গলার স্বর ভেসে এল।

হ্যালো।

পালিত সায়েব আছেন ?

সুরভির গলার আওয়াজের সঙ্গে দরোয়ান পরিচিত।

মেমসাহেব ?

হাঁ।

পালিত সাব তো পাঁচটার সময় অফিস থেকে চলে গেছেন।

সুরভি ফোন রেখে দিল।

একটু পরে সুরভি ক্যালকাটা ক্লাবে ফোন করল।

না, সুদেব পালিত আজ ক্লাবে আসেন নি।

সুরভি আবার শোবার ঘরে ফিরে এল।

চাকর এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মা, খাবেন না ?

না, খাবার ঢাকা দিয়ে তুমি চলে যাও।

চাকর সরে গেল।

রাত সাড়ে দশটায় ঝি যামিনী সুরভির শোবার ঘরের দরজায় ঠক্ ঠক্ করল।

কে ?

আমি যামিনী মা। এত রাত হয়ে গেল সায়েব তো ফিরলেন না এখনও।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুরভি উত্তর দিল।

তোমাকে বলতে ভুলে গেছি যামিনী। সায়েব কলকাতার বাইরে গেছেন। তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

ধীরে ধীরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু সুরভির দুটি চোখে ঘুম নেই।

একভাবে বিছানার ওপর বসে রইল।

সারাটা রাত একভাবে কাটল।

অন্ধকার তরল হল। একটু পরে আলো ফুটল।

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে সুরভি চুপচাপ বসে।

যামিনী আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মা, কি হয়েছে মা ?

সুরভি চমকে উঠল। আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

মুখে-হাতে জল দিয়ে সুরভি যখন ঘরে ফিরে এল, তখনও যামিনী দাঁড়িয়ে।

মা-র কি শরীরটা খারাপ ?

কে বললে ? না, শরীর ঠিক আছে। তুমি আমাকে এক কাপ চা এনে দাও।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুরভির মনে পড়ল।

এখনই চাকর এসে দাঁড়াবে বাজারের পয়সার জন্য।

কিন্তু এ পরিবেশ সুরভির একেবারেই ভাল লাগছে না। যাকে ঘিরে সব কিছু মধুময় হয়ে উঠত, সে-ই যখন স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে অযথা অপবাদ

দিয়ে, তখন তার সাজানো সংসারে পুতুলের মতন বসে থাকার সুরভির কি অধিকার। তার চেয়ে সুরভি মন ঠিক করে ফেলল। বর্ধমানে মা-র কাছে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে।

সুদেবের অভিযোগের কথা মাকে জানাবে। মা-র সব কিছু জানা দরকার। কারণ এ অভিযোগের আসল লক্ষ্য সুরভির মা।

সুরভির মা কুলটা। তাই সুরভি কুলটার মেয়ে।

চাকরকে বাজারে পাঠিয়েই সুরভি সুটকেস গোছাতে শুরু করল। নিজের শাড়ি-জামা নিল। এখন হয়তো অনেকদিন মা-র কাছে থাকতে হবে। সুদেব স্পষ্ট বলে দিয়েছে এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।

টেবিলের ওপর থেকে নিজের হাতঘড়িটা নিতে গিয়েই সুরভি থেমে গেল।

ফটো-স্ট্যান্ডে দুজনের ফটো। সুরভি আর সুদেব। একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা। বিয়ের আগে তোলা।

ফটো দুটো সুটকেসের মধ্যে রেখেই সুরভি নিজেকে সামলে নিল। না, সুদেবের ফটো নিজের কাছে রাখবার অধিকারও সুরভির নেই। আগে তাকে সুদেবের দেওয়া অপবাদ খণ্ডন করতে হবে।

মা, বাজারের হিসাবটা নিন।

চাকরের গলার আওয়াজে সুরভির খেয়াল হল।

ডালা খোলা সুটকেসের সামনে সে চুপচাপ বসেছিল।

এখন পয়সা থাক তোমার কাছে। পরে হিসাব নেব।

সুরভির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে মিষ্ট সুরে ন'টা বাজল।

ঠিক ন'টায় সুদেবের অফিস শুরু হয়।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরভির চোখ টেলিফোনের ওপর পড়ল।

একবার ফোন করলে হয়। নিজের মুখে যা বলবার সুদেব বলুক। সুরভি শুনতে চায়।

টেলিফোনের মেয়েটি উত্তর দিতে সুরভি মিস্টার পালিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল।

মিস্টার পালিত অফিসের কাজে বম্বে গেছেন। দিন পনেরোর আগে ফিরবেন না। বলতে হবে কিছু। মেসেজ থাকলে বলুন, লিখে তাঁর টেবিলে পাঠিয়ে দেব।

বলার তো অনেক কথা আছে। নিরপরাধ এক মেয়ে অন্যায় অপবাদের উত্তর চায়। এভাবে মিথ্যা অভিযোগ করে জীবনের পথ থেকে তাকে সরিয়ে দেবার কি মানে?

কিন্তু এসব তো আর কাউকে বলা যায় না। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে অচল।

সুরভি ফোন নামিয়ে রাখল।

বিছানায় ফিরে এল। তার আগে টেবিলের ওপর থেকে প্যাড আর পেন নিয়ে এল।

বার তিনেকের চেষ্টায় তিন লাইন লিখল।

কোন সম্বোধন নেই। সম্বোধনের পথ সুদেব রাখে নি।

তোমার এ চিঠির পর কোন ভদ্র তরুণীরই এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। এই দু বছরেই আমাকে তোমার ভাল লাগছে না বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তার জন্য এই রকম মর্মান্তিক অপবাদ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি চললাম।

ইতি

সুরভি।

নিজের নামের আগে সুরভি হতভাগিনী কথাটা লিখেছিল, কিন্তু কি ভেবে শেষ মুহূর্তে সেটা কেটে দিল।

সুটকেস বন্ধ করে সুরভি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

চাকরটাকে সামনে দেখে বলল।

একটা ট্যাক্সি এনে দাও তো।

ট্যাক্সি!

এবার সুরভি ধমক দিল।

তাড়াতাড়ি কর। দেরি হয়ে যাবে।

চাকর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে, সুরভি সুটকেসটা ঘরের বাইরে এনে দরজায় তালা দিয়ে দিল।

তালা দেওয়ার শব্দে রান্নাঘর থেকে যামিনী এসে দাঁড়াল।

মা, বের হচ্ছ?

হ্যাঁ। আমি ক'দিন বাইরে থাকব।

সায়েব যদি আসেন?

আসবেন না। এলেও তাঁর কাছে আলাদা চাবি আছে।

যামিনী একটু থেমে আবার প্রশ্ন করল।

যদি সায়েব এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি বলব মা?

তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি চিঠি লিখে যাচ্ছি।

নীচে মোটরের শব্দ হল। ট্যাক্সি এসে গেছে।

চাকর ওপরে উঠে আসতে সুরভি তাকে বলল।

এই সুটকেসটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও।

সুরভি আর দাঁড়াল না।

সিঁড়িতে নামতে নামতে টের পেল চোখের জলে সামনের পৃথিবী অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

ট্রেন ছাড়তে প্রতি মুহূর্তে জানলার বাইরের দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুরভির মনের পটে অনেকগুলো ছবি পর পর ভেসে উঠল।

প্রথম দেখার কথা।

স্কুলে মেয়ে ভর্তি হবার ভীড়। প্রধানা শিক্ষিকা মেয়েদের অভিভাবকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলছে, তারপর তারা আসছে সুরভির কাছে ভর্তির ফর্মের জন্য।

সুরভি শিক্ষিকা নয়, স্কুলের কর্মচারী।

হঠাৎই সুরভির চোখ পড়েছিল একটি বিব্রত ভদ্রলোকের ওপর। একটি বছর সাতেকের রোরুদ্যমানা মেয়েকে নিয়ে লোকটি নাজেহাল।

মনে হল হাত-মুখ নেড়ে মেয়েটিকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু মেয়েটির কান্না থামছে না।

এক সময়ে সুরভি উঠে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, এত কাঁদছে কেন?

মনে হচ্ছে এতগুলো মেয়ে দেখে ভয় পেয়েছে। বাড়ি যাবার বায়না ধরেছে।

সুরভি হাসল।

তোমার নাম কি?

ভদ্রলোকই উত্তর দিল।

লিলি।

এস আমার সঙ্গে এস, একটা জিনিস দেখাই।

সুরভিকে দেখে লিলির কান্না থেমে গিয়েছিল।

দুটো চোখ বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করল।

কি জিনিস?

তুমি দেখবেই এস না।

পড়া জিজ্ঞাসা করবে না তো?

লিলির কথায় সুরভি হেসে ফেলেছিল।

না, না, একটা মজার জিনিস দেখাব।

লিলি সুরভির সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল।

পিছন পিছন ভদ্রলোক।

আলমারি খুলে সুরভি দুটো রবারের ব্যাঙ আর কুকুর বের করেছিল। কুকুরের পেট টিপলেই ঘেউ ঘেউ শব্দ করে, আর চাবি দিলে ব্যাঙটা থপ থপ করে টেবিলের ওপর লাফিয়ে বেড়ায়।

ব্যাপার দেখে লিলি হেসে কুটিপাটি।

তারপর একসময় তার ভর্তি হওয়া নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল।

সুদেব, সেই ভদ্রলোকের নাম সুদেব, সুরভিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ভর্তি করার ফর্ম থেকেই সুরভি বুঝতে পেরেছিল লিলি সুদেবের বোনের মেয়ে। লিলির বাবার বন বিভাগে চাকরি, তাই বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়।

বোনের দেখাশোনা সুদেবই করে।

সেই শুরু। মাঝে মাঝে সুদেব স্কুলে আসত। লিলি কেমন পড়াশোনা করছে সে খোঁজ নিতে শিক্ষিকাদের কাছে যেত না, দাঁড়াত সুরভির সামনে।

সুরভি বলেও ছিল।

আপনি দিদিমণিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন না। অমিয়া দিদিমণি ভাল বলতে পারবেন।

সুদেব অদ্ভুত উত্তর দিয়েছে।

জানেন, ওই গম্ভীর চেহারার দিদিমণিদের দেখলে আমার কেমন ভয় করে। তার চেয়ে আপনি অনেক সহজ।

উত্তর শুনে সুরভি হেসে ফেলেছিল।

স্কুলের বাইরেও দেখা হয়েছিল।

ছুটির দিন। আকাশে চাপ চাপ মেঘের ভার। যে কোন মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হতে পারে।

মোড়ের দোকান থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনে সুদেব ফিরছিল, একেবারে চোখাচোখি দেখা।

একটি তরুণীর সঙ্গে কথা শেষ করে সুরভি বাস-স্টপের দিকে এগোচ্ছিল, সুদেব পথরোধ করে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, আমাদের পাড়ায় যে?

আপনাদের পাড়ায় আমার আসা নিষেধ আমার জানা ছিল না।

সুদেব হেসে উঠেছিল।

আমাদের পাড়ায় এলে আমাদের বাড়িতেও আসতে হবে এই নিয়ম।

সুরভি আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল।

দেখছেন আকাশের অবস্থা, আজ নয়, আর একদিন আসব।

সেইজন্যই তো আগে আশ্রয়ের দরকার। আসুন, আসুন, আমাদের বাড়ি খুব কাছেই।

সুদেব ছাড়ে নি। সুরভিকে নিয়ে গিয়েছিল।

সুরভিকে দেখে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল লিলি। সারাক্ষণ তার কাছ ছাড়ে নি। সুদেবের দিদি কাছে বসে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছিল।

সুরভির বাপ নেই। মা থাকে বর্ধমানে। সুরভি বর্ধমান কলেজ থেকেই বি. এ. পাস করেছিল। তারপর এই স্কুলে চাকরি নিয়েছে। প্রতি শনিবার বর্ধমানে চলে যায়, ফেরে সোমবার সকালে।

আজকের দিন শুধু ব্যতিক্রম। হোস্টেলে মেয়েদের ফিস্ট ছিল সকালে, তাই কেউ সুরভিকে ছাড়ে নি।

কথাবার্তায় সবাই এমন মত্ত ছিল যে বাইরে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়েছে সে বিষয়ে কারো খেয়ালই নেই।

রাত সাতটা বাজতে সুরভি চঞ্চল হয়ে পড়েছিল।

সাড়ে সাতটার মধ্যে হোস্টেলের ফটক বন্ধ হয়ে যায়, ছুটির দিন আটটা পর্যন্ত।

ছাতা হাতে সুদেব এগিয়ে দিতে গিয়েছিল বাস-স্টপ পর্যন্ত।

বৃষ্টি তো ছিলই, তার ওপর হাওয়ার প্রকোপ। বার বার ছাতা একদিকে হেলে পড়ল। সুরভির সিক্ত আঁচল এসে লাগল সুদেবের শরীরে।

সুরভি বলেছিল।

আপনার ও ছাতা কিন্তু আমাকে বাঁচাতে পারল না। আপনাকেও নয়।

সুদেব হেসে বলেছিল।

এই ভাল। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া উচিত নয়।

বাস-স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি।

সুরভি উতলা হয়ে উঠতে সুদেব হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়েছিল তারপর সুরভিকে রীতিমত বিস্মিত করে সুরভির সঙ্গে সঙ্গে সুদেবও ট্যাক্সিতে উঠেছিল।

আপনি? আপনি কেন?

আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। এই দুর্যোগে আপনাকে একলা ছাড়া সমীচীন নয়।

কেন, আমি কি নাবালিকা?

মেয়েদের বিয়ে না হলেই তারা নাবালিকা।

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে সুরভি প্রশ্ন করেছিল।

আর ছেলেরা?

সুদেব হেসে উত্তর দিয়েছিল।

একুশ বছরে।

একেবারে হোস্টেলের দরজায় ট্যাক্সি থেমেছিল।

সুরভি নামতে গিয়েও নামতে পারে নি।

পিছন থেকে সুদেব জিজ্ঞাসা করেছে।

আবার কবে দেখা হবে?

সুরভি অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল।

এবার আপনি চলুন আমাদের বাড়ি।

বর্ধমান?

বাবা, এমনভাবে বর্ধমান বললেন, জায়গাটা যেন লণ্ডনের কাছাকাছি। দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার তো মামলা।

বেশ নিয়ে যাবেন একদিন।

ট্যাক্সি চলে গিয়েছিল।

সত্যিই সুদেব বর্ধমান গিয়েছিল।

সুরভি স্কুল থেকে ফোনে সুদেবের অফিসে যোগাযোগ করেছিল।

সুদেবের দিদির কাছ থেকে সুরভি সুদেবের অফিসের নাম সংগ্রহ করেছিল, তারপর ফোন নম্বর পেতে অসুবিধা হয় নি।

কবে যাবেন বলুন?

সুরভির প্রশ্নের উত্তরে সুদেব বলেছিল।

যেদিন আপনি আমন্ত্রণ জানাবেন।

বেশ, সামনের রবিবার চলুন।

আপনি সঙ্গে যাবেন তো?

না, আমি শনিবার যাচ্ছি। আপনি সকাল ন'টা দশের গাড়িতে রওনা হবেন, আমি বর্ধমান স্টেশনে আপনার অপেক্ষায় থাকব। না হলে আপনি বাড়ি চিনে যাবেন কি করে?

সুরভি বেশ একটু মুশকিলেই পড়েছিল।

এক ভদ্রলোক আসছেন কলকাতা থেকে এমন একটা কথা যথেষ্ট নয়, এতে হাজার প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা।

কে ভদ্রলোক ? হঠাৎ বর্ধমানেই বা [illegible] সুরভির সঙ্গে কি এমন আলাপ যে তার বাড়িতে আসছে।

কুমারী তরুণীর পক্ষে এ সব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

সুরভি সমস্ত ঘটনায় একটু কল্পনার রং মেশাল।

লিলি তার স্কুলে পড়ে। লিলির মা তার সঙ্গে এসেছিল ভর্তি করাতে। সেই সময় সুরভির সঙ্গে আলাপ।

আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা। সুরভি কয়েকবার গেছে লিলিদের বাড়িতে। সেখানেই লিলির মামার সঙ্গে পরিচয়।

সুদেব অফিসের কাজে বর্ধমান আসছে, তাই সুরভি তাকে বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মা কিছু বিশ্বাস করল।

কেবল একবার প্রশ্ন করেছিল।

ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসবেন নাকি ?

এমন একটা প্রশ্ন সুরভিকে আরক্তিম করার পক্ষে যথেষ্ট।

মাথা নীচু করে সে বলেছিল।

না, না, ভদ্রলোকের এখনও বিয়েই হয় নি।

উত্তরের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য সে আর মায়ের মুখের দিকে চোখ ফেরায় নি। একটা ব্যাপারের সুরাহা হয়েছিল, কিন্তু সুরভি ভাবছিল সুদেবকে কি বলবে। ঠিক এইভাবে তাকেও তৈরী করে রাখতে হবে।

নিজের মাকে যা বলা যায়, বাইরের একজনকে ঠিক সে ভাবে বলা চলে না। কিন্তু সুরভি নিরুপায়। এতটা এগিয়ে এসে তার পক্ষে আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বর্ধমান স্টেশনে নেমেই সুদেব এক কাণ্ড করল।

একটা গাছের নীচে সুরভি দাঁড়িয়েছিল।

সুদেব সামনে এসে বলেছিল।

না, লিলি দেখছি ঠিক কথাই বলে।

বিস্ময়-জড়ানো কণ্ঠে সুরভি জিজ্ঞাসা করেছিল।

কি বলেছে লিলি ?

আপনাকে বলে সুন্দর-দীপমণি। দেখছি ঠিকই বলে।

সুরভি আর কথা বাড়ায় নি।

রিক্সায় ওঠার মুখে সুরভি বলেছিল।

আপনার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।

আমি একটু মিথ্যার শরণ নিয়েছি।

মিথ্যার শরণ?

একটু ইতস্তত করে সুরভি বলেছিল।

আমি বলেছি আপনার দিদির সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা। আপনি এখানে অফিসের কাজে এসেছেন, আমি আপনাকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

বেশ কিছুক্ষণ সুদেব কৌতূহলী দৃষ্টিতে সুরভির দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখেছিল, তারপর মুচকি হেসে বলেছিল।

আপনার অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সুরভি নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

সারাটা দিন বর্ধমানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় সুদেব ফিরে এসেছিল। সঙ্গে সুরভি। ট্রেনে আড়াই ঘন্টার বেশী নয়, কিন্তু সুরভির আজ মনে হয় জীবনে এমন মধুর লগ্ন আর যেন আসে না।

একেবারে কামরার একটা কোণে দুজনে বসেছিল। সে কামরায় ভীড় কম। ট্রেন মাঝামাঝি আসতে সুদেব সুরভির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

খুব মৃদু আবেগমদির কণ্ঠে বলেছিল।

সুরভি।

উঁ।

সুরভির কণ্ঠ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এসেছিল।

তারপর সারাটা পথ দুজনে কি কথা বলেছিল, এই মুহূর্তে সুরভির মনে নেই। হয়তো অর্থহীন কথা, কিন্তু জানলার বাইরে চোখ মেলে এক আকাশ তারার সমারোহ দেখতে দেখতে সে সব কথা নতুনভাবে অর্থবহ মনে হয়েছিল সুরভির কাছে।

একান্তে হোস্টেলে নিজের শয্যায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে করতে সুরভি ভেবেছে, এত সহজে, এত দ্রুত একজন বাইরের মানুষ মনের মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে!

সুদেব কি ভেবেছিল সুরভির জানা নেই।

তারপর আর দেরী হয় নি।

সুদেবের উৎসাহই যেন বেশী। সে দিন ঠিক করেছিল। কলকাতায় সুরভির কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না, তাই সুরভির মাকে সুদেবের বাড়িতেই রাখা

হয়েছিল।

আরো একটা সুবিধা হয়েছিল।

সুদেবের ভগ্নীপতি এই সময় বদলি হয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। সুদেবের বিরাট একটা সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

সুরভিকে নিয়ে দিদির বাড়িতে থাকায় পক্ষে সুদেবের অনেক অসুবিধা, অথচ দিদিকে একলা ফেলে কোথাও ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সারা শহর চষে ফেলে সুদেব একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করল। সুরভিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে সে ফ্ল্যাট দেখিয়েও আনল।

সব স্বাভাবিক, কোথাও কোন বাধা নয়, অন্তরায় নয়। বিবাহিত দুটো বছর লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতন দ্রুত ছন্দে কেটেছে।

সুদেবের ভালবাসার সায়রে সুরভি আকণ্ঠ-নিমজ্জিত।

নির্মেঘ আকাশ। সেই আকাশ থেকে এভাবে বজ্রপাত হবে, এমন আকস্মিক ভাবে, এ যেন ধারণারও অতীত।

অনেক চেষ্টা করেও সুরভি নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। কান্নার কুণ্ডলী কণ্ঠনালী চেপে ধরল। প্রাণান্তকর অবস্থা।

আঁচলের প্রান্ত চোখে চেপে ধরল সুরভি।

লৌহদানব তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। চাকায় চাকায় যান্ত্রিক আর্তনাদ।

যে শব্দ সুরভির কানে মর্মান্তিক একটা সুর তুলে চলেছে।

কুলটা। কুলটা।

কুলটার মেয়ে কুলটা ছাড়া আর কি।

বর্ধমান স্টেশন এল।

সুটকেস হাতে সুরভি উঠে দাঁড়াল।

আগে প্রতি সপ্তাহে সুরভি এখানে আসত। এর পথ-ঘাট, বুনো গাছের প্রতিটি পাতাও তার চেনা।

কুলির মাথায় সুটকেস চাপিয়ে সুরভি বাইরে এল।

সাইকেল-রিক্সায় চেপে বসল।

যেতে যেতে ভাবল, মাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি। কাজেই মা হঠাৎ সুরভিকে দেখে চমকে উঠবে।

সুরভি স্থির করে রেখেছিল, আসল কথাটা মাকে এখন বলবে না। শুধু বলবে শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। তাই মায়ের কাছে বিশ্রাম নিতে এসেছে।

সুরভির কেমন একটা ধারণা কিছুদিন পর সুদেব এসে হাজির হবে। ভুল

বুঝতে পারবে।

এমন একটা মারাত্মক অভিযোগ করার জন্য অনুতাপ করবে।

তাই মাকে আগে থেকে সে কিছু বলতে চায় না।

দরজা ঠেলবার আগেই দেখা হয়ে গেল।

মা সামনের বাগানে তদারক করছিল। সঙ্গে ছোকরা চাকর।

বাড়ির চারপাশে অনেক জমি। মায়ের যত্নে আগাছার জঙ্গলে পরিণত হয় নি। সামনে ফুলের গাছ। পিছনে তরি-তরকারির।

সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টার ঝুন ঝুন শব্দে মা চোখ তুলে দেখল। তারপর দুচোখে বিস্ময়ের ঘোর নেমে এল।

সু, তুই ?

সাইকেল-রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে, সুটকেশটা ছোকরা চাকরের হাতে তুলে দিয়ে সুরভি বলল।

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে মা। তোমার কাছে একটু জিরোতে এলাম।

মা একটু এগিয়ে এল। সুরভির মুখোমুখি দাঁড়াল।

চোখ কুঁচকে দেখবার চেষ্টা করল সুরভির শরীর কোথায় খারাপ হয়েছে। কতটা।

একটু পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। দুটি চোখের দৃষ্টি উদাস। আর তো কিছু নয়। হ্যারে, সুদেবের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে ?

মাকে প্রণাম করে সুরভি সোজা দাঁড়িয়ে উত্তর দিল।

ঝি-চাকর আছে, অসুবিধা হবে না।

মা একটু আশ্চর্যই হল।

আশ্চর্য হবার কারণ, আগে যতবার সুরভিকে তার মা বর্ধমানে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার কথা বলেছিল, সুরভি এই বলে আপত্তি তুলেছিল, সুরভি চলে এলে সুদেবের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হবে।

সুরভির পিছন পিছন মা-ও বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

তক্তপোষের ওপর বসে সুরভি বলল।

আমি কিন্তু খেয়ে আসি নি মা।

দাঁড়া তাহলে আমি একবার রাধুর মাকে বলে আসি।

মা বেরিয়ে গেল।

রান্নার কাজ করে রাধুর মা। কাছেই থাকে। দুবেলা রান্না করে দিয়ে যায়।

বাপকে সুরভির ভাল মনে নেই। মনে করার চেষ্টা করলে, আবছা দীর্ঘাকৃতি

গৌরবর্ণ মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে।

বাপ চিরকাল লক্ষ্ণৌতে ছিল। মা-ও তাই। সুরভির জন্ম সেখানেই।

লক্ষ্ণৌয়ে কাজ করতে করতেই বাবা একবার এসে বর্ধমানে এই বাড়িটা কিনেছিল। তারই পিতৃপুরুষের বাড়ি। ঋণের দায়ে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সুরভির বাবা দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতির হাত থেকে উদ্ধার করেছিল।

এখন এই বাড়ি আর স্বামীর ব্যাঙ্কের টাকা সুরভির মায়ের সম্বল। সুরভির বিয়েতে বিশেষ খরচ হয় নি, কাজে কাজেই জমানো টাকার সিংহভাগই অস্পৃষ্ট আছে।

খেতে বসে মা আবার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁরে, ঝগড়াঝাঁটি করে আসিস নি তো?

তখনই সুরভি কোন উত্তর দিল না।

যে ভাতের গ্রাস মুখে ছিল, সেটা ভাল করে চিবাল। এক গ্রাস জল খেল।

তারপর বলল।

কি ব্যাপার বল তো? আমি আসতে মনে হচ্ছে তুমি খুশি হও নি। বেশ, বিকালের গাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি।

ওমা ও কি কথা! আমি কি তাই বলেছি? আগে বললে সাতজন্মে আসতিস না তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আগে তো এরকম শরীর খারাপ হয় নি, তাই আসার দরকার হয় নি।

কি হয় শরীরে?

এবার মা-র কণ্ঠ রীতিমত উদ্বেগাকুল মনে হল।

কি·জানি, একটুতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিছু ভাল লাগে না।

মা আড়চোখে মেয়ের শরীর নিরীক্ষণ করল। না, আসন্ন মাতৃত্বের কোন চিহ্ন দেহের কোথাও নেই। অন্তত তেমন কিছু বোঝা গেল না।

তা হলে মা খুশীই হত। দু বছর বিয়ের পরও সুরভির কোলে কোন সন্তান হল না, মায়ের আক্ষেপ সেইখানেই।

এক কাজ কর, বিকালে একবার কবিরাজ মশাইয়ের কাছে চলে যা।

সাত দিন একভাবে কাটল।

এমন কোন কথা নেই, তবু ট্রেনের সময় সুরভি উৎকর্ণ হয়ে থাকত জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে। পরিচিত লোকটা যদি সাইকেল রিক্সা থেকে নামে।

একদিন মা সামনে এসে দাঁড়াল।

তোর সঙ্গে কথা আছে সু।

কি বল?

কি হয়েছে সত্যি করে বলবি?

কথাটা বলবে তো। কিসের কি হয়েছে?

সুদেবের সঙ্গে তোর কিছু একটা হয়েছে। সাতদিন এসেছিস, একটা চিঠিও লিখিস নি। তাছাড়া, গত রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে তোর কান্না কানে এসেছে। আমি তোর মা। আমাকে কিছু লুকাস নি সু। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে।

সুরভি চিত্রাপি'তের মতন দাঁড়িয়ে রইল। তার কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে গেছে।

কি রে বল?

দু হাতে মুখ ঢেকে সুরভি অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করল।

বেলা দুপুর: বাড়ি খালি। সে কান্না কারো কানে গেল না।

মা সুরভির হাত ধরে তক্তপোষের ওপর বসাল।

আমি আর ওর কাছে ফিরে যাব না।

মায়ের বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

সে কি রে?

হ্যাঁ মা, আমাকে যা বলেছে তারপর আর আমার তার কাছে ফিরে যাওয়া যায় না।

মা কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে সুরভিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

সুরভিই আবার বলল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

আমাকে কুলটার মেয়ে বলেছে।

মা চমকে উঠল। একটা হাত রাখল সুরভির পিঠে।

তোকে সুদেব এই কথা বলেছে?

মুখে বলে নি, চিঠিতে লিখে দিয়েছে লিখেছে কুলাটার মেয়ের সঙ্গে সে এক সংসারে থাকতে পারে না।

দু হাতে বুক চেপে মা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মুখ দেখে বোঝা গেল তার সারা বুক জুড়ে একট সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। দুর্মদ তরঙ্গভঙ্গে বুকের তট বুঝি ভেঙে চুরমার করে ফেলবে।

মা জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। জানলার গরাদে মাথা রাখে।

সুরভি বালিশে মুখ গুঁজে তক্তপোষের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর, সুরভির মনে হল যেন অনন্তকাল, সুরভির কানে মার-র কণ্ঠস্বর গেল।

তোর সঙ্গে কথা আছে সু। তোর হয়তো সব কিছু জানা দরকার।

মায়ের কণ্ঠ যেন অদ্ভুত কঠিন আর নিস্পৃহ শোনাল।

সুরভি তক্তপোষের ওপর উঠে বসল।

তুই আমার মেয়ে নস্‌ সু।

মা।

হ্যাঁ, এমন একটা কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সু, কিন্তু কথাটা না বলে আর কোন উপায় নেই। কোন সূত্র থেকে কিছুটা আভাস যখন সুদেব পেয়েছে তখন তোর সব জানা উচিত।

প্রথমে খুব মৃদুভাবে, তারপর জোরে জোরে তক্তপোষটা কেঁপে উঠল। শুধু কি তক্তপোষ! সুরভির মনে হল সারা পৃথিবী কাঁপছে। যে মাটিকে আশ্রয় ভেবে সে সযত্নে তার সংসার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, সে মাটি তার হৃদয়ের মতনই অ-স্থির।

মনে হল, মা-র হাতে তীক্ষ্নমুখ এক শূল। সেই শূল সুরভির বুকে নির্মমভাবে প্রোথিত হচ্ছে।

আমার মা তাহলে কে ?

মা একটু দম নিল, তারপর আস্তে আস্তে বলল।

তুই লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী জানকীবাঈয়ের মেয়ে।

ভগ্নকণ্ঠে সুরভি বলল।

তাহলে সত্যিই আমি কুলটার মেয়ে!

এবার মায়ের স্বর অস্বাভাবিক শীতল।

জানকীবাঈ যদি কুলটা হয়, তবে পৃথিবীতে সতী কে আমি জানি না।

সুরভির মনে হল, ক্রমেই যেন সে গভীর থেকে গভীরতর তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

তুমি আমাকে সব কিছু বল। সব আমি জানতে চাই।

ইচ্ছা করেই সুরভি 'মা' বলে আহ্বান করল না।

মা তক্তপোষে এসে বসল। সুরভির পাশে।

তুই স্থির হয়ে বস। আমি সব বলছি।

আমি স্থির হয়েই আছি, তুমি সব বল।

আঁচল দিয়ে মা নিজের মুখ-চোখ মুছে নিল। দু এক মিনিট স্তব্ধ থেকে বোধ-

হয় কি করে কথা শুরু করবে সেটাই ভাবল।

তারপর শুরু করল।

আমরা লক্ষ্ণৌ ছিলাম তা তো তোর মনে আছে। তুই ওখানেই জন্মে ছিলি। তোর বাবার গান-বাজনায় খুব অনুরাগ ছিল। নিজে খুব ভাল তবলা-সঙ্গত করতে পারত। বড় বড় জলসায় তার ডাক আসত। সরস্বতীবাঈ, মোতিবাঈ, জানকীবাঈ এরা সব সময়ে সঙ্গতের জন্য তোর বাবারই খোঁজ করত।

মনোরম একটা উপকথা শুনছে, সুরভির চোখ-মুখের কৌতূহলী ভাব দেখে তাই মনে হল।

নিষ্পলক দৃষ্টি, উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে বুকের স্পন্দন দ্রুততর।

মা বলে চলেছে।

বেনারস থেকে জানকীবাঈয়ের মুজরো এল। একমাস বাইরে থাকবে। জানকী-বাঈয়ের ইচ্ছা তোর বাবা সঙ্গে যাক।

একমাস মানুষটা বাইরে যাবে কিন্তু আমাকে দেখাশোনা করবে কে? তখন আমি একেবারে একলা। বয়সও খুব বেশী নয়।

এখন ভাবি, তখন যদি কান্নাকাটি করতাম, তোর বাবার দুটো পা জড়িয়ে ধরে যেতে বাধা দিতাম, তাহলে বোধহয় এমন সর্বনাশ হত না।

তখন কিন্তু কোন বিপদের আভাসও পাই নি।

মনে ভাবলাম এত বড় একজন বাঈজীর তবলচী হয়ে লোকটা আসরে আসরে তারিফ কুড়াবে, তাতে আমার গর্বের অংশও কম নয়।

অফিস থেকে সাতজন্মে ছুটি নেয় নি. কাজেই ছুটি পাবার পক্ষে কোন অসু-বিধা হল না।

ঠিক হল, পাশের বাড়ির দয়ালপ্রসাদ দেখাশোনা করবে।

তার মেয়ে আমার সমবয়সী। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

সে কিন্তু আমাকে বলেছিল।

ভাবিজী, বাড়ির মানুষকে এভাবে ছাড়লে কেন?

আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম।

কেন, কি হয়েছে? জানকীবাঈয়ের সঙ্গে সঙ্গত করতে গেছে।

আগুন আর ঘি কি রাখতে আছে একসঙ্গে? জানকীবাঈকে তুমি দেখ নি?

দেখেছি। এক রইস লোকের বাড়িতে জলসা হয়েছিল। চিকের আড়ালে বসে দেখেছিলাম। খুব সুন্দরী।

তবু দাদাকে ছেড়ে দিলে?

তখনও কিন্তু আমার মনের আকাশে কোথাও একটু সন্দেহের মেঘ জমে নি। তোর বাবাকে আমি অগাধ বিশ্বাস করতাম। তার ওপর আমার জোর ছিল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

এক মাস নয়, মানুষটা ফিরল তিন মাসের পর।

একেবারে ভিন্ন মানুষ। আগের দিনের প্রফুল্লচিত্ত হৃষ্টপুষ্ট মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

সব সময় কি চিন্তা করছে। হাজার প্রশ্ন করলে তবে একটা উত্তর দেয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, গান-বাজনার প্রতি তার অসীম অনীহা। আর কোথাও তবলা-সঙ্গত করতে যায় না।

একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

কি আজকাল জলসায় যাও না?

মানুষটা চাদরমুড়ি দিয়ে চুপচাপ ঘরের কোণে বসেছিল।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে বলল।

ভাল লাগে না।

বাড়ির মধ্যে শুধু আমরা দুজন। একজন যদি সব সময় ওভাবে পাশ কাটিয়ে যায়, তাহলে বাকি লোকটার কি অবস্থা হয় বল। এভাবে বেঁচে থাকা যেন দুর্বিহ বলে মনে হল।

আমি মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম।

তোমার কি হয়েছে বল তো?

লোকটা চমকে উঠল।

কেন? কি হয়েছে?

কি হয়েছে, তুমিই জান। তবে তুমি যে আর আগের মানুষটি নেই তা তো নিজেই বুঝতে পারছ।

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে সু। বাইরে থেকে দিনের আলো মুছে আসছে। ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালা হয় নি। সব কিছু অর্ধস্পষ্ট।

মানুষটার চোখ-মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অবয়বের কাঠামো।

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ আমার কানে এল।

আমি অন্যায় করেছি।

মনে হল একটা পাপবোধে লোকটার সারা অন্তর যেন দগ্ধ হচ্ছে।

অন্যায়, কি অন্যায়?

তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি সু। অত বড় লম্বা-চাওড়া লোকটা দু হাঁটুর

মধ্যে মুখটা গুঁজে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল।

আমি আর থাকতে পারিনি।

কাছে গিয়ে তার পিঠে একটা হাত রেখে বলেছিলাম।

আমি তোমার স্ত্রী। আমার কাছে কিছু লুকিও না গো। সব খুলে বল। অন্যায় করার মানুষ তো তুমি নও।

আমি তোমার কাছেই অন্যায় করেছি।

কি অন্যায় তুমি বল।

তারপর সেই আধ-অন্ধকারে লোকটা সর্বনাশের কাহিনী বিবৃত করল। তার সর্বনাশের কাহিনী, আমারও।

জানকীবাঈয়ের সঙ্গে লোকটা বেনারসে গেল। প্রথমে লোকটা একটা হোটেলে উঠেছিল, তারপর রেওয়াজের অসুবিধা হয় বলে জানকীবাঈ তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল।

একই বাড়িতে আলাদা ঘরে।

জানকীবাঈ ব্রাহ্মণের মেয়ে। বাপ ফৈজাবাদের ডাক্তার ছিল। খুব নাম-ডাক। ভারি পশার। বিপত্নীক।

একটি মেয়ে জানকী। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়া দেখাশোনা করত। জানকীর লেখাপড়ায় বিশেষ ঝোঁক ছিল না। বইখাতা হাতে স্কুলে যেত ওই পর্যন্ত।

একদিন মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল না। বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেল। সন্ধানে চারদিকে লোক ছুটল।

কথাটা ডাক্তারের কানে উঠল। তার নিজস্ব টাঙ্গা ছিল। সেই টাঙ্গায় উঠে খুঁজতে বের হল।

মেয়ের সন্ধান মিলল এক আশ্চর্য জায়গায়। যেখানে তার থাকবার কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি।

ডাক্তারই খোঁজ পেল।

চক-এর বাঈজি এলাকায়। এক বাড়িতে ঠুংরি গান চলছে। গাইছেন বিখ্যাত বাঈজী সরস্বতীবাঈ।

জানকী সেই বাড়ির উল্টোদিকের একটা ময়দানে গাছে ঠেস দিয়ে তন্ময়।

বইখাতা চারদিকে ছড়ানো।

বার কয়েক ডাকার পরও সাড়া না পেয়ে ডাক্তার নেমে মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কিরে, এখানে কি করছিস?

গান শুনছি।

জানকীর হাত ধরে ডাক্তার বুঝিয়ে-সুজিয়ে টাঙ্গায় ওঠাল।

বাবা, আমি গান শিখব।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

এখানে, এতদূরে এলি কি করে?

ক্লাসের মেয়েরা বলল, চকে বাঈজিরা থাকে। তারা গানবাজনা করে।

এখানে ভদ্রঘরের মেয়েদের আসতে নেই মা। এটা খারাপ জায়গা।

জানকী আয়ত দুটি চোখ তুলে শুধু বাপের দিকে দেখছিল। এ কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝে নি।

তারপর ডাক্তার বাড়িতে বড় বড় ওস্তাদ রেখে মেয়েকে গান শিখিয়েছিল।

জানকীর বয়স তখন আট।

ডাক্তার হঠাৎ যখন মারা গেল, জানকী তখন পনেরো বছরের কিশোরী। আগুনের ডালি। একবার তার দিকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

বিচিত্র মৃত্যু।

রোগীর বাড়িতে রোগীর নাড়ি দেখতে দেখতে ডাক্তার মরণের কোলে চলে পড়ল।

পরে জানা গেল হৃদ্‌রোগ।

যে আত্মীয়াটি জানকীর তদ্বির-তদারক করত, সে আগেই মারা গিয়েছিল।

জানকী একেবারে একলা। তার যৌবনকে পাহারা দেবার কেউ রইল না অবস্থা আরও চরমে উঠল।

ভাল পসার ছিল ডাক্তারের। অন্তত সারা ফৈজাবাদের লোক তাই জানত।

ডাক্তার সরে যাবার পর হিসাব করে দেখা গেল জমানো টাকা বিশেষ কিছুই নেই। বহু রোগীকেই বিনা দর্শনীতে দেখত। যা কিছু বাকি ছিল, তা আদায় করা গেল না।

সম্বলের মধ্যে শুধু এই বাড়ি।

কিন্তু আত্মীয়সহায়হীন এক কিশোরীর পক্ষে এ বাড়ি সম্পদ নয়, দায়।

যে দুজন ওস্তাদ জানকীকে গান শেখাত, তারা ছাড়ল না। বিনা পয়সাতেই গান শিখিয়ে চলল।

এভাবে বেশিদিন চলল না। চলতে পারে না।

সংস্কারাভাবে বাড়ির অবস্থা জীর্ণতর হয়ে এল। লোকজন ছেড়ে চলে গেল। বিনা মাইনের দিনের পর দিন চাকরি করা সম্ভব নয়।

এমনই ভাঙনের মুখে উমির খাঁ প্রস্তাব আনল।

সারেঙ্গীবাদক উজীর খাঁ।

রায়বেরিলির এক রইস আদমি গান শুনতে চায় জানকী।

জানকী অবাক।

গান শুনতে চায়? আমার কাছে?

হ্যাঁ। এতে অসম্মানের কিছু নেই। তুমি গান শোনাবে, সে শুনবে।

কিন্তু তা হলে আমি যে বাঈজী হয়ে যাব ওস্তাদজী।

ছি, ছি, তা কেন। তা ছাড়া সব বাঈজী তো দেহদান করে না জানকী। অনেকেই আছে শুধু গান শোনায়। গান শুনিয়েই জীবিকা-অর্জন করে।

জানকীর এ ছাড়া আর পথও ছিল না।

বাঁচার তাগিদেই তাকে এ পথে আসতে হয়েছিল।

রায়বেরিলির রইস আদমি থেকে শুরু, তারপর নানাদিক থেকে নানা লোক আসতে আরম্ভ করল।

অপূর্ব ঠুংরির গলা জানকীর। সে যখন গান গায়, তখন পথে ভীড় জমে যায়। কিন্তু পাড়ার লোকে আপত্তি করল।

পাড়ার মধ্যে এসব চলবে না।

জানকী বাড়ি জলের দরে বেচে দিয়ে চকেই উঠে এল।

কোন সময়ে যে জানকীবাঈ হয়ে গিয়েছিল তা সে নিজেই জানে না।

অন্য বাঈজীদের সঙ্গে জানকীবাঈয়ের আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল।

ভোরে উঠে পূজা-পাঠ সেরে রেওয়াজ করতে বসত। ইদানীং ঠুংরির সঙ্গে ভজনও গাইত।

বিকালে আসর বসত। কিন্তু আসরে কোন বেলেল্লাপনা চলত না। মদ নয়, আর কোন স্ফূর্তি না। শুধু একাগ্র চিত্তে গানের সুধাপান।

দু একজন সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গান থামিয়ে জানকীবাঈ তখনই তাদের বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে।

এ সব কথা বাড়ির মানুষটাই বলেছিল। জানকীবাঈ কোন এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তাকে বলে থাকবে।

এই সত্যনিষ্ঠ, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি জানকীবাঈ আমার সর্বনাশের কারণ হবে, তা ভাবতেই পারি নি।

রামনগরের রাজবাড়িতে গান শেষ হতেই জানকীবাঈ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আসরসুদ্ধ লোক বিস্মিত। ডাক্তার এল।

বলল, অত্যধিক পরিশ্রম। বিশ্রামের প্রয়োজন।

বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

একই ঘরে খাটের ওপর জানকীবাঈ। মেঝের ওপর বিছানা পেতে বাঁড়ির মানুষ।

ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য দেওয়া, শরীরের তত্ত্বাবধান বিদেশ-বিভুঁয়ে বাঁড়ির মানুষকেই করতে হয়।

অকপটে সব স্বীকার করেছে। এখন মনে হয় স্বীকার না করলেই যেন ভাল ছিল। সব কিছু অন্ধকারে অদৃশ্য থাকত, সেই তো ভাল।

কিন্তু সে রাত্রে বসে বসে সব শুনতে হয়েছিল। নিজের কপাল ভাঙার কাহিনী। এক রাতে জানকীবাঈয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

বাইরে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে মেঘের মাদল বাজছে।

একটু জল। জল একটু।

উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডবে জানকীবাঈয়ের কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল।

জানকীবাঈ কণ্ঠ আর একটু চড়াল।

বাবুজী, বাবুজী।

এবার কাজ হল। মানুষটা ধড়মড় করে উঠে বসল।

কিছু বললেন?

একটু জল।

কোণে রাখা সুরাই থেকে জল গড়িয়ে জানকীবাঈয়ের মুখের কাছে ধরেছিল।

চুমুক দিতে গিয়েই বিপর্যয়।

কাছে কোথায় বজ্রপাত হল। কাঁচের জানলাগুলো ঝন ঝন করে কেঁপে উঠল। তখন কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলাম ও বাজ আর কোথাও নয়, আমারই মাথায় পড়েছে।

বাবুজী।

চীৎকার করে জানকীবাঈ দুহাতে সজোরে মানুষটাকে জাপটে ধরল।

তার হাতের গ্লাস ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

বাতিদানে ম্রিয়মান একটি বাতি।

সেই বাতির স্বল্প আলোয় জানকীবাঈয়ের অপরূপ দেহবল্লরী আরো মনোরম আরো রহস্যময় মনে হল।

আমার বড় ডর করছে বাবুজী।

জানকীবাঈয়ের বুকের ওপর মাথা রেখে তার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে মানুষটি বিহ্বল স্বরে উত্তর দিল।

ভয় কি, আমি তো রয়েছি।

সমস্ত রাত লোকটার জানকীবাঈয়ের বাহুবন্ধনে কাটল।

উঠতে পারে নি। ওঠার ইচ্ছা হয় নি।

তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র।

মানুষটির ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথমে পরিবেশ বুঝতে একটু সময় নিল। যখন বুঝতে পারল, তখন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

বিস্রস্তবাসে জানকীবাঈ পাশে শুয়ে। তার একটা হাত লোকটির কণ্ঠবেষ্টন করে রয়েছে।

দুটি চোখ নিমীলিত। পদ্মের মত অনাবিল সৌন্দর্যের আকর মুখ। মরকত মণির মতন রক্তিম ওষ্ঠাধর।

আবেগতপ্ত নিজের দুটি ঠোঁট জানকীবাঈয়ের ওষ্ঠাধরের ওপর নামিয়ে এনেছিল।

তারপর একটানা তিন মাস।

দুজনেই আপ্রকাতচ্ছ। একজনকে ছাড়া আর একজনের জগৎ অন্ধকার।

যে দিন চেতনা হল সেদিন সর্বনাশ হয়ে গেছে।

জানকীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

কি হবে? তুমি আমার এ কি সর্বনাশ করলে?

কিছুক্ষণ বাড়ির মানুষটি কোন উত্তর দিতে পারে নি। তারপর একসময়ে বলেছে।

কিছু একটা ব্যবস্থা কর। দিনের আলোর মুখ দেখতে দিও না।

আর অপেক্ষা করে নি।

বেনারস থেকে লোকটি লক্ষ্ণৌ ফিরে এসেছিল।

কিন্তু জানকীবাঈ আসে নি।

লোকটি অনুতাপে জর্জর তা বোঝা গিয়েছিল। কৃত পাপের জন্য অধোমুখ।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মানুষটা জানকীবাঈকে ছেড়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তার দেহজ স্মৃতিকে অতিক্রম করতে পারে নি।

বার বার আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে চমকে উঠেছে। অন্য কোন রমণীর তৃপ্তিকর স্পর্শের কথা মনে পড়েছে।

আমি সব বুঝতে পারলাম সু। বুকের মধ্যে আমার অনির্বাণ শিখা জ্বলত দাউ দাউ করে, কিন্তু মানুষটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতেও পারতাম না।

এই রকম জীবন্মৃত অবস্থায় চার বছর কাটল।

লোকটার পরিবর্তন হল না। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। ভেবেছিলাম আমার কোলে একটা সন্তান এলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তাও দিলেন না।

চার বছর পরের একদিন। সে দিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে।

মানুষটা অফিস থেকে ফিরল উদ্বিগ্ন হয়ে।

হাতের টেলিগ্রাম দেখিয়ে বলেছিল।

জানকীবাঈ মৃত্যুশয্যায়। আমি আজ রাতেই বেনারস চলে যাব।

মানুষটার বিচলিত অবস্থা দেখে আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না।

জানকীবাঈ এখন কোথায়? তার মৃত্যুশয্যায় এই মানুষটাকেই বা যেতে হবে কেন?

দিন তিনেক পরে বাড়ির মানুষ ফিরল।

বুকের মধ্যে সন্তর্পণে তোয়ালে জড়ানো ঘুমন্ত একটি শিশু। বয়স বোধহয় বছর তিনেক। ফুটফুটে সুন্দর। একমাথা কোঁকড়ানো চুল।

সুরভি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

আমি?

হ্যাঁ তুই। একেবারে ছোট্ট জানকীবাঈ।

স্বামীর কোল থেকে তোকে নিজের কোলে তুলে নিলাম।

একবারও মনে হল না, স্বামীর পাপ, স্বামীর পদস্খলনের প্রতীক বুকের মধ্যে নিচ্ছি।

আমার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় সেদিন এসব ভাববারই অবকাশ পায় নি।

তাহলে তো আমি সত্যিই কুলটার মেয়ে।

সুরভির এ প্রশ্নের উত্তর মা তখনই দিতে পারল না।

বোধহয় অতীতের চিন্তায় মগ্ন ছিল।

আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল।

না, জানকীবাঈকে আমি কিছুতেই কুলটা বলতে পারব না।

কিন্তু তার সঙ্গে তো বাবার কোন রকম বিবাহ-বন্ধন হয় নি। তার মানে আমি কোন বিবাহের ফল নয়।

তোর বাবাকে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোন রকম বিবাহ হয় নি। বিবাহের কোন প্রয়োজনই মনে করে নি। তোর বাবার ধারণা ছিল, জানকীবাঈ এ

গর্ভ নষ্ট করে দেবে। এ কলঙ্ক স্থায়ী হতে দেবে না। কিন্তু তা সে করে নি। তোর বাবা চলে আসার পরই সে গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এক আশ্রমে চলে গিয়েছিল। লোককে বুঝি বলেছিল, তার স্বামী নিরুদ্দেশ।

সুরভি উঠে দাঁড়াল। তার সারা মুখে বিষাদের ম্লান আভা।

জানলার কাছে যেতে যেতে বলল।

জানকীবাঈয়ের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনে আমার লাভ কি! আমার কি হবে! সারাটা জীবন আমি কি করব?

একটু থেমে মা বলল।

সুদেবকে বুঝিয়ে বলা যায় না?

কি বলব? বলব আমি এক বাঈজীর মেয়ে। বাপের সঙ্গে যার কোনদিন ধর্মের বন্ধন হয় নি। আমি শুধু তাদের কামনার ফল।

সুরভি কখনও মা-র সামনে এমন ভাষা ব্যবহার করে না কিন্তু আজ তার যা মনের অবস্থা তাতে পরিমিতিবোধ থাকার কথা নয়।

আমি আর একটা কথা ভাবছি।

সুরভি কোন উত্তর দিল না। একভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদেব এসব কথা জানল কি করে? এ তো কেউ জানে না। তোকে পাবার তিন দিনের মধ্যে আমরা বাড়ি বদল করেছিলাম, পাছে পড়শীরা কোন রকম সন্দেহ করে। নতুন প্রতিবেশীরা সবাই জানত তুই আমার মেয়ে।

ছেলেবেলা থেকে তুই গুণ গুণ করতিস। লক্ষ্ণৌয়ের আকাশে-বাতাসে গান। রেডিয়োতে গান হলে তুই ছুটে এসে দাঁড়াতিস। তোর মুখ-চোখের চেহারা বদলে যেত।

তাই আমি তোকে গান শেখাবার কথা বলেছিলাম।

শুনে তোর বাবা খেপে গেল।

মানুষটা বোধহয় ভয় পেল, পাছে তুই আবার ছোট জানকীবাঈ হয়ে যাস। তারপর একসময় লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এলাম।

॥ ২ ॥

সুদেব একটা জরুরী ফাইল নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিল। ফাইলটা নিয়ে আজই রাতে ডিরেক্টর বম্বে রওনা হবে।

বেয়ারা একটা স্লিপ এনে সামনে রাখল।

ফাইলের ওপর নোট করতে করতে সুদেব একবার আড়চোখে শ্লিপটার ওপর দেখল।

তানির আলি। লক্ষ্ণৌ। দেখা করার কারণ, ব্যক্তিগত, গোপনীয়।

বেয়ারাকে সুদেব লোকটিকে একটু অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেও মনে মনে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল।

সুদেব আগে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গেছে বটে, কিন্তু এ ধরনের নামের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। লোকটার তার কাছে কি প্রয়োজন।

এ অফিসে চাকরি দেবার তার ক্ষমতা নেই। মোটামুটি সে একটা ভাল চাকরি করে এই পর্যন্ত।

ফাইলের কাজ শেষ করে ফাইলটা ডিরেক্টরের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে সুদেব চেয়ারে টান হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

তারপর লোকটিকে ভিতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

লোক একজন নয়, দুজন।

একটি যুবক আর একজন বৃদ্ধ।

বৃদ্ধটি এই বয়সেও পরম রূপবান। রক্তগোলাপের মতন রং, কাশশুভ্র, কেশ, অনুজ্জ্বল দুটি চোখ। পরনে শেরওয়ানি, চোস্ত পাজামা। একহাতে লাঠি, অন্য হাতটি যুবকটির কাঁধে।

সুদেব নিরীক্ষণ করে দুজনকে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল।

তানির আলি কার নাম ?

বৃদ্ধ সেলাম করে বলল।

আমার নাম হজরত। আমিই আপনার দর্শনপ্রার্থী। এ আমার নাতি মোবারক। এ বয়সে একলা চলাফেরা কবা সম্ভব নয় বলে একে সঙ্গে এনেছি।

সুদেব ঝুঁকে পড়ে দুটো হাত টেবিলের ওপর রাখল।

আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন ?

প্রয়োজন একটু গোপনীয়। শুধু আপনাকেই বলতে চাই।

সুদেব বেয়ারাকে ডাকল। বলে দিল এখন যেন কেউ ভিতরে না আসে।

তারপর তানির আলির দিকে ফিরে বলল।

এবার আপনার কথা বলতে পারেন। কেউ ভিতরে ঢুকবে না।

তানির আলি নাতির দিকে ফিরল।

মোবারক, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। আমি যাবার সময় ডেকে পাঠাব।

মোবারক বাইরে চলে এল।

এবার তানির আলি লাঠিটা দুহাতে চেপে ধরে কিছুক্ষণ সুদেবকে দেখল। তারপর খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কন্ঠে বলল।

আপনি দেখে-শুনে সাদি করেন নি বাবুজী ?

অ্যাঁ ?

কথাটা কানে ঢুকলেও সুদেব তাব তাৎপর্য বুঝতে পারে নি।

বলছি আপনি কোথায় সাদি করেছেন ?

কেন বর্ধমানে।

আপনার শ্বশুরের নাম কি ?

অবিনাশচন্দ্র দত্ত।

লক্ষ্ণৌতে কাজ করতেন। খুব ভাল তবলা-সঙ্গত করতেন, জানেন ?

লক্ষ্ণৌতে কাজ করতেন জানি। তবলা-সঙ্গতের কথা জানি না।

তাঁকে দেখেছেন কখনও ?

না। আমার বিয়ের আগেই তিনি মারা গেছেন।

ফটো দেখেছেন ?

হ্যাঁ, তা দেখেছি।

দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা।

তানির আলি পকেট থেকে সিল্কের রুমাল মোড়া একটা প্যাকেট বের করে টেবিলেব ওপর রাখল। তারপর প্যাকেট খুলে একটা ফটো সুদেবের দিকে এগিয়ে দিল।

স্টুডিয়োতে তোলা ফটো। বেনারসের এক স্টুডিয়োর ছাপ রয়েছে।

একটা বড় কৌচে পাশাপাশি একটি ভদ্রলোক আর একটি মহিলা।

মহিলা অপরূপ লাবণ্যময়ী। ভদ্রলোককে দেখেই সুদেব চিনতে পারল। সুরভির বাবা। সুরভির কাছে এঁর একাধিক ফটো দেখেছে।

মহিলার কোলে একটি বছর দুয়েকের শিশু। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় শিশুটি আজকের সুরভি। ঠিক এক রকম আয়তলোচন, চিবুকের ভঙ্গী।

এতে কি বুঝব ?

সুদেবের কণ্ঠে সামান্য কম্পনের রেশ।

ফটোটা উল্টে দেখুন।

সুদেব ফটোটা ওল্টাল।

পিছনে লেখা।

জানকী বাঈ, সুরভি ও অবিনাশ দত্ত।

হাতের লেখার সঙ্গেও সুদেবের পরিচয় আছে।

সুরভি তাকে বাপের চিঠি দেখিয়েছে।

এখানে বদলি হয়ে আসার পরও সুরভির বাবাকে মাঝে মাঝে লক্ষ্ণৌ যেতে হত। পয়সাকড়ি উদ্ধারের ব্যাপারে। একটা প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা ঢেলেছিল। সেই সময়ে সুরভিকে একাধিক চিঠি লিখেছিল। বাপ তাকে কি অপরিসীম স্নেহ করত, সেটা দেখাবার জন্যই সুরভি চিঠিগুলো সুদেবের সামনে রেখেছিল।

ফটোটা সামনে রেখে সুদেব চুপচাপ বসে রইল।

এখন তার ঠিক কি করা উচিত সেটা ভেবে উঠতে পারল না।

সামনে বসা লোকটাকে তার নিয়তির মতন ক্রূর মনে হল। পলিতকেশ, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল মূর্তিমান সর্বনাশ।

আরো আছে বাবুজী।

তানির আলি পকেট থেকে এবার এক গোছা ফটো বের করল। প্রায় গোটা পাঁচেক।

বিভিন্ন জায়গায় জলসায় সমাগত বাঈজীদের ফটো। রামনগর, মুক্তাগড়, প্রয়াগ। তলায় ছাপার অক্ষরে নাম লেখা।

কাজলবাঈ, মোতিবাঈ, জানকীবাঈ, সরস্বতীয়া, হিঙ্গলবাঈ প্রভৃতি।

একটা ফটো শুধু জানকীবাঈয়ের একলা।

পা মুড়ে বাঈজীর ঢংয়ে বসে। একটা হাত সামনের দিকে, অন্য হাত কানের কাছে।

গানের আলাপ করার ভঙ্গী।

আপনি কে?

নিজের কণ্ঠস্বর সুদেবের নিজের কানে অদ্ভুত শোনাল।

তানির আলি ভ্রূ কোঁচকাল।

আমার নাম তো আপনার সামনে লেখা রয়েছে।

না, না, জানকীবাঈ আপনার কে?

তানির আলির মুখ এ বয়সেও লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

একটু ইতস্তত করে বলল।

আমি প্রথম জীবনে জানকীবাঈয়ের সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাতাম। যখন জানকী-বাঈ শুধু জানকী ছিল তখন থেকে। ওর সঙ্গেই আমি ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ এসেছিলাম।

থেমে তানির আলি সুদেবের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিছুটা আত্মগতভাবে বলল।

জানকীবাঈকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। এ যুগের মানুষ সে ধরনের মহব্বতের কথা কল্পনাও করতে পারে না। জানকীও আমাকে ভালবাসত। আমরা ঠিক করেছিলাম দুজনে সাদি করে সুখে জীবন কাটাব। কিন্তু অবিনাশবাবু রাহুর মতন সব কিছুতে বাদ সাধল।

কিন্তু এতদিন পরে আমার কাছে আসার মানে ?

আসল কথাটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। অনেক বছর ধরে চেষ্টা করছি বাবুজী। আমার বয়স হয়েছে। কলকাতায় সাদি হয়েছে জানতাম, কিন্তু কলকাতা বিরাট শহর। এখানে মানুষকে খুঁজে বের করাই মুশকিল।

তানির আলি দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে দেখল।

পাঁচটা বেজে গেছে বাবুজী। আপনাদের তো পাঁচটায় ছুটি, তাই না ?

হ্যাঁ।

তানির আলি ফটোগুলো আবার রুমালে বেঁধে নিল। অতি সযত্নে।

তারপর বলল।

এবার তো আপনি উঠবেন ?

হ্যাঁ, উঠব।

আপনার ফুরসত হবে বাবুজী, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবেন ?

কোথায় ?

শুধু আমার কথায় কেন আপনি বিশ্বাস করবেন। আর এক ভদ্রলোকের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

সুদেবের সব শক্তি যেন নিঃশেষিত। দেহেরও, মনেরও।

সামনে বসা এই লোকটা ঐন্দ্রজালিকী স্পর্শে তাকে যেন প্রস্তরে পরিণত করেছে। তার নিজস্ব কোন চেতনা নেই।

লোকটার জাদুদণ্ডের আঘাতে তার দাম্পত্য-জীবন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে।

তবু শুরু যখন হয়েছে, এ খেলার শেষ দেখবে সুদেব।

বেয়ারাকে ডেকে আলমারি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে সুদেব উঠে দাঁড়াল।

কোট গায়ে দিয়ে কামরা ছেড়ে বাইরে আসতে গিয়েও থেমে গেল।

এমন কিছু গরম নয়। তবু তৃষ্ণায় তালু কাঠ।

টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটায় সুদেব চুমুক দিল।

সুদেবের পাশাপাশি তানির আলিও বেরিয়ে এল।

মোবারক বাইরে বসেছিল। এদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

তিনজনে নীচে এল।

কলকাতার চঞ্চল জনস্রোত রাস্তাঘাট ছাপিয়ে পড়েছে। অজস্র রকমের শব্দ। একটা সবুজ রংয়ের মোটর এসে সামনে দাঁড়াল।

মোবারক দরজা খুলে বলল।

উঠুন বাবুজী।

প্রথমে সুদেব, তার পিছনে তানির আলি উঠে বসল।

মোবারক সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল।

সুদেব শুধু একবার জিজ্ঞাসা করল।

আপনার মোটর ?

তানির আলি মাথা নাড়ল।

না বাবুজী, মোবারকের। লক্ষ্ণৌতে, এখানে ওর হীরা-জহরতের কারবার আছে।

মোটর ছুটল, কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর।

ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে উত্তর কলকাতার এক সংকীর্ণ গলিতে ঢুকল।

জরাজীর্ণ এক বাড়ি। আদিতে কি রং ছিল বলা মুশকিল। ইঁটের পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে বট অশ্বত্থের চারা।

মোবারক নেমে দরজা খুলে দিল।

আধ-অন্ধকার সিঁড়ির তলায় একটা ঘর। বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুরাহা হচ্ছে না। আলোর চেয়ে অন্ধকারই যেন বেশী।

বেশ কিছুক্ষণপর চোখদুটো এই আলোয় অভ্যস্ত হয়ে গেলে সুদেব দেখতে পেল।

পুরনো ধরনের নক্সাকাটা একটা বিরাট খাট। তার ওপর স্থূলকায় এক বৃদ্ধ শায়িত।

মাথার কাছে একটা টিপয়ের উপর কয়েকটা ওষুধের শিশি।

কে ?

হরদয়ালবাবু আমি তানির আলি। অবিনাশবাবুর দামাদকে সঙ্গে এনেছি।

ও, বস, বস। আমার তো ওঠবার সাধ্য নেই, জান।

এদিকে গোটা চারেক চেয়ার।

খুব সাবধানে দেখে দেখে সুদেব আর তানির আলি বসল।

মোবারক সঙ্গে আসে নি। সে বাইরেই ছিল।

দেখ না বাবা অবস্থা। শেষজীবনে অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল কে জানত। ছেলেরা এককোণে ফেলে রেখেছে। দিনান্তে একবার খোঁজ নিয়ে যায়। এখন কোন রকমে যেতে পারলে বাঁচি।

তানির আলি বাধা দিয়ে বলল।

আমি বাবুজীকে জানকীবাঈয়ের কথা সব বলেছি।

হরদয়ালবাবু যেন উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সারা লক্ষ্ণৌ গুলজার। অবিনাশদা জানকীবাঈয়ের সঙ্গে তবলা বাজাত। বাস, তার সঙ্গে মজে গেল। বাড়িতে কাঁচা বৌ ফেলে জানকীবাঈকে নিয়ে বেনারস পালাল। সেখানেই মেয়ে হয়। আমরা অফিসে পাশাপাশি বসতাম। সবই জানি। অফিসের কাজে কানপুর যাবার নাম করে অবিনাশদা বেনারস চলে যেত। সেখানে দিন দুই তিন ফুর্তি করে আবার ফিরে আসত। তারপর জানকীবাঈ মারা যেতে মেয়েটাকে নিয়ে আসতে হল। সেই সময়ে কার মেয়ে পাছে পাড়াপড়শীরা কেউ সন্দেহ করে এইজন্য অবিনাশদাকে আমিই আমিনাবাদে বাসা খুঁজে দিলাম। চারবাগ থেকে অবিনাশদা আমিনাবাদে উঠে এল।

হরদয়ালবাবু একটু দম নিল, তারপর বলতে আরম্ভ করল।

জানকীবাঈয়ের মেয়ে একেবারে জানকীবাঈয়ের মতন দেখতে। নাক, মুখ, চোখ, রং সব। তা সে মেয়ে তোমার ঘাড়ে চাপল কি করে বাবাজী?

খোঁজখবর নাও নি?

ঘরটা এমনিতেই চাপা। তবু সুদেবের মনে হল যেন তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। বেশীক্ষণ এখানে বসে থাকলে সে বুঝি অচেতন হয়ে পড়বে।

টলতে টলতে সুদেব উঠে দাঁড়াল।

অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আমি চলি।

বাইরে এসে দেখল মোবারক মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদেবকে দেখে মোবারক মোটরের দরজা খুলে দাঁড়াল।

সুদেব হাত নেড়ে বারণ করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

তার দু বছরের দাম্পত্য-জীবন সিনেমার ছবির মতন চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সুরভির সম্বন্ধে সে আর কতটুকু জানত। কোন খোঁজখবরই তো নেওয়া হয় নি। কিছু বুঝতে পারল না সুদেব।

তাহলে বর্ধমানে সুরভি মা বলে যার পরিচয় দিল, সে কে? অবশ্য এখন মনে

হচ্ছে, তার সঙ্গে সুরভির চেহারার কোন মিল নেই।

মহিলার চেহারা অত্যন্ত সাধারণ, আর সুরভি অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী। দু বছরের দাম্পত্য-জীবনে কোথাও সুদেব কোন খুঁত পায় নি। আচরণে, মমতায়, সাহচর্যে অতুলনীয়া।

কিন্তু খুঁত একেবারে উৎসমূলে।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে সুদেব হাত নেড়ে থামাল।

অফিসের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল।

লিফ্‌ট বন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল।

বারান্দায় চারপাই পেতে দরোয়ানরা গল্প করছিল, পালিত সায়েবকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

আমার কামরাটা একটু খুলে দাও তো।

একজন দরোয়ান চাবি দিয়ে কামরা খুলে দিল।

চেয়ারে বসে সুদেব প্যাড টেনে নিয়ে সেই মারাত্মক চিঠি লিখল। তারপর চিঠিটা খামে পুরে দরোয়ানকে ডাকল।

দরোয়ান এসে দাঁড়াতে বলল।

এই চিঠিটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দি৲

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা একটাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিল।

চিঠি আর টাকাটা তুলে নিয়ে দরোয়ান সেলাম করল।

সুদেব বলল।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোল আমি অফিসের কাজে বম্বে যাচ্ছি।

চাবি দিয়ে সুদেব নিজের ড্রয়ার খুলল।

এখানে সে কিছু টাকা রেখে দেয়। হঠাৎ যদি দরকার লাগে।

কতকগুলো নোট ব্যাগে পুরে সুদেব উঠে দাঁড়াল।

তারপর কি মনে পড়তে আবার বসল।

ডিরেক্টরকে সম্বোধন করে একটা দরখাস্ত লিখল।

গুরুতর ব্যক্তিগত কাজে দিন পনরোর জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছে।

সুদেব এক হোটেলে খাওয়া সেরে সোজা হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল।

টিকিট কেটে লক্ষ্ণৌয়ের ট্রেনে চেপে খেয়াল হল।

বাড়তি জামাকাপড় বা বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই।

এত হিসাব করে ট্রেনে ওঠার কথা মনেও পড়েনি। মনে পড়ার মতন অবস্থাও ছিল না।

লক্ষ্ণৌয়ে কোন দোকান থেকে কিনে নিলেই হবে।

এর আগে সুদেব বারদুয়েক লক্ষ্ণৌ এসেছে। অফিসের কাজে নয়, বেড়াতে। কিছু কিছু জায়গা তার চেনা।

স্টেশনের কাছে এক হোটেলে উঠল।

স্থানীয় একটি জানা লোক ছিল। আমির হোসেন। এখানে এলে তার দোকান থেকে সওদা করত।

এবারও তার শরণাপন্ন হল।

আসুন, আসুন, কবে এসেছেন?

আমির হোসেন আপ্যায়নে মুখর হয়ে উঠল।

আজ সকালে এসে পোঁছেছি। আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি।

প্রথম কথা ট্রেন থেকে আমার সুটকেস চুরি হয়ে গেছে। কিছু কাপড়-চোপড় এই মুহূর্তে কেনা দরকার।

এ আর বেশী কথা কি। এখনই কিনে দিচ্ছি।

ভাইয়ের ওপর দোকানের ভার দিয়ে আমির হোসেন বেরিয়ে এল।

জামাকাপড় কিনতে বেশী সময় নিল না। তারপর দুজনে একটা পার্কে গিয়ে বসল।

আপনার চক বাঈজীপাড়ায় যাওয়া-আসা আছে?

সুদেবের প্রশ্নে আমির হোসেন চমকে উঠল।

বাঈজীপাড়ায়?

ভয় পাবেন না। ফুর্তি করার জন্য যেতে চাচ্ছি না। আমার একটা খবরের খুব দরকার। এখানে বুড়ি বাঈজী কে আছে, যে আমাকে পুরনো খবর বলতে পারবে?

আমি তো বলতে পারব না। তবে রিজভিকে খবর পাঠাতে পারি।

রিজভি কে?

ও এলাকার লোক। বাঈজীদের কুলুজি নখদর্পণে।

কবে তার সঙ্গে দেখা হবে?

আমি আজ রাতেই মোলাকাত করব। আপনি কাল আমার দোকানে খবর নেবেন।

সকালেই সুদেব দোকানে এসে হাজির।

সারাটা রাত ঘুম হয়নি। তন্দ্রার ভাব আসতেই চোখের সামনে সুরভির

পদ্মফুললাঞ্ছিত মুখ ভেসে উঠেছে।

সুদেবের মনে হয়েছে, ঝোঁকের মাথায় অত দ্রুত চিঠিটা না লিখলেই যেন ভাল ছিল। সব খোঁজখবর নিয়ে তবে চূড়ান্ত পথ অবলম্বন করলেই হত।

কি হল, রিজভিকে পেয়েছেন?

হ্যাঁ, তসরিফ রাখুন। এখনই তার এখানে আসবার কথা।

মিনিট দশেকের মধ্যে রিজভি এসে হাজির।

খর্বকায়, পিঠে প্রমাণ সাইজের কুঁজ, মুখে বসন্তের দাগ। বয়স কত, চেহারা দেখে আন্দাজ করা কঠিন।

এসেই প্রায় আভূমি কুর্নিশ করে বলল।

কি খবর হোসেন সাহেব, জরুরী এত্তেলা পাঠিয়েছেন?

আমির হোসেন সুদেবকে দেখিয়ে বলল।

খবর এঁর কাছে।

রিজভি সুদেবের দিকে ফিরে বলল।

ফরমাইয়ে জনাব।

খুব বুড়ি বাঈজীর কাছে আমার একটু প্রয়োজন আছে। পুরনো দিনের খবর দরকার।

বুড়ি বাঈজী! রিজভি ভাবতে শুরু করল।

দুজন আছে। সরস্বতীয়া আর হিঙ্গলবাই। সরস্বতীয়া একেবারে পঙ্গু, কানেও কম শোনে। তবে হিঙ্গলবাঈ মোটামুটি ঠিক আছে।

সুদেব একবার দ্রুত হিসাব করে নিল।

জানকীবাঈ বেঁচে থাকলে তার বয়স কত হত? বিয়ের সময় সুরভির বয়স ছিল ত্রিশ। দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। যদি পঁচিশ বছরে সুরভি হয়ে থাকে তাহলে জানকীবাঈয়ের বয়স হত সাতান্ন। এই বয়সের অনেক বাঈজী নিশ্চয় এখন-ও বেঁচে আছে।

কবে দেখা করবেন বলুন?

রিজভির প্রশ্নের উত্তরে সুদেব বলল।

আজই যাব। দেরি করতে চাই না।

ঠিক আছে। তাহলে বেলাবেলিই চলুন। রাত হলে ওদের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে কিনা।

সুদেব জানাল বিকাল চারটেয় সে আমির হোসেনের দোকানে হাজির থাকবে। সেখান থেকে রিজভি যেন তাকে নিয়ে যায়।

লক্ষ্ণৌয়ের চক এলাকা। কত রইস আদমির উত্থান-পতনের স্মৃতি-বিজড়িত।

কত সর্বনাশের অশ্রুনিষিক্ত।

সংকীর্ণতম গলি। দিনের বেলাতেই আলোর প্রবেশ নিষেধ।

একটা আধভাঙা বাড়ি। উঠানের অর্ধেকটা জঙ্গলাকীর্ণ। একটা দিক যাতায়াতের জন্য পরিষ্কার রাখা হয়েছে।

অন্ধকার ঘর। খিলান ভেঙে ঝুলে পড়েছে। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়।

রিজভির পিছন পিছন সুদেব ঢুকল।

শুধু দুটো চোখ। একেবারে কোণের দিকে তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড।

কে রে? কে ওখানে? নাস্তা নিয়ে এলি?

আমরা এসেছি। কলকাতা থেকে এক মেহমান এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমার কাছে? আমার কাছে মেহমান আসবে কেন? আমি তো এখন দুনিয়ার আবর্জনা।

রিজভি সুদেবের দিকে ফিরে বলল।

এ হচ্ছে সরস্বতীয়াবাঈ। বয়সকালে সারা ইউ· পি-তে গজল গানে এর জুড়ি ছিল না। বড় বড় আসর থেকে এর ডাক আসত।

সুদেব কাজের কথা শুরু করল।

আপনি জানকীবাঈকে চিনতেন?

দন্তহীন মুখে সরস্বতীয়া অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

ও মা, জানকীকে চিনব না। আমাদের চেয়ে কত ছোট। আহা, কি ঠুংরির গলা ছিল। কি গলার মিহি কাজ। অল্পবয়সে মারা গেল মেয়েটা। শেষদিকে সব ছেড়ে দিয়েছিল। গানবাজনা, কোন মুজরোয় যেত না।

তার এক মেয়ে ছিল জানতেন?

জানতাম বৈকি। সে মেয়েকে আমি দেখেছি যে। রামনগরে মুজরো নিয়ে কয়েকবার গিয়েছিলাম। তখন জানকী আশ্রমে। আমি গিয়ে দেখা করেছি।

দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটা কোথায় গেল কে জানে!

মেয়ের বাবা কে জানতেন?

সবাই বলত, অবিনাশ তবলচি নাকি মেয়ের বাবা। তাকেই জানকী বিয়ে করেছিল যে!

সুদেব টান হয়ে বসল।

বিয়ে করেছিল?

বিয়ে মানে হয়তো পুরুত ডেকে বিয়ে কিনা জানি না। মালা বদল করে বিয়ে নিশ্চয়। জানকী অন্যায় কিছু করতে পারে না। সে গান গাইত বটে, কিন্তু কোন পুরুষকে দেহ ছুঁতে দিত না। অবিনাশ তবলচির সঙ্গে তার সত্যিকারের মহব্বত হয়েছিল। মেয়ে গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে জানকী আশ্রমে চলে গিয়েছিল।

সরস্বতীয়া কতকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগল।

সুদেব পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিল।

সরস্বতীয়া নোটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে দেখে বলল।

টাকা, টাকা কি করব? টাকা এরা কেড়ে নেবে। তার চেয়ে আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এস। অনেকদিন তেলেভাজা খাই নি।

ঠিক আছে। কাল এই সময় আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসব।

সুদেব উঠে পড়ল।

রাস্তায় রিজভি জিজ্ঞাসা করল।

হিঙ্গলবাঈয়ের কাছে যাবেন না?

না। আর দরকার হবে না।

হোটেলে ফিরে সুদেব বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কপালের দুটো পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ খুলে রাখতে পারছে না।

এমনও তো হতে পারে সুরভি এ ব্যাপারের কিছুই জানে না। তার খুব ছোট বয়সে জানকীবাঈ মারা গেছে। শিশু সুরভিকে হয়তো অবিনাশবাবুর স্ত্রী কোলে তুলে নিয়েছিল। সুরভি তাকেই মা বলে জানে।

জানকীবাঈয়ের সঙ্গে অবিনাশবাবুর কোন লৌকিক বিবাহ হয় নি। কিন্তু জানকীবাঈয়ের জীবন উচ্ছৃংখল ছিল এমন পরিচয়ও তো সুদেব পায় নি। তার জীবনে অবিনাশই একমাত্র পুরুষ।

সুদেবের মনে হল তানির আলির কথায় উত্তেজিত হয়ে চিঠিটা ওভাবে না লিখলেই হত। আর একটু অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তারপর যা কিছু করার করা উচিত ছিল।

যদি বিবাহের বাহ্যিক একটা অনুষ্ঠান না হয়েই থাকে, তাতে কি ক্ষতি!

পৃথিবী অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। পুরনো সংস্কার, পুরনো মতবাদ সব পায়ে দলে।

সুদেব নিজেও যথেষ্ট প্রগতিশীল। বিশেষ করে যখন জানা গেছে, জানকীবাই সাধারণ বাইজির জীবনযাপন করে নি, বরং সাত্ত্বিকভাবেই দিন কাটিয়েছে।

আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই সুদেব শিউরে উঠল। এমন তো নয়,

সুরভি আত্মহত্যা করেছে। এমন একটা অভিযোগের পর ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই কঠিন।

সুদেব স্থির করল, কাল আর একবার সরস্বতীয়াবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করে পরশু কলকাতায় ফিরে যাবে।

॥ ৩ ॥

প্রথমে মা ভাবল সুরভি হয়তো বাইরে গেছে।

বিছানা খালি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সুরভি যখন ফিরল না, তখন মা চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বাইরে গিয়ে দুদিকের বাগান দেখে এল। না, সুরভি নেই।

তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকেই নজরে পড়ল।

এপাশে সুটকেস নেই।

তার মানে সুটকেস নিয়ে কখন সুরভি বের হয়ে গেছে।

বিছানার কাছে এসে বালিশ সরাতেই কাগজের টুকরো দেখতে পেল।

লাইন দুয়েকের চিঠি।

ভেবে দেখলাম এখানে থাকবার আমার কোন অধিকার নেই। যদি কোন দিন পায়ের তলার মাটির আশ্বাস পাই, দেখা করব। এতদিন আমাকে পালন করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ দেব, না নিন্দাবাদ তাই ভাবছি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দুটি চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল।

সুরভি যে অন্য লোকের মেয়ে এ কথা ঘুণাক্ষরের জন্যে মনে হয় নি।

সন্তানহীন জীবনে সুরভি পরম সান্ত্বনা। দুটি ব্যগ্র বাহু মেলে তাকে তৃষ্ণার্ত বুকের ওপর টেনে নিয়েছিল। সে স্বামীর লালসার ফল কিনা অতটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার মন তার ছিল না।

সুরভিকে পেয়ে তার নারীহৃদয় তৃপ্ত ধন্য হয়েছিল।

কোথায় যেতে পারে সুরভি?

যা অভিমানী মেয়ে, মাথা নিচু করে স্বামীর কাছে ফিরে যাবে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া অত বড় একটা অপবাদের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে কোন মেয়ে যেতে পারে না।

সুরভি হাওড়া স্টেশনে একটা বেঞ্চে চুপচাপ বসেছিল।

বাড়ি থেকে একরকম ঠিক করেই এসেছিল সোজা লক্ষ্ণৌ চলে যাবে।

লক্ষ্ণৌতে তার ছেলেবেলা কেটেছে। সেখানকার কথা ভাল করে কিছু মনেও পড়ে না।

মনে দ্বিধা ছিল। লক্ষ্ণৌ যাবে, না বেনারস।

বেনারস তার জন্মস্থান। সেখানে কোথায় জানকীবাঈ ছিল, কোন আশ্রমে, কিছুই তার জানা নেই। সেখানে খোঁজ পাবার সম্ভাবনা কম।

তার চেয়ে লক্ষ্ণৌ অনেক ভাল।

সুরভির একটু জানা ছিল, চকে বাঈজীদের আস্তানা।

আর কিছু নয়, নিজের মা-র সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চায়।

শুধু এইটুকু প্রমাণিত হোক, জানকীবাঈ কুলটা ছিল না। সুরভি কুলটার সন্তান নয়।

সুরভি যদি কুলটার সন্তান হয়, তাহলে সমস্ত পৃথিবী তার কাছে অর্থহীন হয়ে যাবে। জীবনের কোন ভিত্তি থাকবে না।

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে চক্-এর কাছে এক হোটেলে উঠল। স্নান খাওয়া সেরে বিকাল হতেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার পর চকের রাস্তায় যাওয়া হয়তো নিরাপদ নয়। আসল মক্কেলদের আনাগোনা শুরু হবে।

পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে সুরভি চক-এ এসে হাজির হল। ইতিমধ্যেই আশপাশের দু একটা বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ, সারেঙ্গীর রেশ ভেসে আসছে।

যদি প্রমাণিত হয়, জানকীবাঈ বহুবল্লভা ছিল না, তাহলে এ প্রমাণ পৃথিবীর লোকের কাছে সুরভি কি করে পেশ করবে? তার মুখের কথায় কে বিশ্বাস করবে।

পৃথিবীর লোককে সুরভি বিশ্বাস করাতে চায় না। শুধু সে নিজে তৃপ্ত হতে চায়। তার জীবনে এইটুকুই পরম সান্ত্বনা যে সে কুলটার সন্তান নয়।

গলির মোড়ে একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এখানে জানকীবাঈ কোথায় থাকতেন?

লোকটা মাথা নাড়ল।

জানে না। ও নামও শোনে নি।

সুরভি আরও এগিয়ে গেল।

দু একজন পথচারীর দৃষ্টি ভাল ঠেকল না। তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হল না।

সারাটা চক সুরভি অনুসন্ধান করবে। জানকীবাঈয়ের পুরনো আস্তানা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এর সঙ্গে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়ানো।

চক-এরই এক প্রান্তে সরস্বতীয়ার ঘরে সুদেব আর রিজভি।

সুদেব হাতের খাবারের ঠোঙা সরস্বতীয়ার সামনে নামিয়ে রেখেছে।

সরস্বতীয়া খুব খুশী।

আপনাকে শুধু আর একটা প্রশ্ন।

বল, বল।

তানির আলি বলে কাউকে চিনতেন ?

তানির আলি ?

সরস্বতীয়ার কুঞ্চিত কপালে বাড়তি কয়েকটা রেখা পড়ল। দুটো চোখ বুজে চিন্তা করতে শুরু করল।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল।

এক তানিব আলি জানকীর সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাত। ফর্সা, লম্বা চেহারা। সে শুনেছি মারা গেছে। ফৈজাবাদ থেকে জানকীর সঙ্গে এসেছিল।

না মারা যায় নি। কিছুদিন আগেও আমার কাছে এসেছিল। তার সঙ্গে জানকীবাঈয়ের কোন রেষারেষি ছিল ?

জানকী তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কি অসম্মানসূচক ব্যবহার করেছিল, জানকী তেতে আগুন। পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তানির আলিকে দারুণ বেইজ্জত করেছিল। বেচারি মাথা নীচু করে পালিয়ে ছিল। আর চক-এ ঢোকে নি। শুনেছিলাম, বেরিলি চলে গিয়েছিল, সেখানেই তার এন্তেকাল হয়েছিল। তোমার কাছে শুনছি সে বেঁচে আছে। তা তারও বয়স অনেক হয়েছে।

সুদেব উঠে দাঁড়াল।

আর তার কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। এবার তাকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সুরভির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

রিজভিকে বিদায় দিয়ে সুদেব হাঁটতে আরম্ভ করল।

চক-এর নৈশজীবন শুরু হয়েছে।

কিছুটা এগিয়েই সুদেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে কি ভুল দেখছে।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সুরভি।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুরভি হন হন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চিকের আড়ালে।

চোখের সামনে উজ্জ্বল একটা জগৎ যেন চুরমার হয়ে গেল।

অবশেষে সুরভি নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে।

জানকীবাঈয়ের মেয়ে সুরভিবাঈ।

কিংবা লক্ষ্ণৌয়ের চক তাকে হয়তো অন্য নাম দিয়েছে।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুদেব পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

সামনেটা অন্ধকার। ভিতরে কোথাও আলো জ্বলছে। তার ক্ষীণ দীপ্তি বাইরে এসে পড়েছে।

প্রবেশদ্বারে চিকের বাধা।

সুদেব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চিকের ওপার থেকে মোলায়েম কণ্ঠ ভেসে এল। আইয়ে মেহেরবান।

এখানে কোন বাঙালী বাঈজী আছে?

বাঙালী বাঈজী? এ তো রোশেনারা বেগমের আস্তানা। আসুন আপনি, একটু পরেই আসর শুরু হবে। আজ রোশেনারা বেগম নিজে গাইবেন।

সুদেব একটু ইতস্তত করল।

এও কি সম্ভব, সুরভি নাম বদলে রোশেনারা হয়েছে?

কিন্তু দু বছর সুরভির সঙ্গে ঘর করেছে সুদেব, কোনদিন তাকে গান গাইতে শোনে নি।

সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ আছে। অনেকবার সুদেবের পাশাপাশি বসে জলসা শুনেছে। কিন্তু নিতান্ত গুণ গুণ করা ছাড়া সুরভির কণ্ঠে সুদেব কোনদিন গান শোনে নি।

রোশেনারা বেগম ছাড়া আর কেউ আছে এখানে?

না, আর কেউ নেই। কাকে খুঁজছেন আপনি?

সুদেবের মুখ থেকে বের হয়ে গেল।

সুরভিবাঈ।

ও নামে চক-এ কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

অগত্যা, সুদেব রাস্তায় নেমে দাঁড়াল।

কিন্তু নিজের চোখকে কি করে সে অবিশ্বাস করবে!

সুরভির পোশাক খুব চটকদার নয়। সাধারণ আটপৌরে শাড়ী। একটু যেন বিষাদগ্রস্ত চেহারা।

কিন্তু সুদেব স্পষ্ট দেখেছে পাশের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুদেব সোজা হেঁটে চক থেকে বের হয়ে এল।

অনেকটা সময় কেটে যাবার পর সুরভি বাইরে এসে দাঁড়াল।

সুদেবকে আচমকা দেখে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, চিক সরিয়ে ভিতরে যেতেই দেখল, জোরালো আলোর নীচে দুটি তরুণী হাতে মেহদীপাতা বাটা মাখছে।

হঠাৎ সুরভিকে দেখে তারা চমকে উঠল।

আপ কৌন ?

ভীষণ পিয়াস লেগেছে একটু জল খাব।

তখনই তাকে এক গ্লাস জল এনে দিল একটি তরুণী।

সিঁড়ির ধাপে বসে যখন সুরভি জলে চুমুক দিচ্ছে, তখন বাইরে জুতোর শব্দ।

একটি তরুণী চিকের এপারে গিয়ে দাঁড়াল।

কথাবার্তা সুরভির কানে যায় নি।

সুরভি রাস্তায় এসে একটা টাঙ্গা নিল।

যখন সে হোটেলে এসে পৌঁছল, তখন তার বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হয় নি।

চক-এ এসেছিল সুদেব ?

জানকীবাঈয়ের সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ নিতে ?

কিংবা খোঁজ নেওয়া নিশ্চয় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা না হলে ওভাবে সুরভিকে চিঠি লিখত না।

এখানে সুরভিকে দেখে স্বাভাবিক কারণেই সুদেব অবাক হয়ে গেছে।

কিন্তু নাম ধরে ডাকতে পারত।

কথা বলতে পারত এগিয়ে এসে।

সুরভি চুপচাপ বিছানায় বসল।

এখন সে কি করবে ?

আবার ফিরে যাবে বর্ধমানে ?

কিন্তু বর্ধমানের বাড়িতে তার কি অধিকার ?

পিতার দিক থেকে অধিকার হয়তো কিছুটা আছে।

তবে জানকীবাঈয়ের খোঁজখবর না নিয়ে ফিরে গিয়ে লাভ কি ?

সুদেব হোটেলে ফিরল না।

একটা পার্কে গিয়ে বসল।

পার্কে বেশীক্ষণ বসা সম্ভব নয়। ঠাণ্ডা পড়ছে। বাতাসে একটা হিমেল স্পর্শ। যে কাজে সুদেব লক্ষ্ণৌ এসেছে, সুরভির পক্ষে সেই জন্য এখানে আসা

খুবই সম্ভব।

কলকাতা থেকে সুরভি বর্ধমান ফিরে গেছে। যাকে এতদিন মা বলে জানত, তাকে সব কথা বলেছে। আসল মা-র খোঁজ চেয়েছে।

তার কাছ থেকেই শুনেছে জানকীবাঈয়ের কথা।

কিন্তু এ কথা কি শোনে নি জানকীবাঈ বেনারসে মারা গেছে। তাকে লক্ষ্ণৌ শহরে খুঁজতে সুরভি কেন আসবে।

এমন তো নয় জানকীবাঈয়ের মরার খবর মিথ্যা। এই শহরের কোথাও জানকীবাঈ লুকিয়ে আছে।

তাহলে সরস্বতীয়া অমন কথা বলবে কেন? মিথ্যা কথা বলে তাদের কি লাভ!

এ সমস্যার যেন কূল নেই, সমাধান নেই।

সুরভির মা পিছন ফিরে কাজ করছিল রান্নাঘরে। সুদেব চৌকাটের এপারে গিয়ে দাঁড়াল।

সুরভি আছে?

মা চমকে এদিকে ফিরল।

কে, সুদেব। বস, বাবা বস।

সুরভি কোথায়?

ততক্ষণে মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসেছে।

সুদেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

সুরভি নেই। সে যে কোথায় গেছে—

সুদেব বাধা দিল।

কোথায় গেছে আমি জানি। লক্ষ্ণৌতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরে নি?

লক্ষ্ণৌ গেছে? তাহলে সু নিজের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গেছে। আমাব কথা তাহলে বিশ্বাস করে নি।

একটু থেমে মা আবার বলল।

একটু বস সুদেব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সুদেব একটু ইতস্তত করে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

চেয়ারে বসল।

ওরকম একটা চিঠি তুমি কি করে লিখলে সুদেব? তোমরা না আজকালকার ছেলে? এ সব তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার অনেক ওপরে তোমাদের ওঠার কথা।

সুদেব কোন উত্তর দিল না।

তুমি হয়তো জান না, জানকীবাঈয়ের মত মেয়ে হয় না। বাঈজি বলতে সচরাচর যা বোঝা যায়, সে সে-জাতের ছিল না। আমার স্বামীকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল আর জীবনে ওই একবারই তার ভালবাসা। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি সুদেব।

কি কথা?

ধর যদি জানকীবাঈ কুলটাই হত, যদি সে গ্লানির জীবন যাপন করত, তাহলেও সুরভির কি দোষ? জানকীবাঈয়ের পাপ তাকে কেন স্পর্শ করবে? তার জীবনে তো কোন পাপ, কোন মালিন্য ছিল না। আমি তাকে বুকে করে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। সভ্য সমাজের যোগ্য করে তুলেছি। জান সুদেব, আত্মপরিচয় জানার পর থেকে সে আর আমায় মা বলে ডাকে নি।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে মা কেঁদে উঠল।

আমার ভুল হয়েছে মা। আপনি শান্ত হন! আমি এখন কি করব বলে দিন? তবে, বিয়ের পরই আমাদের দুজনকে কাছে ডেকে যদি আপনি সব কিছু বলে দিতেন, তা হলে বোধহয় এমন হত না।

কান্না থামিয়ে মা বলল।

কোন মা-র পক্ষে কি এ কথা বলা সম্ভব? তুমিই বল?

সুদেব চুপ করে রইল।

লক্ষ্ণৌয়ে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল?

চক-এ।

তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়নি?

না, সুযোগ পাই নি। সুরভি হঠাৎ পাশের একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমি সে বাড়িতে খোঁজ করেও তার সন্ধান পাই নি।

আমার মনে হচ্ছে সু জানকীবাঈয়ের সম্বন্ধে জানতে গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে তার সম্বন্ধে কেউ কি বলতে পারবে। শেষজীবন তার বেনারসে কেটেছিল।

হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌতে জানকীবাঈ সম্বন্ধে দু একজন জানে।

জানে?

সরস্বতীয়া আর হিঙ্গলবাঈ জানে। আমি সরস্বতীয়ার সঙ্গে দেখা করে সব শুনেছি।

কি শুনেছ?

শুনেছি জানকীবাঈ ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। সাধারণভাবে

বাঈজী বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তা ছিলেন না।

সুদেব উঠে দাঁড়াল।

এ কি উঠছ?

হ্যাঁ, আমি কলকাতায় ফিরে যাব। সুরভি যদি এখানে ফিরে আসে তাহলে তাকে কলকাতায় আমার কাছে ফিরে যেতে বলবেন।

আমার মনে হয় না সু আর এখানে ফিরে আসবে। মেয়ে যা অভিমানী আমার বড় ভয় করছে। কিছু একটা সর্বনাশ না ঘটায়।

সুদেব চমকে উঠল।

সর্বনাশ ঘটাবে? তার মানে?

কি জানি, আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

সুদেব দ্বিধায় পড়ল।

কি করবে সুরভি? আত্মহত্যা? তার বর্তমান মনের অবস্থার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

তাহলে সুদেব কি করে তাকে বাঁচাবে?

আবার ফিরে যাবে লক্ষ্ণৌয়ে!

লক্ষ্ণৌতে আপনাদের পরিচিত কে আছে?

বহুদিন আমরা লক্ষ্ণৌ ছেড়েছি। এখন পুরনো লোক কে আছে কিছুই জানি না।

তাহলে সুরভি কোথায় উঠেছে?

কিছুই জানি না। তার পরিচিত কেউ আছে কিনা বলতে পারব না। বলা যায় না, হোটেলেও উঠতে পারে।

আমি চলি।

মাকে কোন কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে সুদেব দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

স্টেশনে এসে চিন্তা করল।

একবার কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার।

কিছু জামাকাপড় সঙ্গে নেবে। অফিসে গিয়ে লম্বা ছুটি নেওয়াও প্রয়োজন।

সব চেয়ে বড় কথা, মনের মধ্যে গোপন একটা আশা, যদি সুরভি সেখানে ফিরে গিয়ে থাকে।

প্রথমে চাকরের নজরে পড়ল

সে ছুটে ওপরে গিয়ে যামিনীকে খবর দিল।

সিঁড়ির চাতালে উঠতেই যামিনী সুদেবকে প্রশ্ন করল।

মা আসেন নি বাবু ?

সুদেবের সারা মুখে আশাভঙ্গের ছাপ।

তাহলে সুরভি এখানে আসে নি।

নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল।

দিনকয়েক পরে আসবে। আমিও আবার বেরিয়ে যাব।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই টেবিলের ওপর সুদেব চিঠিটা দেখতে পেল।

চিঠিটা তুলে নিয়ে সুদেব পড়ল।

একবার, দুবার, অনেকবার।

সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছি, ছি, নিজের ওপর ঘৃণা হল।

অফিসে ঢুকতেই সহকর্মীরা চমকে উঠল।

এ কি চেহারা হয়েছে সুদেবের। মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন রোগশয্যায় পড়েছিল। দুটি চোখ কোটরাগত। হনু প্রকট। সারা মুখ জুড়ে বিষাদের আভা।

নিজের কামরায় বসবার একটু পরেই দরোয়ান এসে সেলাম করল।

কি খবর ?

আপনি চলে যাবার পর মাইজির ফোন এসেছিল। আপনা. বাড়ি যেতে দেরী হয়েছিল বলে খোঁজ করছিলেন।

হুঁ।

সুদেব টেবিলের ওপর থেকে ফাইলগুলো টেনে নিয়ে ব্যস্ত হবার ভান করল।

টেলিফোনের মেয়েটিকে বলে গিয়েছিল, যদি বাড়ি থেকে ফোন আসে তাহলে বলে দিতে সে বম্বে গেছে।

অফিসের অনেকেই সেই কথা জানে।

কিছুক্ষণ পরে কামরায় ঢুকল শচীন গুপ্ত। সুদেবের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। প্রায় একই সঙ্গে এ অফিসে ঢুকেছিল।

ঢুকেই প্রশ্ন করল।

কি ব্রাদার, চেহারা এ রকম করলে কি করে ? বম্বেতে ফিল্মললনাদের পাল্লায় পড়েছিলে নাকি ?

সুদেব হাসল।

আরে না ভাই, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দারুণ জ্বর। ভয় হয়েছিল টাই-ফয়েডে না দাঁড়ায়।

চেহারা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে।

মাস খানেক ছুটি নেব ভাবছি।

হ্যাঁ, নাও, শরীরটা সারিয়ে এস।

তারপর একটু থেমে শচীন গুপ্ত জিজ্ঞাসা করল।

তুমি একলা গিয়েছিলে? বৌদিকে সঙ্গে নাও নি?

সুদেব একটু চমকে উঠল।

তোমাকে কে বললে?

আরে, আমি একদিন তোমাদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। ভাবলাম বৌদির সঙ্গে দেখা করে তোমার খবরটা নিয়ে আসি। অবশ্য মনে সন্দেহ ছিল বৌদিকে-পাব না।

সুদেব একদৃষ্টে শচীন গুপ্তর দিকে দেখতে লাগল।

তোমার চাকরের কাছে শুনলাম, তুমি চলে যাবার পরের দিনই বৌদিও বেরিয়ে পড়েছেন। সম্ভবত বাপের বাড়ি। কতকটা অভিমানে।

কতকটা তাই। মানে মুশকিল হল কি—সুদেব একটু ইতস্তত করে নিজেকে সামলে নিল। বম্বেতে আমি উঠেছিলাম, সেটা ব্যাচেলার্স ডেন, স্ত্রীকে নিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই তোমার বৌদির কিঞ্চিৎ অভিমান হয়ে থাকবে। তবে বাপের বাড়ি নয়, ভদ্রমহিলা একেবারে সুদূর লক্ষ্ণৌ পাড়ি দিয়েছে।

হঠাৎ লক্ষ্ণৌ?

ওখানেই ওরা ছেলেবেলায় ছিল। দু একজন আত্মীয়ও আছে।

তুমি কি করবে এখন?

কি আর করব? ছুটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাব।

শচীন গুপ্ত হাসল।

সেই ভাল। একেবারে দেহি পদপল্লবমুদারম্।

সুদেবও হাসল। তবে হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

শচীন গুপ্ত বেরিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল।

ভাল কথা, তুমি যাবার পর এক মুসলমান দেখা করতে এসেছিল।

মুসলমান?

হ্যাঁ, কি আলি নাম বলেছিল, মনে নেই। তোমার কাছে আগেও একবার

বুঝি এসেছিল এর আগে।

কি বলে গেছে?

সুদেব বুঝতে পারল তার গলা রীতিমত কাঁপছে।

না, আমাকে কিছু বলে নি। তবে পরে হয়তো আসতে পারে।

শচীন গুপ্ত বেরিয়ে গেল।

দু হাতে মাথা টিপে সুদেব কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

চক থেকে তখনই না বের হলেই বোধহয় ভাল করত।

তাহলে সুরভির সঙ্গে দেখা হত।

তার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হত।

সুরভিও সম্ভবত তারই মতন জানকীবাঈয়ের কুলুজিব খোঁজে চক-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুদেব ফোনটা তুলে ধরল।

টেলিফোনের মেয়েটি বলল।

মিস্টার পালিত আপনি ফিরে এসেছেন?

হ্যাঁ, আমি আবার বাইরে যাব।

আপনার বাড়ি থেকে মিসেস ফোন করেছিলেন, আপনি কোথায় গেছেন সেই সম্পর্কে।

আপনি কি বললেন?

আপনি বম্বে গিয়েছেন, সেই কথাই বললাম। আপনি তো তাই বলেছিলেন।

ঠিক করেছেন। ডিরেক্টর সায়েব এসেছেন?

হ্যাঁ, একটু আগে এসেছেন।

আমাকে লাইনটা দিন তো।

ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে সুদেব উঠে পড়ল।

আধ ঘণ্টা পর ফিরল ডিরেক্টরের ঘর থেকে।

এবার সুদেব জামাকাপড় নিয়ে তৈরি হয়েই কলকাতা ছাড়ল।

তার একমাত্র ভয়, সুরভি যদি ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে এসে থাকে।

বর্ধমানে সুদেব শাশুড়ীকে একটা চিঠি লিখল।

সুরভি যদি আসে তাহলে সুদেবকে যেন লক্ষ্ণৌয়ের হোটেলের ঠিকানায় জানানো হয়।

আগের বার যে হোটেলে উঠেছিল, সুদেব এবারেও সেখানে উঠল।

এখন প্রধান সমস্যা কি করে সুরভিকে খুঁজে বের করবে।

চক-এর ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করা সহজসাধ্য নয়।

তাছাড়া সুরভি যে চক-এই আছে তারই বা কি স্থিরতা।

লক্ষ্ণৌ পৌঁছে সুদেব আলি হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ কবল।

আপনাকে আবাব বিরক্ত করতে এলাম।

সে কি কথা, বলুন আপনার জন্য কি কবতে পাবি ?

আমার চক-এ একজনের খোঁজ চাই।

আমির হোসেন মুচকি হাসল।

আপনিও সন্ধান পেয়ে গেছেন ?

তার মানে ?

মানে, চক-এ যে নতুন বাঙালী মেয়েটি এসেছে তার খোঁজ করছেন তো ?

সুদেব শিউরে উঠল।

চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকাব।

একটু সামলে নিয়ে সুদেব বলল।

বাঙালী মেয়ে ?

হ্যাঁ, বাঙালী বাঈজী। কলকাতা থেকে এসেছে। রিজভির কাছে শুনলাম অপূর্ব, বয়সও বেশী নয়।

সামনে একটা চেয়ার ছিল। সাবধানে চেয়ারটা ধবে সুদেব তার ওপর বসে পড়ল।

ঠিক বুকের মাঝখানে দুঃসহ একটা যন্ত্রণা। সুদেবের মনে হল, নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

আপনি দেখা করবেন তো রিজভিকে একবাব খবব পাঠাই। ওসব পাড়ায় ওব খুব যাওয়া-আসা আছে।

না, আমার ওসব শখ নেই।

তবে চক-এ কার খোঁজ করতে চাইছেন ?

আমার একটি বন্ধুর স্ত্রীর। বন্ধুব ধারণা তাব স্ত্রী এ পাড়াতেই বাসা বেঁধেছে।

আমির হোসেন সুদেবের পাশের চেয়াবে বসল।

আপনি তাহলে একবার এই নতুন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করুন। আমার খবর, এ মেয়েটিও বিবাহিতা। সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে কোনরকম গোলমাল হয়ে থাকবে।

সুদেব কোন কথা বলতে পারল না।

আজ রিজভি লক্ষ্ণৌয়ের বাইরে গেছে। কাল সকালে ফিরবে। আপনার সঙ্গে কাল বিকাল নাগাত দেখা করতে বলব।

আমার হোটেলের ঠিকানা জানেন তো?

আপনি গতবারে যেখানে উঠেছিলেন, সেখানেই উঠেছেন তো?

কোন রকমে ঘাড় নেড়ে সুদেব দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বিকালের আগেই রিজভি এসে দেখা করল।

সুদেব বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিল, রিজভি পর্দার ওপার থেকে ডাকল।

সাব।

কে?

আমি মেহেরবান। মহম্মদ রিজভি।

ভিতরে আসুন।

রিজভি ভিতরে এসে দাঁড়াল।

আপনি ডেকেছেন?

হ্যাঁ, কলকাতা থেকে যে বাঙালী বাঈজী এসেছে, তাকে দেখাতে পারেন?

রিজভি একটু যেন চিন্তিত হল।

একটু সময় লাগবে মেহেরবান। অন্তত দিন চারেক আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। খুব ভীড় সেখানে।

আর কিছু নয়, আমি একবার দেখতে চাই।

রিজভি অর্থপূর্ণ হাসল।

চোখের দেখারও যে দাম দিতে হয় জনাব। চক-এ মুফৎ-এ কিছু হয় না।

সুদেব বুঝতে পারল রিজভি অন্য কিছু ভাবছে। তাই বলল।

আমির হোসেন কিছু বলে নি?

কি সম্বন্ধে?

আমার এক বন্ধুর বৌ কলকাতা থেকে এখানে চলে এসেছে। এ মহিলা সে কিনা আমি দেখতে চাই।

যাই হোক, নজরাণা ছাড়া এরা দেখা করে না।

নজরাণা কত?

খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাব।

সেলাম করে রিজভি বেরিয়ে গেল।

পরের দিন দুপুরে সে আবার এসে দাঁড়াল সুদেবের সামনে। সারাটা রাত

সুদেব ঘুমাতে পারে নি। প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় বিছানায় ছটফট করেছে।

সুরভি জানকীবাঈয়ের মেয়ে তাই বুঝি জীবিকা দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে। কিন্তু জানকীবাঈ তো অন্য ধরনের ছিল। এ পথের পাঁকের একটু স্পর্শ তার গায়ে লাগে নি।

সুরভি বুঝি সুদেবের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

রিজভি বলল।

আপনি শুধু গান শুনবেন তো ?

গান ? সুরভি কি গাইতে পারত ? দু বছরের দাম্পত্য-জীবনে সুদেব তাকে গুণ গুণ করা ছাড়া চেঁচিয়ে গাইতে শোনে নি।

হ্যাঁ। গান শুনব।

মজুরী পঞ্চাশ টাকা। আর আমার দশ।

বেশ রাজী। আজ বিকালে যাব তো ?

না, আজ হবে না, কাল। এত তাড়াতাড়ি হত না। আমি বলেছি, রইস আদমি কলকাতা থেকে এখানে ব্যবসা করতে এসেছেন। পরশুই চলে যাবেন।

সুদেব কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে রইল।

ঠিক আছে, কাল এসে আপনাকে নিয়ে যাব। এই সন্ধ্যার ঝোঁকে।

তাই হল।

রিজভি একেবারে টাঙ্গা নিয়ে এসেছিল।

দুজনে চক-এর দিকে রওনা হল।

রিজভি কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কারণ তার ধারণা ছিল বাঙালীবাবু এসব জায়গায় রীতিমত সাজগোজ করে যাবে, কিন্তু এ যে একেবারে সাদাসিধে পোশাক।

টাঙ্গা চক-এর দিকে যত এগোতে লাগল, সুদেব তত অবসন্ন বোধ করতে লাগল।

কি বলবে সুরভিকে ?

এরপর কি করে তাকে আগের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

টাঙ্গা থামল।

রিজভি আগে লাফিয়ে নামল।

আপনি একটু বসুন জনাব। আমি আগে খবর দিয়ে আসি।

রিজভি নেমে গেল। ফিরল মিনিট দশেকের মধ্যে।

আসুন জনাব।

সুদেব নামল। একবার ভাবল এই টাঙ্গাতেই হোটেলে ফিরে যাবে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে আর পিছানো যায় না।

কার্পেট পাতা। মখমলের তাকিয়া। মাথার ওপর আলোর ঝাড়।

রিজভি আর সুদেব দুজনে বসল।

মিনিট কয়েক পরেই পর্দা সরিয়ে বাঈজী ঢুকল।

সুদেবের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল।

অপরূপ সুন্দরী। বয়সও বেশী নয়, কিন্তু না, এ সুরভি নয়। তার চেয়েও আরও লাবণ্যময়ী। হয়তো প্রসাধনের কল্যাণেই।

বাঈজী দুটো হাত জোড় করে বাঙালী প্রথায় নমস্কার করল!

বাংলায় বলল।

আমার বাড়ি আজ পবিত্র হল।

রিজভি সুদেবের কানে কানে বলল।

নজরাণা সামনের থালায় রেখে দিন জনাব।

সুদেব নোটগুলো থালার ওপর রাখল।

ফরমাইয়ে কি গান শুনবেন?

এই মুহূর্তে সুদেবের ইচ্ছা হল উঠে চলে আসবে। আর এখানে থাকবার দরকার নেই। বুকের ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল।

সুরভি নয়, অন্য কেউ।

কিন্তু বাঈজী তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছে। কি গান গাইবে তা জানতে চায়।

সুদেব বলল, যা হোক একটা গান করুন।

ঠিক আছে, আপনাকে একটা ঠুংরি শোনাই।

ঠুংরির শব্দ আর সুর কোনটাই সুদেবের কানে গেল না। তার মন তখন অন্য রাজ্যে।

সুরভি তাহলে কোথায়!

লক্ষ্ণৌ-এ না কলকাতায়!

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুদেব উঠে দাঁড়াল।

আমি উঠি। কালই কলকাতায় ফিরে যাব। অনেক কতকগুলো জরুরী কাজ রয়েছে।

বাঈজী সুদেবের সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

বিনীত কণ্ঠে বলল।

আবার এখানে এলে গরিবের কোঠিতে পায়ের ধুলো দেবেন। ভুলবেন না।

নিশ্চয় আসব।

সুদেব রিজভিকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

সে জানতেও পারল না, একটু দূরে অন্ধকারের আবরণে নিজেকে ঢেকে আর একজন তাকে লক্ষ্য করছিল।

সুদেব রিজভির সঙ্গে টাঙ্গায় উঠল।

রিজভি জিজ্ঞাসা করল।

এবার হোটেলে ফিরবেন তো হজরত?

সুদেব কোন উত্তর দিল না, কারণ প্রশ্ন তার কানে যায় নি।

তার নিজের মন সমস্যায় উদ্বেল।

সুরভিকে কোথায় খুঁজবে

॥ ৪ ॥

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরভি সব দেখল, সব শুনল। আজও ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জানকীবাঈয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে, এমন কারো দেখা পাওয়া যায় নি। দু একজন নাম শুনেছে বটে, কিন্তু তার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে নি।

হোটেলে ফেরবার মুখে এই দৃশ্য চোখে পড়ল।

এক বাঈজীর কোঠি থেকে সুদেব বের হচ্ছে। বাঈজী তাকে আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছে।

তাহলে বোঝা যায় এসব এলাকায় সুদেবের আসা-যাওয়া আছে।

এই সঙ্গে আর একটা কথাও সুরভির মনে পড়ে গেল।

অফিসের কাজের ছুতোয় মাঝে মাঝে সুদেব বাইরে যেত।

এমন তো নয়, সুদেব লক্ষ্ণৌ আসত বাঈজী পাড়ায় নেশা মেটাতে?

সুরভি কুলটার মেয়ে এমন একটা অপবাদ দিয়ে জীবন থেকে তাকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনও বুঝি সুদেবের হয়েছিল।

মা-র কাছে সুরভি যেটুকু শুনেছে, জানকীবাঈ যে কুলটা ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে!

সেই কথাটাই সুরভি সুদেবকে জানাতে চায়।

সমস্ত শরীর অবসন্ন। সুরভি টলতে টলতে একটা বাড়ির সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল। এখনও শরীর ঠিক হয় নি। একটা টাঙ্গা পেলে হত।

সুরভি বড়রাস্তার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

ঠিক চৌরাস্তার কাছে এসে সুরভি আর পারল না। হাত তুলে একটা টাঙ্গা ডাকতে গেল, গলা দিয়ে স্বর বের হল না।

পথের ওপরই সুরভি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হল দেখল বিছানায় শুয়ে আছে।

এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখে বুঝতে পারল, এটা হাসপাতাল। পাশাপাশি অনেকগুলো বেড।

নার্স কাছে আসতে সুরভি জিজ্ঞাসা করল।

আমার কি হয়েছে?

আপনি পথের ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এক রইস আদমি আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আপনার আত্মীয়-স্বজন এখানে কে আছে?

আত্মীয়-স্বজন? এখানে আমার কেউ নেই।

কিন্তু আপনার দেহের এ অবস্থায় কারো কাছে থাকা দরকার।

নার্সের কথায় সুরভি একটু শঙ্কিত হল।

কেন, আমার অবস্থা কি খুব খারাপ?

খারাপ মানে, আপনি মা হতে চলেছেন। এই সময়ে আত্মীয়রা কাছে থাকলেই ভাল হয়।

সুরভি আরক্ত হল।

এ ভয় কিছুটা ছিল। উত্তেজিত মুহূর্তে তার খেয়াল হয় নি।

সুরভি যদি কুলটার মেয়ে বলে পরিত্যক্তা হয়ে থাকে, তাহলে সুরভির গর্ভস্থ সন্তান তারও তো কোন আভিজাত্য থাকবে না।

পৃথিবীতে, মানুষের সমাজে সে তো অন্ত্যজ। অস্পৃশ্য।

আপনার আত্মীয়ের ঠিকানা বলুন, তাকে আমরা খবর পাঠিয়ে দিই।

দু এক মুহূর্ত সুরভি একটু ইতস্তত করল।

প্রথমেই যার কথা মনে পড়ল, তাকে ডাকা চলে না।

ডাকলেও হয়তো সে আসবে না।

তার চেয়ে মাকে খবর পাঠানো যেতে পারে।

এ মা তার গর্ভধারিণী নয়, সত্যি কথা, কিন্তু শিশুকাল থেকে মাতৃস্নেহে তাকে মানুষ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুরভি নার্সকে বর্ধমানের ঠিকানা বলল।

নার্স ঠিকানা লিখে নিয়ে বলল।

কাল আপনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনি বরং নিজেই একটা চিঠি লিখে দিন। তাছাড়া এ হাসপাতালে আপনার আর দু তিন দিনের বেশী থাকার প্রয়োজন হবে না।

সুরভি চোখ বন্ধ করে সব শুনল।

শরীর এখনও বেশ ক্লান্ত। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ।

এ অবসাদ শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও।

বেশ কয়েকদিন ধরে মনের ওপর চাপ চলেছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

স্বামী স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, সেই অবলম্বন সরে গেলে, নারী কত অসহায় সেটা অনুমেয়।

সেরে উঠে সুরভির প্রথম কাজ হবে একটা চাকরি যোগাড় করা।

চাকরি হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু এছাড়া তার আর অন্য পথ নেই।

আর একটা চিন্তা মনে হতেই ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

বিজ্ঞান অনেককিছু সহজসাধ্য করেছে।

অবাঞ্ছিত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দিলে সুরভি অনেক সমস্যা থেকে নিস্কৃতি পাবে।

যার অতীত কলুষিত, বর্তমান উল্লেখ্য পরিচয় বর্জিত, তার পৃথিবীতে আসার কি প্রয়োজন!

সুরভি তাকে পৃথিবীতে আনবে, কিন্তু মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করতে পারবে না।

মাকে চিঠিটা লেখার পর সুরভি নার্সকে বলল।

আপনার সঙ্গে আমার একটু গোপন কথা আছে।

বেশ, ডিউটি শেষ করে আমি দুপুরবেলা আপনার কাছে আসব, তখন বলবেন।
নার্স দুপুরবেলা যখন এল, তখন সুরভি নিজের মনকে অনেকটা সংহত করে এনেছে।

নার্স আসতে সুরভি তার দুটো হাত আঁকড়ে ধরল।

আপনি আমাকে বাঁচান।

বিস্মিত নার্স বলল।

কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি এরকম করছেন কেন?

আমার পেটের সন্তান অবৈধ। তাকে আমি রাখতে চাই না।

মানে?

মানে আমি বিবাহিতা নই।

নার্স কিছুক্ষণ সুরভির দিকে একদৃষ্টে দেখল, তারপর বলল।

আপনি তো কলকাতা থেকে আসছেন ?

সুরভি মাথা নাড়ল।

হ্যাঁ।

সেখানে তো এ সবের অনেক সুবিধা আছে। আপনি এত দূরে এলেন কেন ?

কলকাতা আমার খুব পরিচিত জায়গা, তাই অজানা শহরে চলে এসেছি। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নার্স একটু গম্ভীর হয়ে গেল, তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

দেখি, কাল আপনাকে ঠিক বলতে পারব।

ডাক্তার শ্রীবাস্তবের নার্সিংহোম।

সুরভির প্রায় শেষ কপর্দক তুলে দিতে হয়েছে।

হোটেল খরচের কিছু টাকা শুধু আছে আর কলকাতায় ফিরে যাবার ভাড়া।

হাতের গলার অলংকার, রিস্টওয়াচ সব গেছে।

কিন্তু সুরভি অনেক ভেবেছে। এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

শুধু যে সন্তান অবাঞ্ছিত তা নয়, প্রতিবন্ধকও।

সুরভিকে যখন জীবিকার সন্ধানে বের হতে হবে, তখন কে দেখবে তার সন্তানকে ? তাকে কার কাছে রেখে যাবে ?

প্রৌঢ় শ্রীবাস্তব অনেক বুঝিয়েছে।

যদি সম্ভব হয়, তাহলে এ কাজ না করলেন।

সুরভি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে।

নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমার আর অন্য পথ নেই।

শ্রীবাস্তব আর কিছু বলে নি।

অপারেশনের সকাল থেকে সুরভির দৃষ্টি বার বার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল। বুকের মাঝখানে অস্বস্তিকর এক যন্ত্রণা।

এমন হবার কথা নয়।

যে আসছে সে কত আদরের, কত যত্নের হবার কথা।

সুদেবের পৌরুষ আর সুরভির মমতায় গড়া প্রাণের নিধি।

ঠিক এগারোটায় সুরভিকে সরিয়ে নেওয়া হল অপারেশন থিয়েটারে।

শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আর একজন ছোকরা ডাক্তারও রয়েছে।

সবাই গ্লাভস্ পরে তৈরি।

ক্লোরোফর্ম দেওয়ার জন্য নার্সটি সুরভির মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত।

শ্রীবাস্তব বিরক্ত হল। ছোকরা ডাক্তার শ্রীবাস্তবের নির্দেশে দরজা খুলতেই বেয়ারা একটা কাগজের শ্লিপ দিল।

শ্রীবাস্তব বলল।

আস্তে বল।

মিনিট দশেকের মধ্যে দ্রুত পায়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকল সুদেব, সুরভির মা, আর সকলের পিছনে হাসপাতালের নার্স।

পরিবেশ ভুলে সুদেব ছুটে এল সুরভির পাশে। তার দুটো হাত জড়িয়ে বলল।

এ কি সর্বনাশ তুমি করতে যাচ্ছিলে সুরভি। আমাদের সন্তানকে নিশ্চিহ্ন করার কোন অধিকার তোমার নাই। ভুল শোধরাবার জন্য পাগলের মতন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পদ্মফুল পঙ্কজাত হলেও দেবতার পূজায় লাগে। আমি নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি—জানকীবাঈ সাধারণ বাঈজীর জীবন-যাপন করেন নি। তিনি সঙ্গীত-সাধিকা ছিলেন, প্রেমে একনিষ্ঠা।

সুরভি সুদেবের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ক্লেদ, অবসাদ সব কিছু ধুয়ে গেল অশ্রুধারায়।

॥ শেষ ॥